বারদীর

শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী

[আবির্ভাব—বাংলা ১১৩৭ সাল, ইংরাজী ১৭৩১
তিরোভাব—বাংলা ১২৯৭ সাল, ইংরাজী ১৮৯০]
[১৬০ বৎসর]

লেখার
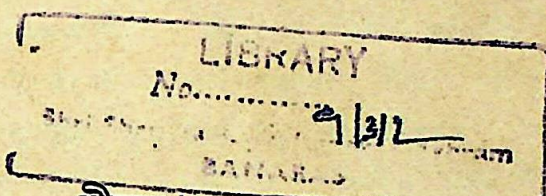
শ্রীরমেশ চন্দ্র সরকার বি. এ., বি. টি.
ভূতপূর্ব্ব সহকারী শিক্ষক, বরিশাল জিলা স্কুল
ও ঝালকাঠী গভর্নমেণ্ট হাই স্কুল

এই গ্রন্থের লভ্যাংশ
জগদীশ ঘোষ জনকল্যাণ ট্রাস্টের

প্রাপ্তিস্থান :
প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী
১৫ কলেজ স্কয়ার, কলিকাতা - ১২
গড়িয়াহাট মার্কেট, বালিগঞ্জ

মূল্য ৩·৫০

...রোড (কলিকাতা-১৯)
...র জনকল্যাণ ট্রাষ্টের
...লচন্দ্র ঘোষ এম. এ.
...শিত।

১৩৭১ সাল

মুদ্রাকর
শ্রীদ্বিজেন্দ্রকুমার বসু
শ্রীজগদীশ প্রেস
৪১ গড়িয়াহাট রোড, কলিকাতা-১৯

নিবেদন
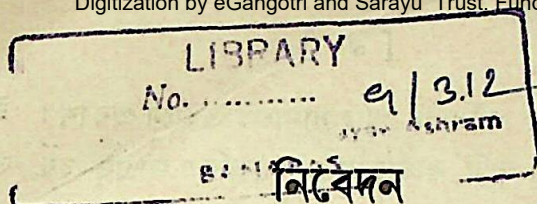
শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবার বিশাল জীবনী লেখার উপকরণ বড়ই অপ্রচুর। এই গ্রন্থে যে সকল বিষয়ের সন্নিবেশ করা হইল, তাহার কতক কতক উপাদান "সিদ্ধ-জীবনী", "ধর্ম্মসার-সংগ্রহ", "শ্রীশ্রীলোকনাথ-মাহাত্ম্য", "শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ" ও "শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু-কথামৃত" হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থের প্রণেতা ও প্রণেত্রী যথাক্রমে শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ ভারতী, শ্রীযামিনীকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীকেদারেশ্বর সেনগুপ্ত, শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীমতী শরৎকামিনী বসু—ইঁহারা সকলেই আমার আন্তরিক শ্রদ্ধাভাজন; আমি ইঁহাদের প্রত্যেকের নিকট এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি প্রণয়নের জন্য ঋণী।

ব্রহ্মচারী বাবার বিশিষ্ট ভক্ত ও নাম-প্রচারক শ্রীনিশিকান্ত বসু মহাশয় এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি মুদ্রাঙ্কনের পূর্ব্বে বিশেষ অভিনিবেশের সহিত পাঠ করিয়াছেন, এবং তাঁহার সহায়তায় ইহার অনেক ত্রুটি সংশোধিত হইয়াছে। তাঁহাকে আমার অশেষ ধন্যবাদ। আমি তাঁহার নিকট ঋণী।

আমার অশেষ ধন্যবাদ কলিকাতা প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে। প্রথম আলাপেই তিনি বইখানা প্রচার-কল্পে ছাপানোর আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাঁহার পিতা স্বর্গত জগদীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে ঢাকায় আমার আলাপ ছিল। ধর্ম্মপ্রাণ পিতার ধর্ম্মপ্রাণ পুত্র। মুদ্রাঙ্কন ইত্যাদির যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়া বইখানার প্রচার-কার্য্যের জন্য আমি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

এই গ্রন্থে আমরা শ্রীশ্রীব্রহ্মচারী বাবার বিচিত্র জীবনের ঘটনা-বলীর যথাসম্ভব ধারাবাহিকতা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

তাঁহার অলৌকিক জীবনীর অতি সামান্যই এখানে প্রকাশ। ইহা পাঠে ভক্ত-হৃদয়ে যদি সামান্যমাত্র অনুভূতিও জাগ্রত হয়, তবে আমরা কৃতার্থ হইব।

তরুণমতিরাও যাহাতে মহাপুরুষের এই জীবনী পাঠে উপকৃত হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, ইহার ভাষা যথাসম্ভব সহজ ও সরল করা হইয়াছে। ব্রহ্মচারী বাবার জীবনের ঘটনাবলীতে একটা আকর্ষণী শক্তি আছে,—পড়িতে পড়িতে এই কথাই মনে জাগে।

শ্রীশ্রীব্রহ্মচারী বাবার নিজ হাতের লেখা ভক্তসমাজে একটি দুর্লভ বস্তু। ইহার আলোক-চিত্র কয়খানি এ গ্রন্থের বিশেষ গৌরব। মহাপুরুষের স্মৃতি-চিহ্নস্বরূপ ইহা ভক্তমাত্রেরই মঙ্গলাবহ অমূল্য সম্পদ্।

ভক্ত যাহা পাইয়াছেন, ভক্ত তাহা পাইবেন,—ইহা আমাদের দৃঢ় ভক্তিপূর্ণ বিশ্বাস। ইতি

নিবেদক
শ্রীরমেশচন্দ্র সরকার।

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ড

তৃতীয় খণ্ড

শ্রীশ্রীলোকনাথ-স্তবস্তোত্র ও শ্রীশ্রীলোকনাথ-গীতি

স্নেহাস্পদ শ্রীমান সুধীরচন্দ্র সেন,

শিক্ষকতাব্রতে চেষ্টা করেছি মাত্র তোমাদের কাজে লাগতে। ত্রিশ বৎসরেরও অধিককাল কর্ম্ম-জীবনে হাজার হাজার ছেলের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে। প্রথম পরিচয়কালে তুমি ছিলে তিন কি চার বৎসরের শিশুটিমাত্র। তারপর তাঁহারই ইচ্ছায় তোমার ছাত্রজীবনের ম্যাট্রিকুলেশান পর্য্যন্ত আমরা একত্র থাকি। অবস্থার পরিবর্ত্তন হেতু ত্রিশ বৎসরেরও অধিককাল আমার নিকট তুমি এবং তোমার নিকট আমি নিখোঁজ।

হঠাৎ সেদিন কলিকাতা—গড়িয়াহাট মার্কেটের রাস্তায় তোমার ব্যস্ত-সমস্ত ডাক শুনলাম, "মাষ্টার মশাই, মাষ্টার মশাই।"

তোমার ঘরে পরম দয়াল গুরু শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবার তৈলচিত্র মূর্ত্তিখানি দর্শন করে ভাবলাম,—যাঁহার অযাচিত কৃপায় আমার প্রতিটি দিন আনন্দে চলেছে, তুমি ছাত্রজীবনে বইপুঁথির সঙ্গে তাঁকেও ধরেছ।

তোমারই আন্তরিক অনুপ্রেরণায় আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

১লা মাঘ, ১৩৬৬
১৬. ১. ১৯৬০

মাষ্টার মশাই
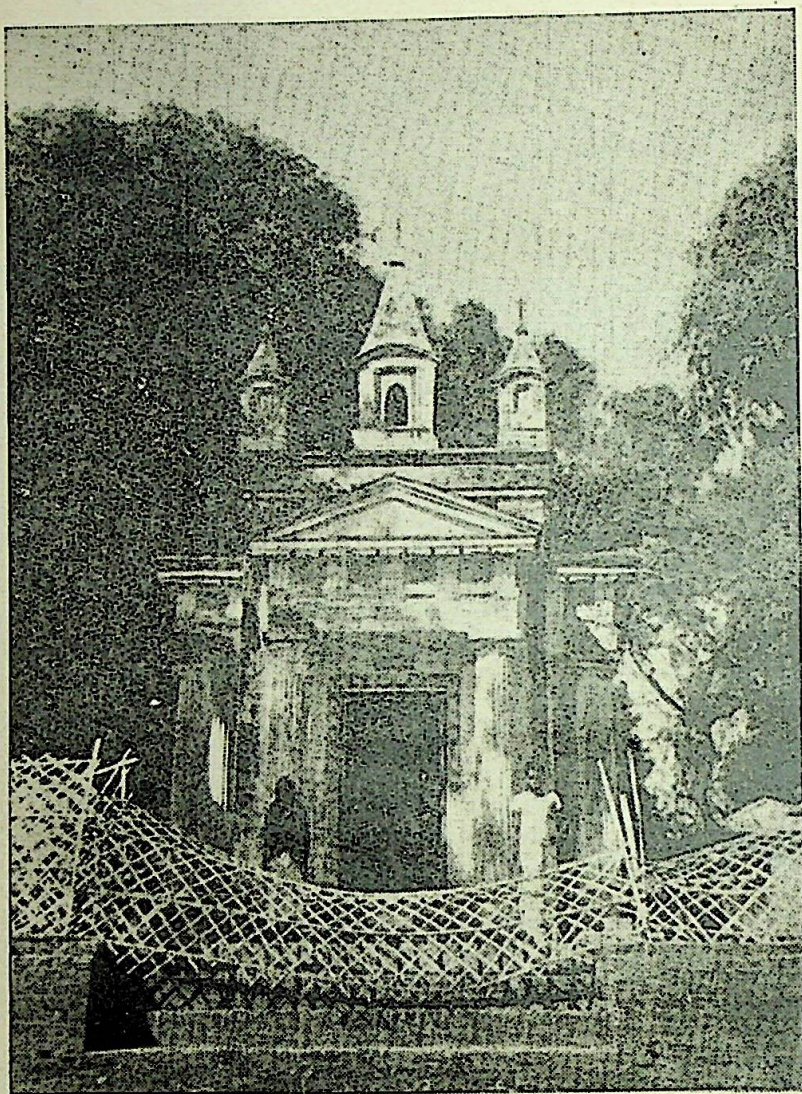
শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবার সমাধি-মন্দির, বারদী (ফটো ১৯৬০)
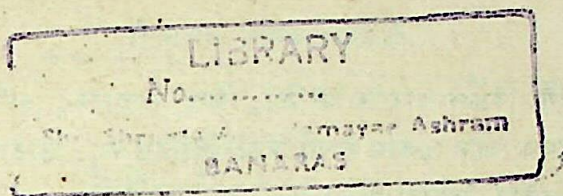
শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী

প্রথম খণ্ড

শ্রীসীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

তিন শতাধিক বৎসরেরও পূর্ব্বের কথা[১]। বর্দ্ধমান জেলায় দামোদর নদের তীরে বেরুগ্রাম অবস্থিত ছিল। গ্রামটি ছিল ব্রাহ্মণপ্রধান ও বর্দ্ধিষ্ণু। সেখানের বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের এক পরিবারে একটি শিশু জন্মগ্রহণ করিলেন। যথাযথ জাতকর্ম্মাদিতে এই শিশুর নাম রাখা হইল শ্রীসীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শৈশব হইতেই সীতানাথ বড় শান্ত-স্বভাব ও গম্ভীর-প্রকৃতি। বালকসুলভ ক্রীড়াকৌতুকে তাঁহাকে বড় দেখা যায় না। কৈশোর অবস্থায়ও সীতানাথ একা একা থাকিতেই ভালবাসেন—প্রায়ই যেন কি ভাবেন। উপনয়নের পর হইতে তাঁহার গাম্ভীর্য্য আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

চারি ভ্রাতার মধ্যে সীতানাথই সর্ব্বকনিষ্ঠ। সেই যুগে যতটুকু সাধারণ শিক্ষা পাওয়া সম্ভবপর, টোলে সীতানাথ তাহা পাইলেন। সমবয়সী বন্ধুরা যুবক সীতানাথের সঙ্গে অনেক

১ শ্রীশ্রীসীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবিতকাল অন্ততঃ ৪০ বৎসর। তাঁহার দেহরক্ষার কম বেশী ৪০ বৎসর পর শ্রীশ্রীলোকনাথ জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মচারী বাবা লৌকিক দেহধারণ ১৬০ বৎসর [দেহরক্ষা ইং ১৮৯০ সন]। ইহার পর হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত—মোট ৩০৯ বৎসর।

সময় ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতে আসিত, কিন্তু তাহাদের হাসি-তামাসা সীতানাথের মনে কোন সাড়া দিতে পারিত না ; তাহারা বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইত।

সীতানাথের অগ্রজেরা তিন জনই বিবাহিত। সীতানাথ সংসারাবদ্ধ হইবেন না স্থির করিলেন। তাঁহার ভ্রাতৃবধূরা কত চেষ্টা, কত সাধ্যসাধনা করিলেন, কিন্তু সবই বৃথা—সীতানাথ বিবাহ করিলেন না। আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবে তাঁহাকে কত রকম বুঝাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু সীতানাথ অটল, স্থিরপ্রতিজ্ঞ।

বাড়ীতে সীতানাথের জন্য নির্দ্দিষ্ট একটি ঘর ছিল। দিবা-রাত্র প্রায় সব সময়েই তিনি একাকী আপন মনে এই ঘরে কাল কাটাইতেন। শূন্যমনে এরূপ ভাবে ঘরে বসিয়া বসিয়া কালক্ষেপ করা কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নয়, বাহ্য ব্যাপারে অনাসক্ত সীতানাথের পক্ষে আরও নয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে অর্জ্জিত সুকৃতির ফলে, এই জন্মেও সীতানাথ পূর্ব্বাভ্যাসের আবৃত্তি করিতেন—আপন কুটীরে বসিয়া তিনি তাঁহার আরাধ্য দেবতার উপাসনা করিতেন। তিনি সংসারে থাকিয়াও উদাসী। এইরূপে চল্লিশ বৎসরেরও অধিক কাল অনাসক্ত ভাবে তাঁহার জীবিতকাল কাটিয়া গেল। চল্লিশ হইতে পঞ্চাশ বৎসর বয়সের মধ্যে এই সীতানাথ জীবনের অবসান ঘটিল।

শ্রীশ্রীলোকনাথ ঘোষাল

জন্ম, উপনয়ন ও সন্ন্যাসগ্রহণ

পার্থিব বাসনার শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত জীবাত্মার পুনর্জন্ম। আর বাসনার বিলয়ে জীবাত্মার মুক্তিলাভ।

শ্রীসীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেহত্যাগের অন্ততঃ ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর পরের কথা[১]। বাংলার মসনদে তখন মুর্শীদকুলি খাঁ।

কলিকাতার উত্তর-পূর্ব্ব-কোণে বারাসত মহকুমা অবস্থিত। খুলনা-যশোহর পথ বারাসতের মধ্য দিয়া কলিকাতা অভিমুখে চলিয়া আসিয়াছে। পথে কলিকাতা হইতে বারাসত কমবেশী দুই ঘণ্টার রাস্তা। বারাসত হইতে বিখ্যাত টাকি গ্রামের অভিমুখে যে রাস্তা চলিয়া গিয়াছে, সেই রাস্তার নিকটবর্ত্তী কাঁকড়া-কচুয়া গ্রামে রামকানাই ঘোষাল মহাশয়ের নিবাস ছিল। ঘোষাল মহাশয়ের স্ত্রীর নাম কমলা দেবী। ধর্ম্মনিষ্ঠার জন্য ঘোষাল পরিবার চতুর্দ্দিকে বিশ্রুত। সেকালে লোকের বিশ্বাস ছিল যে, কোন ব্রাহ্মণকুমার উপনয়ন-অন্তে গৃহে সমাবর্ত্তন না করিয়া যদি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ব্রত গ্রহণ করিয়া গৃহত্যাগ করেন, তবে তাঁহার এই অনুষ্ঠানের ফল-স্বরূপ ঐ বংশের উদ্ধার সাধন হইবে—অর্থাৎ মুক্তির জন্য পিণ্ডদানের আর আবশ্যক হইবে না।

১ এই গ্রন্থে শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারীবাবা তাঁহার "জাতিস্মরতা" সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন,—"বেরুগ্রামে যাইয়া প্রাচীন লোকদিগকে সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে যতই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম, ততই তাঁহাদের প্রদত্ত উত্তর আমার দ্বিতীয় মাসাহব্রতের পূর্ব্ব-জন্ম স্মৃতি জাগরণের বিবরণের সঙ্গে মিলিতে লাগিল।" এখানে "প্রাচীন" শব্দটি লক্ষণীয়। যে সময়ের কথা আমরা বলিতেছি, তখন সাধারণতঃ মানুষ দীর্ঘজীবী ছিল। তখন "প্রাচীন" বলিলে কম পক্ষে আশি, নব্বই বা এক শত বৎসর বয়স বুঝাইত। বেরুগ্রাম দর্শন কালে লোকনাথের বয়স ছিল পঞ্চাশ। সুতরাং তখনকার প্রাচীন লোক ও লোকনাথের বয়সের ব্যবধান কম পক্ষে ত্রিশ-চল্লিশ ধরা যাইতে পারে।

রামকানাইর বড়ই আকাঙ্ক্ষা যে তাঁহার বংশে একটি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হয়। প্রথম পুত্র ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরই রামকানাই স্বীয় ইচ্ছা পত্নী কমলা দেবীর নিকট ব্যক্ত করিলেন; কিন্তু স্বামীর প্রস্তাবে কমলাদেবী সম্মত হইলেন না। প্রথম সন্তান বলিয়া রামকানাইও পীড়াপীড়ি করিলেন না। কালক্রমে তাঁহাদের ঘরে দ্বিতীয় কুমার জন্মগ্রহণ করিলেন। এবারও স্বামীর অনুরোধ কমলাদেবী রক্ষা করিলেন না। পিতামাতা এক মত হইয়া একযোগে আশীর্ব্বাদ করিলে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী, এইরূপে তৃতীয় কুমারের আগমনেও মাতা কমলাদেবী পূর্ব্ববৎ অটল রহিলেন।

চতুর্থ কুমার জন্মগ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই কি জানি কেন মাতা শিশুর মুখ-কমল দর্শন করিয়াই স্বামীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। রামকানাই নিকটে আসিলে তিনি বলিলেন, "প্রথম তিন কুমার গৃহী হইবে—ইহা আমার অভিপ্রায়। এই শিশুর নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হইতে আমার কোন আপত্তি নাই।" এই নবজাত শিশুর ভবিষ্যৎ মঙ্গলময় জীবন যেন দর্শনমাত্রই মায়ের মানসপটে প্রকট হইয়া উঠিল। তাঁহার মনে হইল—এই শিশু মহাশক্তি লইয়া তাঁহার ঘরে আসিয়াছেন। শিশু মায়ার অতীত। ইহার দিব্য আকৃতিতে জগতের মঙ্গল সূচিত হইতেছে। মাতৃস্নেহের অমৃতধারা জগতের প্রাণীমাত্রেরই কল্যাণকল্পে বিশাল হইয়া উঠিল। তাই মাতা কমলাদেবী প্রফুল্ল অন্তরে ও হাসি মুখে স্বীয় স্বামীকে এই কুমারের পূর্ণ অধিকার ছাড়িয়া দিলেন। রামকানাইর বহু দিনের বাসনা পূর্ণ হইতে চলিল।

বেরুগ্রামের সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেহস্থিত জীবাত্মাই রামকানাই ঘোষাল ও কমলা দেবীর এই চতুর্থ কুমারের দেহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন[১]।

১ এই গ্রন্থে "জাতিস্মরতা" দ্রষ্টব্য।

এই সময়ে কাঁকড়া-কচুয়া গ্রামে ভগবান গাঙ্গুলী নামে এক সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ মহাজ্ঞানী পণ্ডিত বাস করিতেন। কনৌজ হইতে বঙ্গের মহারাজা আদিশূর যে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আনিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই একজন গাঙ্গুলী মহাশয়ের আদি পুরুষ। তখনকার দিনে ভারতের তেলেগু, দ্রাবিড়, কর্ণাট, মিথিলা ও বঙ্গ প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের পণ্ডিতসমাজে ভগবান গাঙ্গুলী মহাশয়ের নাম এবং তাঁহার পাণ্ডিত্যের কথা সকলেই জানিতেন। সমগ্র ভারতের পণ্ডিত-সমাজই তাঁহাকে রাজ-পণ্ডিত বলিয়া স্বীকার ও শ্রদ্ধা করিতেন। বড় বড় ক্রিয়াকলাপে যেখানেই ভারতের বিভিন্ন স্থানের পণ্ডিতসমাজ আমন্ত্রিত হইতেন, সেখানেই সেই পণ্ডিত-সভায় সভাপতিরূপে তিনি আদৃত ও সম্মানিত হইতেন। তাঁহার শাস্ত্রমীমাংসা সকলেই একবাক্যে গ্রহণ করিতেন। এক কথায় ভগবান গাঙ্গুলী জ্ঞানমার্গাবলম্বী মহাপণ্ডিত ছিলেন।

ব্রহ্মাণ্ডের হিতের জন্য যেখানে যে জিনিষের দরকার, বিধাতা তাহা যথাসময়ে সেখানে রাখিয়া দেন। সীমাবদ্ধ জীব সেই অসীম শক্তির প্রভাব কিরূপে বুঝিবে? ভগবান গাঙ্গুলী মহাশয় ঘোষাল পরিবারের পরম হিত-কামী। রামকানাইর জীবনের যত কিছু ঘটনা বা কার্য্য, তাহা সবই তিনি ভগবান গাঙ্গুলীকে জানাইতেন, এবং তাঁহার উপদেশমত সর্ব্বদা চলিতেন। চতুর্থ কুমারের জন্মগ্রহণ ও কমলা দেবীর সম্মতি-প্রদান সংবাদ লইয়া অচিরে তিনি গাঙ্গুলী-বাড়ী উপস্থিত হইলেন। বৃত্তান্ত অবগত হইয়া গাঙ্গুলী মহাশয় তখনই নবজাত শিশুকে দেখিতে আসিলেন। তিনি শিশু-অঙ্গে অনেক শুভলক্ষণ দর্শন করিলেন। শিশুর বিস্তৃত ললাট, কর্ণপ্রসারী নয়নযুগল, উন্নত নাসিকা, মহাবাহু ও দীর্ঘ-দেহযষ্টিতে ভবিষ্যৎ মহাপুরুষের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইল। যথা-সময়ে শাস্ত্রানুসারে শিশুর জাতকর্ম্মাদি আচার্য্য ভগবান গাঙ্গুলী সম্পন্ন করিলেন, এবং যথাযথ কোষ্ঠীবিচারে এই কুমারের নাম

রাখা হইল শ্রীশ্রীলোকনাথ ঘোষাল। 'লোকনাথ' লোকের নাথ। 'লোকনাথ' নামটিই এই মহাশিশুর ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিল।

মহাজ্ঞানী ভগবান গাঙ্গুলী পরিবার-পরিবৃত থাকিয়াও অনাসক্ত ভাবে কালযাপন করিতেছিলেন। তিনি গৃহী হইয়াও সন্ন্যাসী। নবজাত কুমারকে যথাসময়ে সন্ন্যাস ব্রত দান ও তাঁহার ভারগ্রহণ করার জন্য পিতা রামকানাই গাঙ্গুলী মহাশয়কে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন। এই শিশুর সুলক্ষণাদি দর্শন করিয়া জ্ঞানবৃদ্ধ গাঙ্গুলী মহাশয় ইঁহার ভার গ্রহণ করা সৌভাগ্য-জনিত কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিলেন। তিনি রামকানাইর প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করিলেন।

রামকানাই ঘোষালের চতুর্থ পুত্র শ্রীশ্রীলোকনাথের জন্মসংবাদ অতি অল্পকালের মধ্যেই চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। লোকে ইহাও জানিল যে, মহাপণ্ডিত ভগবান গাঙ্গুলী মহাশয় যথাসময়ে এই বালকের উপনয়নক্রিয়াদি সম্পন্ন করিয়া ইঁহাকে সঙ্গে লইয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন এবং চিরকালের জন্য সংসারধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বনবাসী হইবেন। কি অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ! কি মহান্ আদর্শ! জগতের হিতকল্পে এই মহাশিশুর পরিচালন-ভার গ্রহণ! তখন ভগবান গাঙ্গুলীর বয়স পঞ্চাশের অতি নিকটবর্ত্তী।

দিনের পর দিন দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ এই শিশুর দর্শন লাভের জন্য চতুর্দ্দিক হইতে আসিতে লাগিল। এই মহাশিশুর শুভাগমনে ঘোষাল-বাড়ী একটি তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইল।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বালকের মনে যাহাতে জ্ঞানের উন্মেষ হয়, এইরূপ চিত্তাকর্ষক আখ্যান ও উপদেশাদি গুরুজনেরা সর্ব্বদা তাঁহাকে বলিতে ও দিতে লাগিলেন। তিনিও ঐ সকল আখ্যান ও উপদেশ অতি মনোযোগের সহিত শ্রবণ ও পালন করিতেন।

সঙ্গে সঙ্গে এই বয়সে যতটুকু লেখাপড়ার চর্চ্চা করা সম্ভবপর তাহাও চলিতে লাগিল।

শিশুসুলভ চপলতাও এই বালকের মধ্যে কম ছিল না। গ্রামের সমবয়সী ছেলেদের তিনি ছিলেন নেতা। ঘণ্টাকর্ণ বা ঘেঁটুদেবতা শিবের অন্যতম বাহন। গ্রামের লোকেরা একত্র হইয়া গ্রামের বসতির বাহিরে পঞ্চবটী বা তদ্রূপ কোনও স্থলে এই ঘেঁটুদেবতার মূর্ত্তি গড়িয়া প্রতিবৎসর মহাসমারোহে তাঁহার পূজা করিতেন। আর এই দিকে শ্রীলোকনাথ আপন সঙ্গীদিগকে লইয়া পূজা-অন্তে দেবতার প্রসাদ পাওয়ার অপেক্ষায় উপস্থিত থাকিতেন। প্রসাদ বিতরণের পর পূজার্থীদের পূজাস্থান পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে অনুচরসহ এই তরুণ নেতা লগুড় প্রহারে ঘেঁটুমূর্ত্তি ধূলিসাৎ করিয়া দিতেন। এ যেন দ্বিতীয় কালাপাহাড়!

এইরূপে একদিকে জ্ঞানগর্ভ উপদেশ গ্রহণে ও অপর দিকে শৈশবের খেলাধূলায় লোকনাথের দিনগুলি কাটিয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে তিনি একাদশ বৎসর বয়সে উপনীত হইলেন, উপনয়নকাল উপস্থিত হইল।

গ্রামে বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় নামে লোকনাথের সমবয়সী আর একটি প্রিয়দর্শন বালক ছিলেন। এই দুই বালকের মধ্যে অতি মধুর ঘনিষ্ঠ ভাব ছিল। বেণীমাধব যখন শুনিলেন যে, লোকনাথ উপনয়ন-অন্তে চিরব্রহ্মচারী হইতে চলিয়াছেন, তখন তিনিও মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন যে তিনিও ব্রহ্মচারী হইবেন। কিন্তু তাঁহার অভিভাবকগণ ইহাতে প্রথমে সম্মত হইলেন না। লোকনাথ ও বেণীমাধবের উপনয়ন-ক্রিয়া এক তারিখেই নির্দ্ধারিত হইল। শুভকার্য্যের দিন যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, বেণীমাধব ততই তাঁহার আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে তিনি উপনয়নক্রিয়া অন্তে ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করিয়া গৃহত্যাগ করিবেন।

উপনয়নের শুভদিন উপস্থিত। ভারতের বিভিন্ন স্থানের পণ্ডিত-সমাজ আজ রামকানাই ঘোষালের সাদর আমন্ত্রণে তাঁহার গৃহে সমাগত। বেণীমাধবকে লইয়া এক বিভ্রাট বাঁধিল। বেণীমাধবের অভিভাবকগণ তাঁহার সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণের প্রতিকূলে দাঁড়াইলেন,—কিছুতেই তাঁহারা তাঁহাকে গৃহত্যাগের অনুমতি দিতেছেন না। বেণীমাধবও দমিবার পাত্র নন। গুরুজনেরা যতই ব্রহ্মচর্য্যের বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, বালকের আগ্রহও ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শুভদিনে উপনয়নের নির্দ্দিষ্ট লগ্ন উপস্থিত, অথচ বেণীমাধবের শুভকার্য আরম্ভ হইতে পারিতেছে না। অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া অভিভাবকেরা বিষয়টি ঘোষাল-বাড়ীতে সমাগত-পণ্ডিত সভায় উপস্থাপিত করিলেন। অনেক বাগবিতণ্ডা ও তর্কবিতর্কের পর উপস্থিত পণ্ডিতমণ্ডলী বেণীমাধবের পক্ষে রায় দিলেন। স্থির হইল ভগবান গাঙ্গুলী মহাশয় লোকনাথ ও বেণীমাধব উভয়েরই আচার্য্যগুরু হইয়া তাঁহাদের উপনয়ন-ক্রিয়া সম্পন্ন করিবেন, এবং তাঁহাদিগকে সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া সঙ্গে লইয়া গৃহত্যাগ করিবেন। সৎকর্ম্মে শতেক বাধা বেণীমাধবের বেলায় বিফল হইল।

মহাসমারোহে ভগবান গাঙ্গুলী মহাশয় এই বালকদ্বয়ের উপনয়ন-ক্রিয়াদি নিষ্পন্ন করিলেন।

এখন বিদায়ের পালা। গৃহত্যাগের নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইল। ঘোষাল-বাড়ী নিমন্ত্রিত-অনিমন্ত্রিত লোকে পূর্ণ। যথাসময়ে বেণীমাধবকে ঘোষাল-বাড়ীতে আনা হইল।

গুরু ভগবান গাঙ্গুলীর বয়স তখন ষাট বৎসর। তাঁহার পুত্রও এই সময় উপাধিপ্রাপ্ত পণ্ডিত হইয়া সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। সংসারের সকল বিষয় পুত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া তিনি আজ সন্ন্যাসী সাজিয়াছেন। তাঁহার দেহকান্তি জ্যোতির্ম্ময়, মুখমণ্ডল দীর্ঘশ্মশ্রুশোভিত, পরিধানে গেরুয়াবসন, হস্তে কমণ্ডলু।

পরিবারের লোকদিগকে যথাবিহিত উপদেশাদি প্রদান করিয়া তিনি সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করতঃ গৃহ হইতে জন্মের মত বহির্গত হইলেন।

প্রাতঃকাল। গুরু ভগবান ঘোষাল-বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সমাগত স্ত্রী-পুরুষ সকলের মুখমণ্ডলই বিষাদময়,—সকলেই নীরব। উপনয়ন-কুটীর হইতে মুণ্ডিত-মস্তক, চন্দনানুলিপ্ত, পুষ্পমাল্য-শোভিত ও চেলিবস্ত্র পরিহিত সুকুমার ব্রহ্মচারীদ্বয় প্রসন্ন-বদনে বহির্গত হইয়া আসিয়া চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে আঙ্গিনায় আচার্যের বাম পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। মণ্ডপ-প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য। আচার্য্য ভগবান গৃহীর সংসার চিরতরে পরিত্যাগ করিয়া সুকুমার শিষ্যদ্বয়সহ বনবাসী সংসারের দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিতেছেন। আর ব্রহ্মচারী বালকদ্বয় ভবিষ্যৎ জীবনের সুখকল্পনায় স্মিতমুখে গুরুর শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিতেছেন। সন্ন্যাসব্রত গ্রহণের এই দৃশ্য কি অপরূপ! কি করুণ! কি মর্ম্মস্পর্শী[১]!

উপস্থিত দর্শকগণের মধ্যে বয়স্কেরা এই কোমল-প্রাণ ব্রহ্মচারী-দ্বয়কে মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং অন্যেরা বিধাতার নিকট ইহাদের মঙ্গল-কামনা করিলেন। যাঁহারা পারিলেন, তাঁহারা নীরবে সহ্য করিলেন; আর যাঁহারা পারিলেন না, তাঁহারা বস্ত্রাঞ্চলে চোখ ঢাকিলেন।

গুরু ভগবান লোকনাথ ও বেণীমাধবকে অগ্রে রাখিয়া শুভযাত্রা করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মাঙ্গলিক উলুধ্বনিতে ও শঙ্খনাদে চতুর্দ্দিক মুখরিত ও নিনাদিত হইয়া উঠিল। জনতার অধিকাংশ গ্রামের শেষ সীমারেখা পর্য্যন্ত সশিষ্য গাঙ্গুলী মহাশয়ের অনুসরণ করিল।

জানিনা তখন স্নেহময়ী মাতা কমলাদেবীর কি অবস্থা!

১ "সন্ন্যাস ব্রত শুধু ব্যক্তিগত মুক্তি সাধনার ব্রত নয়। এ ব্রতের উদ্দেশ্য জগতের সামগ্রিক কল্যাণ সাধন।"—শ্রীদিলীপকুমার রায়।

কলিকাতায়—কালীঘাটে

"কোথায় আপনা ফেলে চলেছি কোথায়!
মনোমাঝে কাঁর যেন ডাক শুনা যায়।
কে জানে কোন্ দূর দেশে আমায় নিতেছে ভেসে,
ধূ ধূ করে দুই পাশে বিজন বেলা।"

সশিষ্য গুরু ভগবান গাঙ্গুলী মহাশয় ইতিহাস-প্রথিত রাজা প্রতাপাদিত্য-নির্ম্মিত রাজপথ ধরিয়া পশ্চিম দিকে চলিতে লাগিলেন। যথাসময়ে তাঁহারা কলিকাতায় পৌঁছিলেন। তখনকার কলিকাতা বনজঙ্গল ও জলাভূমি-সমাকীর্ণ গ্রামাঞ্চল ছিল, এবং বাদা মুল্লুকের সংলগ্নভূমিরূপে এখানে সাপ, বাঘ ও কুমীরের রাজত্ব ছিল। কলিকাতার প্রাচীন ইতিবৃত্তে দেখা যায়, কলিকাতার বর্ত্তমান ঘোড়দৌড় মাঠের সম্মুখবর্ত্তী পুলিশ হাসপাতালের নিকট গভীর জঙ্গল ছিল, ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ সেখানে বাঘ শিকার করিতেন। মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে সাগরযাত্রীর দল গঙ্গার ধারে ছাউনি ফেলিয়া রাত্রি যাপন করিত, এবং প্রায়ই দেখা যাইত যে কুমীরে ইহাদের দুই চারি জনকে টানিয়া লইয়া গিয়াছে।

কলিকাতায় পৌঁছিয়া তাঁহারা কালীঘাট অঞ্চলে আসিলেন। কালীঘাট ভারতের একান্নটি পীঠস্থানের অন্যতম হিন্দুতীর্থ। এ স্থান তখন গভীর বনজঙ্গলাকীর্ণ। শ্রীশ্রীকরুণাময়ী কালীমাতার মন্দির ও তৎসংলগ্ন বনানী তখন পরম সাধনা-স্থল ছিল। বহু সাধু-সন্ন্যাসী এখানে আশ্রম করিয়া নিজ নিজ সাধন ভজন করিতেন। বাস্তবিকই কালীঘাট তখন একটি প্রশান্ত তপোবন ছিল। ভগবান গাঙ্গুলী এখানে একটি স্থান বাছিয়া লইলেন। অতি অল্পকালের মধ্যেই লোকনাথ ও বেণীমাধবের অক্লান্ত চেষ্টায় স্থানটি রীতিমত ব্রহ্ম-চারীদের বাসযোগ্য হইয়া উঠিল। তাঁহাদের কালীঘাটের

আপাততঃ অবস্থানের সংবাদ তাঁহাদের পরিত্যক্ত কাঁকড়া-কচুয়ার বাড়ীর লোকদের জানা ছিল। সময় সময় বাড়ী হইতে তাঁহাদের খরচ-বাবদ কিছু কিছু অর্থ সাহায্য আসিত, এবং সন্ন্যাসী গুরু ভগবান ইহা ভিক্ষাস্বরূপ গ্রহণ করিতেন।

কালীঘাটে গুরু ভগবান বালক-ব্রহ্মচারীদের কর্ম্মমার্গে প্রাথমিক শিক্ষাদান আরম্ভ করিয়া দিলেন। সময় বেশ কাটিতে লাগিল। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই দেখা গেল, এখানে কাঁকড়া-কচুয়ার বালক নেতা লোকনাথের অঙ্গ-চালনার সুযোগের কতটা অভাব। সুচতুর বালকের পক্ষে এই অভাব পূরণ করিতে আর কতক্ষণ লাগে! বেণীমাধবসহ তিনি একটা উপায় উদ্ভাবন করিয়া কাজে লাগিয়া গেলেন।

দীর্ঘজটাজুটধারী ভস্মমণ্ডিতদেহ সাধু-সন্ন্যাসীতে এই বন পূর্ণ। মনুষ্যের যে এমন অদ্ভুত আকৃতি হইতে পারে, বালকদ্বয় এই প্রথম আবিষ্কার করিলেন; সুতরাং সাধুসন্ন্যাসিগণ এই বালকদের নিকট অভিনব জীব বলিয়া পরিগণিত হইলেন। সন্ন্যাসিগণ যখন ধ্যানমগ্ন থাকিতেন, তখন দুই বালক নিঃশব্দে তাঁহাদের কাঁহারও কাঁহারও অতি নিকট অগ্রসর হইয়া তাঁহাদের জটা ও কৌপিন হাতে ধরিয়া দেখিতেন—স্পর্শে কেমন লাগে। ইহাতে সময় সময় ধ্যানে বিঘ্ন ঘটিলেও সন্ন্যাসীরা বিশেষ আপত্তি করিতেন না। কিন্তু বালকেরা ক্রমশঃ মাত্রা একটু একটু করিয়া চড়াইতে লাগিলেন, এবং অবশেষে সুযোগ বুঝিয়া পিছন হইতে কাঁহারও বা জটা, কাঁহারও বা নেংটি ধরিয়া নিজেদের শরীরে কিরূপ শক্তি-সঞ্চয় হইয়াছে তাহা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। ইহাতে সন্ন্যাসীদের ধ্যানভঙ্গ হইয়া যাইত, এবং তাঁহারা চোখ ফিরান মাত্রই বালকেরা ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতেন। সন্ন্যাসীদের পক্ষে পশ্চাদ্ধাধন করিয়া বালকদিগকে ধরা সম্ভবপর নয়; সুতরাং তাঁহারা সেরূপ চেষ্টাও করিতেছেন না দেখিয়া বালকদ্বয়ের এই খেলার

সৎ-সাহস ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অপর পক্ষে ইহা সন্ন্যাসীদের সাধনার বিঘ্নস্বরূপ হইয়া উঠিল। ইহাদের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া অবশেষে তাঁহারা এক দিন গুরু ভগবানকে এই অবস্থা জানাইলেন। ভগবান অতি অল্প কথায় তাঁহাদিগকে নিজের ও শিষ্যদের ইতিহাস জানাইয়া দিয়া বলিলেন, "বালক দুইটি আপনাদেরই লোক। আমি ইহাদিগকে গৃহ হইতে আনিয়া আপনাদের নিকট উপস্থিত করিয়াছি। আপনারা ইহাদিগকে প্রস্তুত করিয়া নিন্।" গাঙ্গুলী মহাশয়ের এই উত্তর শুনিয়া সন্নাসীরা আর কিছু বলিলেন না, করিলেনও না।

এই ঘটনার পর গুরু নিজ আশ্রমে ফিরিয়া শিষ্যদিগকে বলিলেন, "দেখ, তোমরা এই সাধুদের জটা খুলিয়া ফেলিতেছ, ইহাদের নেংটি ধরিয়া টানিতেছ। তোমরা যখন বড় হইয়া তাঁহাদের মত জটাধারী হইবে, এবং নেংটি পরিধান করিবে, তখন অন্যে যদি তোমাদের প্রতি এইরূপ আচরণ করে, তবে তোমাদের কেমন লাগিবে?"

গুরুমুখে এই কথা শুনিয়া সরলপ্রকৃতি বালক লোকনাথ কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি গুরুদেব! আমরা পৈতার দিন হইতে চেলি কাপড় পরিধান করিয়া আসিতেছি। আমাদের নেংটি হইবে কেন? আর জটাই বা কেন হইবে?"

তরুণ বালক লোকনাথের এই সরল প্রশ্নের উত্তরে গুরু তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে, ভবিষ্যতে তাঁহারা এই সন্ন্যাসীদের মত হইবেন বলিয়াই গুরু তাঁহাদিগকে লইয়া চিরকালের জন্য গৃহত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছেন। গুরুর এই বাক্যে বালকদ্বয়ের মনে তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের রেখাপাত এখানেই হইয়া রহিল,—তাঁহারা বুঝিলেন যে চিরতরে গৃহের সঙ্গে তাঁহাদের সম্বন্ধ বিলুপ্ত হইয়াছে। অতঃপর সন্ন্যাসীদের সঙ্গে চপলতা হইতে তাঁহারা বিরত হইলেন।

ব্রতানুষ্ঠান

কালীঘাটে কিছু কাল অবস্থানের পর, তাঁহারা গঙ্গা পার হইয়া বন-জঙ্গলের ভিতর দিয়া পশ্চিম দিকে যাত্রাপথ ধরিলেন। কিয়-দ্দূর অগ্রসর হইয়া তাঁহারা সেই অরণ্যানীর মধ্যে একটি নিভৃত স্থান বাছিয়া সাধুসন্ন্যাসীর বাসযোগ্য করিয়া লইলেন। এই সময়ে গুরু তাঁহাদিগকে ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে নিয়োগ করিলেন। নক্তব্রত আরম্ভ হইল। "নক্ত" শব্দটির অর্থ রাত্রি। এই ব্রতে দিনের বেলা গুরুনির্দ্দিষ্ট জপে তপে অনাহারে কাটাইয়া রাত্রিতে হবিষ্য ভোজন করিতে হয়। গুরু ভগবান শিষ্যদ্বয়কে ব্রত সাধনে বনের মধ্যে রাখিয়া দিনের শেষভাগে ভিক্ষা সংগ্রহের জন্য স্বয়ং লোকালয়ে যাইতেন, এবং তিল ও দুগ্ধ যাচ্ঞা করিতেন। তাঁহার সেই দিব্যমূর্ত্তি দর্শনমাত্রই গৃহীরা তাঁহাকে সাধক মনে করিয়া সাধ্যমত ভিক্ষা দিয়া কৃতার্থ হইত। আহারে সংযম নক্তব্রতের অন্যতম অঙ্গ; সুতরাং শিষ্যদ্বয়ের ও নিজের প্রয়োজন-সিদ্ধ দৈনন্দিন ভিক্ষার অতিরিক্ত তিনি কখনও গ্রহণ করিতেন না। ভিক্ষা সংগৃহীত হইলেই যথাসময়ে আবাসস্থলে ফিরিয়া আসিয়া তিনি নিজহস্তে ভিক্ষালব্ধ তিলদুগ্ধ দিয়া হবিষ্য প্রস্তুত করিতেন, এবং দেবতাকে নিবেদন করিয়া শিষ্যদিগকে আহার করিতে দিতেন এবং নিজেও আহার করিতেন।

ব্রহ্মচর্য্যের এই অবস্থায় যোগসাধন ও আহার বিষয়ে নিয়মাদি পালন অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। দেহরক্ষার জন্য আহার অনুষ্ঠানের নিয়ম অনুসারে ব্রতগুলির নাম যথাক্রমে :—

সর্ব্বপ্রথম নক্তব্রত—দিনে উপবাস, রাত্রিতে আহার। ইহার পর একান্তরা—পূর্ণ একদিন উপবাসী থাকিয়া, পরের দিন একবার আহার গ্রহণ। ত্রিরাত্রি—তিন দিন উপবাস করিয়া

চতুর্থ দিনে আহার। এইরূপে পঞ্চাহ—পাঁচ দিন উপবাস, নবরাত্রি—নয় দিন উপবাস, দ্বাদশাহ—বার দিন উপবাস, পক্ষাহ—পনের দিন উপবাস ও সর্ব্বশেষ মাসাহ—একমাস উপবাস। এই সকল ব্রতানুষ্ঠানে উপবাসকাল গুরু-নির্দ্দিষ্ট যোগাভ্যাসে অতিবাহিত করিতে হয়।

এই অষ্ট প্রকার ব্রতপালনে পূর্ব্বোক্ত ব্রতটি সম্পূর্ণরূপে অভ্যস্ত ও আয়ত্ত না হওয়া পর্য্যন্ত পরেরটিতে যাওয়ার অধিকার নাই। এই আট রকম ব্রত সুষ্ঠু পালন করিয়া সমাধা করিতে ব্রহ্মচারী লোকনাথ ও বেণীমাধবের প্রায় চল্লিশ বৎসর কাল কাটিয়া গেল। সুতরাং যখন প্রথম দফায় নক্তব্রতাদি উদ্‌যাপন শেষ হইল, তখন শিষ্যদের বয়স পঞ্চাশ, আর গুরুর বয়স এক শত বৎসর।

এই সকল ব্রত, বিশেষ করিয়া মাসাহ ব্রত উদ্‌যাপন কালে যাহাতে শিষ্যদের যোগাভ্যাসে কোন প্রকার বিঘ্ন না ঘটে, সে দিকে গুরু ভগবান বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। লোক-সমাজের নানা প্রকার আচার-ব্যবহার দর্শনে যোগসাধনের ব্যাঘাত ঘটিতে পারে, এই আশঙ্কায় তিনি শিষ্যদিগকে ব্রহ্মচর্য্যপালনের প্রথম-ভাগে লোকালয়ে যাইতে দিতেন না। তাঁহাদের যোগসাধনা বা ধ্যান যাহাতে ভঙ্গ না হয়, সেজন্য গুরু তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকার পরিচর্য্যা, এমন কি মলমূত্র অপসারণ ও শৌচক্রিয়াদি পর্য্যন্ত নিজহস্তে সমাধা করিয়া দিতেন। এমন পরম দয়াল গুরুর পূর্ণসঙ্গলাভ কয় জন শিষ্যের ভাগ্যে ঘটে!

এই সকল ব্রতপালনের শেষাংশে শিষ্যদের মনঃসংযোগ ও কষ্টসহিষ্ণুতা পরীক্ষা করার জন্য গুরু সময় সময় তাঁহাদিগকে পিপীলিকা ও মশক-উপদ্রুত স্থানে যোগাভ্যাসে বসাইয়া দিতেন। পিপীলিকার আহার-দ্রব্য ছড়াইয়া দিতেন। পিপীলিকা আনয়নের জন্য গুরু শিষ্যদের সংলগ্ন চতুর্দ্দিগস্থ স্থানে পিপীলিকার আহার

দ্রব্য ছড়াইয়া দিতেন। পিপীলিকার দল ছড়ান খাদ্য নিঃশেষ করিয়া, খাদ্য ভাবিয়া ব্রহ্মচারীদের শরীর দংশন করিত এবং যখন বুঝিত ইহা তাহাদের খাদ্য নয়, তখন উহারা আপনা হইতেই চলিয়া যাইত। মশককে নিমন্ত্রণ দিতে হয় না; আর ইহারা খাতির করিবার পাত্রও নয়। কীট-পতঙ্গাদির দংশন বা উৎপাত ব্রহ্মচারীদের যোগাভ্যস্ত দেহের কোন ক্ষতিই করিতে পারিত না। মনঃসংযোগ নষ্ট করা তো দূরের কথা।

মাসাহ পর্য্যন্ত ব্রতাদি উদ্‌যাপনের পর, বিশেষ বিশেষ পূজা-পার্ব্বণ উপলক্ষে গুরু শিষ্যদিগকে লইয়া সময় সময় লোকপূর্ণ মেলা-স্থলে যাইতেন, এবং তাঁহাদিগকে সেখানে যোগারূঢ় অবস্থায় বসাইয়া দিতেন। এই সকল ক্ষেত্রেও তাঁহারা পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে বিমুক্ত থাকিয়া গুরু-নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য একাগ্রচিত্তে সমাধা করিয়া যাইতেন।

এইরূপে বাহ্য জগতের উপদ্রবাদি বিষয়েও যাহাতে শিষ্যদের দেহ ও মন সম্পূর্ণরূপে অবিকৃত থাকে, গুরু তাঁহাদিগকে সেই শিক্ষাও দিতে লাগিলেন।
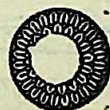
দ্বিতীয় মাসাহব্রত ও জাতিস্মরতা

সুদীর্ঘকাল গভীর বন-জঙ্গলে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ও তজ্জনিত আনুষ্ঠানিক ব্রতনিয়মাদি পালন করাইয়া গুরু ভগবান লোকনাথ ও বেণীমাধবের দেহ ও মন পরবর্ত্তী আরও কঠোর কার্য্যের জন্য প্রস্তুত করাইয়া তুলিতে লাগিলেন। তাঁহার আদেশক্রমে লোকনাথ ও বেণীমাধব উভয়েই দ্বিতীয় বারের জন্য "মাসাহব্রত" আরম্ভ করিলেন। বেণীমাধব এবার এই ব্রত সম্পূর্ণরূপে উদ্‌যাপন করিতে সমর্থ হইলেন না। লোকনাথের মাসাহব্রত অতি সুন্দরভাবে পালিত হইল।

দ্বিতায় বার এই মাসাহব্রত পালনকালে লোকনাথের লৌকিক জীবনে এক অলৌকিক ঘটনার উদয় হইল। তিনি যোগবলে একাগ্রচিত্তে মনঃসংযোগ করিয়া ধ্যানস্থ আছেন, এমন সময় এক অতীব বিস্ময়কর ঘটনার বিবরণ চলচ্চিত্রের ন্যায় তাঁহার মানসপটে প্রতিফলিত হইতে লাগিল। তিনি দেখিলেন,

বর্দ্ধমান জেলার মধ্য দিয়া বিশাল দামোদর নদ আপন মনে প্রচণ্ড গতিবেগে অনন্তের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। দামোদর তীরে অবস্থিত সমৃদ্ধিশালী ব্রাহ্মণ-প্রধান বেরুগ্রাম। এই গ্রামের সুবিখ্যাত বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের এক পরিবারে লোকনাথ নিজে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী জন্মে সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে কাল কাটাইতেছেন [১]। চারি ভ্রাতার মধ্যে তিনি সর্ব্বকনিষ্ঠ। সীতানাথ নির্জ্জনতা ভালবাসেন। তিনি চিরকুমার। তাঁহার তিন ভ্রাতৃবধূ ও পাড়ার সমবয়সীরা তাঁহাকে গৃহী করার বৃথা চেষ্টা করিতেছেন। সীতানাথ-জীবনে তাঁহার পিতার নামও লোকনাথের স্মৃতিপথে উদিত হইল। এইরূপে গৃহেই উদাসী থাকিয়া চল্লিশ

১ প্রথম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ওঁ

নির্ব্বিঘ্নো ভব।

হুঁ, বাবা উপদেশ দেওয়া একপ্রকার
কথা বিক্রী, সেটা আমার কাছে
মিঠা লাগেনা, কাজ চাই কাজ চাই
আমার নিষ্ঠা বড়ই পোষাকী,
অতএব উপদেশ কি দিব।

২। আমার মনে হইল, যে, পুলিশ
সাহেব তোমাকে ভালোবেসে উপর
শ্রেণীতে উঠাবেন তাহা অস্থায়ী
হইতেছেনা সেজন্য আমি চাকরীর
[illegible]

যদি আর্জি নামঞ্জুরে উপর কর্ম্ম
না পাওয়া যায় তবে কাজে কাজেই
আর্জি কর ইতি

ব্রহ্মচারী বাবার স্বহস্ত-লিখিত পত্র
(ডাঃ নিশিকান্ত বসু মহাশয়ের সৌজন্যে).

ব্রহ্মচারী বাবার স্বহস্ত-লিখিত পত্র

(ডাঃ নিশিকান্ত বসুর সৌজন্যে)

হইতে পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে কোন এক সময়ে তিনি "সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দেহ" ছাড়িয়া আসিয়াছেন।

এই মানস-চিত্র স্বপ্ন নহে। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর পক্ষে কঠোরতম ব্রত পালনের সময় কোন অলীক চিন্তা আসিতে পারে না। ইহা ধ্যান অবস্থায় লোকনাথের পূর্ব্বজন্মের স্মৃতির জাগরণ। দ্বিতীয় বার মাসাহব্রত পালনকালে তাঁহার পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি-জাগরণ বিধাতার দান। ইহাই শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারীর জাতিস্মরতা লাভ। ধ্যান ভঙ্গ হইলে সীতানাথ-স্মৃতি জাগরণের পূর্ণ বিবরণ তিনি গুরুর নিকট জ্ঞাপন করিলেন। জ্ঞানযোগী গুরু ভগবান কর্ম্মযোগী লোকনাথের আধ্যাত্মিক পুরস্কারলাভ শ্রবণে অত্যন্ত প্রীত হইলেন, এবং তিনি তখনই কালি-কলম-কাগজ আনিয়া দিয়া প্রিয়তম শিষ্যকে বলিলেন, "আনুপূর্ব্বিক সব বিবরণ লিখিয়া রাখ।" লোকনাথ গুরুর আদেশমত তাহাই করিলেন—এই বিবরণীতে সীতানাথ জন্মে তাঁহার পিতৃদেবের নামটি পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ হইল। গুরু অতি যত্নের সহিত এই বিবরণী নিজের নিকট রাখিয়া দিলেন, এবং সম্ভবতঃ ভাবিলেন—শ্রম সার্থক।

বেরুগ্রামে

নক্তব্রতাদি সফলতার সহিত উদ্‌যাপনের কিছু কাল পর গুরু ভগবান শিষ্যদ্বয়সহ স্থান ত্যাগ করিয়া বর্দ্ধমান জেলার পথ ধরিলেন। নূতন স্থানের অন্বেষণে যখনই তাঁহারা অগ্রসর হইতেন, তখনই গুরু ভগবান লোকনাথকে পথ-চালক করিয়া চলিতেন। ইহার কারণ তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, লোকনাথের জন্মান্তরের সংস্কারাদি তাঁহাকে তাঁহার উপযুক্ত কর্ম্মপথে চালাইয়া লইয়া যাইবে।

দীর্ঘপথ অতিবাহিত করার পর, তাঁহারা এক বিশাল নদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নদ-দর্শনে গুরু ভগবান লোকনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "লোকনাথ, এই নদ কখনও দেখেছ কি ?"

ঐ স্থানে আসামাত্রই লোকনাথের পূর্ব্বস্মৃতি অদ্ভুতরূপে জাগ্রত হইতে লাগিল। কিঞ্চিৎকাল ভাবিয়া তিনি উত্তর করিলেন, "হ্যাঁ, গুরুদেব, এই সেই নদ যাহা আমি আমার দ্বিতীয় বার মাসাহ ব্রতের সময় যোগাসনে দেখেছি।"

তখন তাঁহারা নিকটস্থ এক গ্রামাভিমুখে চলিলেন। যতই তাঁহারা অগ্রসর হইতেছেন, ততই লোকনাথের মনে হইতে লাগিল—এই সেই বেরুগ্রাম, তাঁহার পূর্ব্বজন্মের সীতানাথ-দেহের বাসস্থান। জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহারা জানিলেন—ইহা বেরুগ্রামই বটে। তাঁহারা গ্রামে প্রবেশ করিলেন। সৌম্যমূর্ত্তি গুরু ভগবানের সঙ্গে শান্তোজ্জ্বল ব্রহ্মচারী শিষ্যদ্বয়কে দেখিয়া গ্রামের অধিকাংশ লোকই তাঁহাদের সম্মুখে জড় হইল। প্রাচীনেরাও অনেকেই আসিলেন। গুরু ভগবান "সীতানাথ" প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে, প্রাচীনেরা স্বীকার করিলেন যে, তাঁহারা শৈশবে উদাসী সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা শুনিয়াছেন। তাঁহাদের সঙ্গে গুরু ভগবান ও লোকনাথের "সীতানাথ" সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইল। তাঁহারা সীতানাথ সম্বন্ধে যতই আলোচনা করিতে লাগিলেন, লোকনাথের স্মৃতিপটে তাঁহার জন্মান্তরের সব ইতিবৃত্ত ততই ক্রমশঃ ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। লোকনাথ এই সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "বেরুগ্রামে যাইয়া প্রাচীন লোকদিগকে সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে যতই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম, ততই আমার দ্বিতীয় মাসাহ ব্রতের সময় জন্মস্মৃতি জাগরণের বিবরণের সঙ্গে মিলিতে লাগিল।" বেরুগ্রামের প্রাকৃতিক অবস্থা—খাল, বিল, প্রাচীন বৃক্ষাদি এবং রাস্তা-ঘাট ইত্যাদি তাঁহার নিকট

সুপরিচিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এমন কি সীতানাথের পিতার নামটি পর্য্যন্ত লোকনাথের বিবরণীতে লিখিত নামের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে মিলিয়া গেল। অনুসন্ধানে গুরু ভগবান জানিলেন যে, সীতানাথের ভাইয়েরা বা তাঁহাদের সন্তানাদি কেহই বিদ্যমান নাই। তাঁহাদের বসতবাড়ী ছাড়া ভিটায় পরিণত। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কেহ কেহ সীতানাথের জ্ঞাতিগোষ্ঠী বলিয়া পরিচয় দিলেন।

এই সীতানাথ জীবনধারণের ইতিহাসে এক দিকে যেমন লোকনাথের জাতিস্মরতা প্রমাণিত হইল, অপর দিকে তদানীন্তন বেরুগ্রামবাসী লোকেরা গুরু ভগবান গাঙ্গুলীসহ লোকনাথের দর্শন লাভ করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন।

বর্দ্ধমানে কালীসিদ্ধা

পথ গমনকালে তাঁহারা দামোদর নদতট-সংলগ্ন এক বনভূমিতে কিছু কাল অবস্থান করেন। এই সময় গুরু ভগবান শিষ্যদের পরবর্ত্তী যোগাভ্যাসের স্থান মহাতীর্থ হিমালয়ে স্থির করিয়াছেন, এই সংবাদটি তাঁহাদিগকে জানাইয়া দিলেন। এখানে লোকনাথ লোকমুখে শুনিতে পাইলেন যে নিকটবর্ত্তী কোনও এক স্থানে এক কালীসিদ্ধা বাস করেন। এই কালীসিদ্ধা শ্রীশ্রীকালীমাতার এক মন্দিরে সেবায়েত। তিনি দেহাচার বা নিয়মনিষ্ঠা কিছুই মানেন না,—ভোজনান্তে আচমন বা মলমূত্র ত্যাগে জলশৌচাদি পর্য্যন্ত করেন না। তথাকথিত এই অনাচার দেহে তিনি আবার শ্রীশ্রীকালীমাতার পূজারীরূপে মন্দিরের সকল কার্য্যই নিষ্পন্ন করেন; অথচ স্থানীয় লোক সকলেই তাঁহাকে মানিয়া চলে, এবং চতুর্দ্দিকে তাঁহার নামও বেশ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। লোকনাথের একান্ত বাসনা হইল, তিনি একবার এই কালীসিদ্ধার সঙ্গে সাক্ষাৎ

করেন। একদিন অতি বিনয়ের সহিত তিনি গুরুদেবের নিকট আপন মত ব্যক্ত করিয়া তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। গুরু সানন্দে অনুমতি দিলেন।

লোকনাথ কালীসিদ্ধার নিকট যাতায়াত করিতে লাগিলেন। লোকনাথের সঙ্গে তাঁহার আলাপাদিও হয়; কিন্তু আসল রহস্যের প্রসঙ্গ যখনই লোকনাথ উত্থাপন করেন, তখনই কালীসিদ্ধা পাশ কাটাইয়া যান। কালীসিদ্ধাকে ধরা বড় শক্ত ব্যাপার! লোকনাথও সহজ পাত্র নহেন, তিনিও ছাড়িতেছেন না। তিনি ভাবিলেন, "গুরু বলেন দেবতাকেও ধরা যায়, আর আমি এক জন মানুষকে ধরতে পারব না!"

কালীসিদ্ধা সুচতুর, আর লোকনাথও নাছোড়বান্দা! যে লোকনাথকে ধরার জন্য পরবর্ত্তী কালে হাজার হাজার লোক ধন্না দিবে, সেই লোকনাথ নিজেই আজ কালীসিদ্ধার দ্বারে ধন্নাধারী।

অবশেষে কালীসিদ্ধা লোকনাথের নিকট ধরা না দিয়া পারিলেন না। এক দিন তিনি তাঁহার রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া লোকনাথকে বলিলেন, "আমার কর্ম্মানুষ্ঠানে কোন এক দেবতা প্রীত হইয়াছেন। তাঁহারই কৃপায় আমার দৈনিক দেহ-ধারণের উপকরণাদি আসিয়া উপস্থিত হয়। পরন্তু আমার জিজ্ঞাসিত প্রশ্নেরও যথাযথ উত্তর আমি তাঁহার নিকট হইতে পাইয়া থাকি।"

ইহা শুনিয়া লোকনাথ অত্যন্ত কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া, তখন একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, সিদ্ধার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "আমি হিমালয়ে যাইতেছি। সেখানের আবহাওয়া আমার সহ্য হইবে কিনা?"

কালীসিদ্ধার মুখে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই মনুষ্যকণ্ঠের ন্যায় আকাশবাণী শুনা গেল, "হইবে।"

লোকনাথ নিজেও "হইবে" উত্তরটি শুনিলেন, সন্দেহের কিছুই রহিল না। তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে কালীসিদ্ধার নিকট আর একটি

প্রশ্নোত্তরের অনুমতি চাহিলেন, অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া এখন তিনি স্বয়ং প্রশ্ন করিলেন, "হিমালয়ে যাইয়া আমি সিদ্ধিলাভ করিতে পারিব কিনা ?"

লোকনাথ বড়ই আশা করিয়াছিলেন যে তিনি নিজ প্রশ্নের উত্তর পাইবেন। কিন্তু কোন উত্তর আসিল না। তিনি আরও তিন বার প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিলেন; প্রত্যেক বারই আকাশবাণী নিরুত্তর। তিনি তখন কালীসিদ্ধাকে প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিতে অনুরোধ করিলেন। কালীসিদ্ধা জিজ্ঞাসা করামাত্রই উত্তর হইল, "হ্যাঁ, হিমালয়ে সিদ্ধিলাভ ঘটিবে।"

এই উত্তরে আশ্বস্ত ও উৎসাহিত হইয়া লোকনাথ গুরু ভগবানের নিকট ফিরিয়া আসিয়া সব কথা তাঁহাকে নিবেদন করিলেন। সংবাদ শ্রবণে গুরুর মুখমণ্ডল দীপ্ত হইয়া উঠিল।

সন্ন্যাসীদের যথাসম্বল গুটাইয়া লইয়া পূর্ব্ববৎ লোকনাথকে পথ-প্রদর্শক করিয়া গুরু তাঁহাদের গন্তব্যস্থল পরম সাধনার মহাতীর্থ হিমালয় অভিমুখে যাত্রা করিলেন, কল-চালিত যান-বাহনে নয়—পদব্রজে।

হিমালয়ে

বর্দ্ধমান হইতে পদব্রজে রওনা হইয়া, দীর্ঘকাল পথ চলার পর গুরু ভগবান শিষ্যদ্বয়কে লইয়া ভারতের উত্তর-পশ্চিম গিরিপথে হিমালয়ে প্রবেশ করিলেন। যুগ-যুগান্তকাল হইতে হিমালয় দেবতাদের বাসভূমি। মুনিঋষির তপস্যাস্থল, প্রকৃতির নানাবিধ মনোহর সৌন্দর্য্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার। হিমালয় তীর্থরাজ।

পিতামাতা ব্রহ্মচারী লোকনাথকে বাল্যেই গুরু ভগবানের হস্তে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করেন। লোকনাথও গুরুর নিকট আত্মসমর্পণ

করিয়াছেন। গুরু হইলেন তাঁহার সর্ব্বময় কর্ত্তা। গুরু তাঁহাকে সাধন-পথে কলের পুতুলের ন্যায় চালাইতেছেন, আর তিনিও নির্ব্বিচারে তেমন ভাবেই চলিতেছেন। জ্ঞানযোগী ভগবান লোকনাথকে কর্ম্মযোগে চালাইয়াছেন। গুরু এখন সন্দেহাতীতরূপে বুঝিয়াছেন —সিদ্ধিলাভে কর্ম্মযোগই উৎকৃষ্ট পন্থা। লোকনাথ গুরুর জ্ঞানযোগ এবং নিজ অনুসৃত কর্ম্মযোগ একাধারে উভয়েরই অধিকারী হইয়া চলিয়াছেন।

সাধন-পথে আটটি স্তর বা যোগের অঙ্গ বর্ণিত আছে [১] ঃ—

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম,
প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি।

সত্য, সাধুতা, অহিংসা, ব্রহ্মচর্য্য, নিস্পৃহতা—এই সকল যম। শুদ্ধি, সন্তোষ, তপস্যা, ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ ও ঈশ্বরে কর্ম্মফল সমর্পণ—হইল নিয়ম। আরাধ্যদেবে মনঃ সংযোগ করিয়া, দেহের কষ্ট না হয় এরূপ দীর্ঘকাল স্থির ভাবে উপবেশন-অবস্থার নাম আসন [২]। আসন-সিদ্ধি লাভ হইলে, শ্বাস-প্রশ্বাস নিরোধ ও পরিহার বিষয়ে বিশেষ ক্ষমতা জন্মে। ইহাই প্রাণায়াম। প্রাণায়ামে প্রাণবায়ু অন্তরে স্থির অর্থাৎ নিরুদ্ধভাবে অবস্থান করে। আমাদের বহির্মুখী চক্ষুকর্ণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গুলি বাহিরের দ্রব্যাদির সংস্পর্শে আসিয়া দর্শন-শ্রবণ ইত্যাদি দ্বারা চিত্তের উপর প্রতিক্রিয়া জন্মায়। প্রাণায়ামে এই সকল ইন্দ্রিয় প্রশান্ত হইয়া অন্তর্মুখী হয়। ইন্দ্রিয়াদি অন্তর্মুখী হইলে চিত্ত বহির্দর্শন, বহিঃশ্রবণ ইত্যাদি হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়। ইহাই প্রত্যাহার। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার—এই পাঁচটিকে যোগের বহিরঙ্গ বলা হয়। ইহাতে দেহ ও চিত্ত যোগাভ্যাসের উপযোগী হয়।

১ পাতঞ্জল দর্শন মতে।
২ লোকনাথ বাবা গোমুখ আসনে আসীন আছেন।

বাহ্য বিষয় হইতে চিত্ত সম্পূর্ণ প্রতিনিবৃত্ত হইলে, ইহাকে আসন ও প্রাণায়ামের সাহায্যে নাভিচক্র, হৃদ্‌পদ্ম, নাসিকাগ্রভাগ ইত্যাদি আধ্যাত্মিক স্থানে, অথবা বাহিরে স্থিত আরাধ্য দেবমূর্ত্তি প্রভৃতিতে স্থির করার নাম ধারণা।

পূর্ব্বোক্ত যে কোন আধ্যাত্মিক স্থানে চিত্তের ধারণা শক্তি অর্জ্জিত হইলে চিত্তকে ঐ ধারণা বিষয়ে একাগ্রতার সহিত অবস্থান করানোর নাম ধ্যান। ধারণার উৎকৃষ্ট কর্ম্ম ধ্যান। এই অবস্থায় চিত্ত বিনা চেষ্টায় আপনা আপনি স্থির থাকে।

ধ্যানের পরিণাম সমাধি। ধ্যানে ধারণাগ্রস্ত ভাবটি জাগ্রত থাকে ; সমাধিতে বস্তু ভাব বা চিত্তবৃত্তি থাকে না।

আধ্যাত্মিক বিষয়ে ধারণা, ধ্যান ও সমাধি লাভ হইলে, তাহাকে সংযম বলে। ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—এই তিনটি যোগের অন্তরঙ্গ। বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ যোগ যিনি লাভ করিয়াছেন, তিনিই যোগী

যাত্রাপথে সব সময়ই লোকনাথ ছিলেন পথ-প্রদর্শক। বরফাকীর্ণ হিমালয়ে আরোহণকালে পথিমধ্যে তাঁহাদের দুই জন মহাপুরুষের সহিত সাক্ষাৎলাভ ঘটে। লোকনাথ ইঁহাদিগকে "বড় ঠাকুর" ও "ছোট ঠাকুর" বলিতেন। এই দুই মহাপুরুষ তাঁহাদের তিন জনকে বরফাবৃত পার্ব্বত্য পথ দিয়া লইয়া গিয়া, তাঁহাদের আবাসযোগ্য একটি স্থানে পৌঁছাইয়া দেন, এবং তাহাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ কালে এক জন বলিয়া যান, "এই বরফের দেশে দীর্ঘকাল অবস্থানের ফলে তোমাদের শরীরে রক্তকণিকা থাকিবে না।"

বিধাতার কি অপূর্ব্ব বিধান! প্রয়োজন কালে প্রয়োজনীয় সহায়তা আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হয়। এই মহাপুরুষদ্বয় কোথা হইতে আসিলেন, আবার ইঁহাদের তপস্যা-যোগ্য স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া কোথায় বা চলিয়া গেলেন! সাধন-পথের সহায় এরূপ ভাবেই আসিয়া থাকে। সিদ্ধ মহাপুরুষগণ নিজ নিজ যোগ-

বলে নিয়ত জানিতে পারিতেছেন, জগতের কোথায় কি হইয়াছে, হইতেছে বা হইবে, এবং কোথায়, কখন ও কিরূপে তাঁহাদের কি কর্ত্তব্য। ইহা যেন আধ্যাত্মিক বেতার! মহাপুরুষদের সাধনার ফলে জগৎ ক্রমাগত শান্তির পথে অগ্রসর হইতেছে।

সাধনপথে অগ্রসর হওয়ার সময় লোকনাথের দেহ ও চিত্তে অষ্টাঙ্গ যোগের বিভিন্ন স্তর ক্রমশঃ আপনা আপনি প্রস্ফুটিত হইতে থাকে। গুরু ভগবান জ্ঞান-বৃদ্ধ পাকা ওস্তাদ। তাঁহার স্নেহ-দৃষ্টি প্রতিনিয়তই শিষ্যের উপর রহিয়াছে। দ্বিতীয় মাসাহ-ব্রতানুষ্ঠানের সময় "জাতিস্মরতায়" লোকনাথের ভবিষ্যৎ যোগবলের স্পষ্ট আভাস পাওয়া অবধি তিনি সময় বুঝিয়া তাঁহাকে প্রয়োজনমত কর্ম্মযোগ-পথে চালাইয়া লইয়া যাইতেছেন।

ব্রহ্মজ্ঞান লাভ

বৎসরের পর বৎসর হিমালয়ের প্রশান্ত নির্জ্জনতায় গুরুর নির্দ্দেশ মতে লোকনাথের যোগ সাধন নিয়মিতভাবে চলিতে লাগিল। এক দিকে গুরু ভগবানের আ প্রাণ চেষ্টা, অপরদিকে গুরু বাক্যে শিষ্যের সুদৃঢ় প্রত্যয়, এবং তদনুযায়ী কর্ম্মানুষ্ঠান। এইরূপে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর[১] স্তরের পর স্তর অষ্টাঙ্গ যোগের কঠোর সাধনায়, একদিন ব্রহ্মচারী লোকনাথের আশা পূর্ণ হইল—সমাধি অবস্থায় লোকনাথ "ব্রহ্মদর্শন" করিলেন, এবং তাঁহার "ব্রহ্মজ্ঞান" লাভ হইল। ব্রহ্মদর্শন ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ পূর্ণানন্দ অবস্থা। এই অবস্থায় জীবাত্মা অনন্ত আনন্দ-সাগরে ডুবিয়া থাকেন।

ধন্য গুরু ভগবান! তুমি বড় আশা করিয়া কচি শিশু লোকনাথকে লইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিলে। আজ তোমার

১ গুরুসঙ্গে মোট ৯০ বৎসর সময়ের ৪০ বৎসর নক্তব্রতাদিতে কাটিয়া গিয়াছে।

আকাঙ্খা পূর্ণ হইল। ধন্য তোমার শিক্ষাদান! ধন্য তোমার শিষ্য-বাৎসল্য!

আর ধন্য তুমি লোকনাথ! জ্ঞানাচার্য্য ভগবানকে গুরুরূপে লাভ করিয়াছিলে, যিনি এই বৃদ্ধবয়সেও যুবকের ন্যায় অক্লান্ত পরিশ্রমে তোমাকে শিক্ষাদান এবং তোমার সকল প্রকার পরিচর্য্যাদি করিয়া আসিতেছেন। উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত শিষ্য বটে।

এই সমাধি অবস্থায় ব্রহ্মচারী লোকনাথ পরম আনন্দে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিলেন। এ যেন কঠোর পরিশ্রমের পর প্রশান্ত সুষুপ্তি, ইহা যেন ভাঙতে চায়না! লোকনাথ অনেকক্ষণ সিদ্ধিভোগ করিলেন। অবশেষে তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইল।

সমাধিভঙ্গের পর যোগী লোকনাথ চক্ষুরুন্মীলন করিয়া সম্মুখে গুরু ভগবানকে দেখিলেন, এবং তাঁহাকে দেখামাত্রই বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "গুরো, তোমারই অসীম কৃপায় আমি পার হইলাম; আর তুমি যেমন ছিলে, তেমনই রহিয়া গেলে। তোমার এ অবস্থা দৃষ্টে আমার বড় কষ্ট হইতেছে। তোমার যে কবে মুক্তিলাভ হইবে, তাহা ভাবিয়া আমি বড়ই আকুল হইতেছি।"

শিষ্যের এই আকুলতা দেখিয়া মহাজ্ঞানী গুরু ভগবান বলিলেন, "বাবা লোকনাথ, আমি চিরদিনই জ্ঞানযোগাবলম্বী। কর্ম্মযোগে যে এরূপ সিদ্ধিলাভ হইতে পারে, তাহাতে আমার তেমন বিশ্বাস ছিল না; সুতরাং সিদ্ধিলাভের জন্য আমি নিজে এরূপ যত্ন করি নাই। তোমাকে কর্ম্মপথে চালাইয়া এবং কর্ম্মযোগে পূর্ণ সিদ্ধিলাভ হইতে পারে দেখিয়া, আমার ভুল ভাঙ্গিল। এখন আমি এই শিক্ষালাভ করিলাম যে নিষ্কাম কর্ম্মসাধনই জীবের মুক্তিলাভের শ্রেষ্ঠ পন্থা।"

ব্রহ্মচারী লোকনাথ গুরুকৃপা পরিচালিত হইয়া মুক্ত হইয়াছেন; আর স্বয়ং গুরু ভগবান রহিয়া গেলেন—এই হৃদয়-বিদারক ভাবটি শিষ্য লোকনাথের গভীর মনোবেদনার কারণ হইল। জ্ঞানবৃদ্ধ গুরু

ভগবান তখন তাঁহাকে প্রবোধ-বাক্যে বলিলেন, "লোকনাথ, আমি শীঘ্রই এই দেহপাত করিয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতেছি। তখন তুমি হইবে আমার গুরু, এবং তুমি আমাকে তোমার পথে চালাইয়া লইবে।"

লোকনাথ গুরুর এই আশ্বাস-বাক্য শ্রবণ করিয়া শিষ্যসুলভ কাতর কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "গুরো, এত কঠিন কার্য্যের ভার তুমি আমাকে দিও না। আমি অক্ষম। তুমি তোমার এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাবুদ্ধি লইয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করিবে, এবং আমার শিষ্য হইবে। আমি কিরূপে তোমার সংস্কার পরিবর্ত্তন করাইয়া, তোমাকে কর্ম্মপথে প্রবৃত্ত করাইব?"

গুরু মহাশিষ্যের এই কথা শুনিয়া একটু হাসিলেন এবং স্নেহ-কণ্ঠে উত্তর করিলেন, "লোকনাথ, এ বিষয়ে তোমাকে ভাবিতে হইবে না। আমি নিজেই এই ভার গ্রহণ করিব।"

তখন গুরু ভগবানের বয়স দেড় শতের কাছাকাছি, আর শিষ্য গুরুর নিকট প্রায় এক শত বৎসরের বালকমাত্র। কি মধুর গুরু-স্নেহ! আর কি একনিষ্ঠ গুরুভক্তি! প্রবৃদ্ধ গুরু আধুনিক ধারণায় বৃদ্ধ শিষ্যের কাতরতা দর্শনে সান্ত্বনাব্যঞ্জক কণ্ঠে বলিতেছেন—আমি আবার আসিব। গুরু-শিষ্য ও শিষ্য-গুরু সম্বন্ধ কি অপূর্ব্ব!

শ্রীশ্রীব্রহ্মজ্ঞানী মহাপুরুষ লোকনাথ

ব্রহ্মচারী লোকনাথ এখন জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ। তাঁহার জটা-বিমণ্ডিত মস্তক, শ্মশ্রুশোভিত মুখমণ্ডল, প্রশস্ত ললাট, কর্ণপ্রসারী নয়ন ও ভ্রূযুগল, দিব্যকান্তি-বিশিষ্ট দীর্ঘদেহযষ্টি, আজানুলম্বিত বাহু, তীক্ষ্ণকোমল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি—সবই অলৌকিক। তাঁহার দেহখানা

অস্বাভাবিক দীর্ঘ ছিল। সুদীর্ঘকাল তুষারমণ্ডলে অবস্থান হেতু তাঁহার শরীরের রঙ্ সাদা হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার শরীর ছিল রক্তকণিকা-বিবর্জ্জিত[১]। দেহের কোন স্থানে ক্ষত করিলে সেই স্থান হইতে রক্তের পরিবর্ত্তে লাল আঠার ন্যায় এক প্রকার পদার্থ বাহির হইত। সাধারণতঃ মানুষের শরীরে তিলচিহ্ন কৃষ্ণবর্ণ থাকে; লোকনাথের তিলচিহ্ন সকল লালবর্ণের ছিল।

তাঁহার দৃষ্টি ছিল আরও অলৌকিক! নয়নযুগল সর্ব্বদা পলকবিহীন। দৃষ্টি সকল সময়েই স্থির। তাঁহার দৃষ্টির আর একটি বিশেষত্ব এই ছিল যে তাঁহার সম্মুখস্থিত প্রত্যেক লোকেই মনে করিত লোকনাথ তাহারই প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিতেছেন।

লোকনাথের যোগপক্ক দেহ। ইহা শীতগ্রীষ্মের অতীত। তিনি নিদ্রা-বিজয়ী।

তিনি অহিংস ও সমদর্শী, সকল জীবে তাঁহার সম দয়া। তিনি মনুষ্যেতর প্রাণীর ভাষা ও মনোভাব বুঝিতে পারেন। তিনি সত্যসন্ধ ও বাক্‌সিদ্ধ। তিনি ত্রিকালজ্ঞ। ইন্দ্রিয়ের অগোচর—নিকট বা দূরস্থিত দ্রব্যাদি দর্শন বা শব্দাদি শ্রবণ করার শক্তি তাঁহার ছিল। রোগীর দেহ হইতে তাহার রোগ তিনি নিজ দেহে সঞ্চালিত করিতে পারিতেন।

স্থূলদেহ হইতে জীবাত্মাকে "আলগ্" বা পৃথক করিয়া তিনি সূক্ষ্মদেহে আকাশ ভ্রমণ করিতেন। এরূপ ভ্রমণকালে স্থূলদেহ-খানি আশ্রমগৃহে আসনস্থ থাকিত, এবং জগতের কল্যাণকল্পে ভ্রমণান্তে পুনঃ খাঁচার পাখী খাঁচায় ফিরিয়া আসিতেন।

এক কথায় লোকনাথ এখন ব্রহ্মশক্তি-সম্পন্ন মহাপুরুষ।

১ হিমালয়ে ঠাকুরের উক্তি।

গুরু ভগবানের ইহলীলা সম্বরণ

মহাপুরুষ লোকনাথের ব্রহ্মদর্শন ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পর গুরু ভগবান স্থির করিলেন—তাঁহার এ যাত্রার লৌকিক দেহের কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে। লোকনাথের সিদ্ধিলাভের কিছুকাল পর হিমালয় হইতে লোকনাথ ও বেণীমাধবসহ অবতরণ করিতে করিতে লোকহিতার্থে তিনি দীর্ঘকাল পর পুনরায় ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে আসিয়া তাঁহারা কাবুলের পথ ধরিলেন। গুরুর উদ্দেশ্য কোরাণ শাস্ত্র পাঠ করিয়া ইসলাম ধর্ম্মের সারতত্ত্ব গ্রহণ করা। ভারতবর্ষ হিন্দুমুসলমানের দেশ। অদূর ভবিষ্যতে মহাপুরুষ লোকনাথের নিষ্কাম কর্ম্মক্ষেত্রে ইহা দরকার হইতে পারে,—সম্ভবতঃ তিনি তাঁহার বহুদর্শিতার গুণে ইহাই ভাবিলেন। কাবুল মুসলমান রাজ্য। সেখানে তখন মোল্লা সাদী[১] বাস করিতেছিলেন। শেখ সাদী সুবিখ্যাত পারস্যদেশীয় সাধক কবি। গুরু ভগবান ও শিষ্যদ্বয় কাবুলে পৌঁছিয়া মোল্লা সাদীর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন, এবং যথাযথভাবে তাঁহার নিকট আরবীভাষা শিক্ষা ও কোরাণশাস্ত্র পাঠ করিয়া ইস্‌লাম ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া লইলেন।

কাবুল পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা কাশীধাম অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে হিতলাল মিশ্র নামে এক মহাপুরুষের সঙ্গে তাঁহাদের সাক্ষাৎলাভ ঘটে। এই হিতলাল মিশ্রই কাশীধামের খ্যাতনামা মহাপুরুষ ত্রৈলঙ্গ স্বামী। হিতলালের সঙ্গে এই অপূর্ব্ব মিলন আসন্ন অভাব পূরণের জন্য। মহাতীর্থ কাশীধামে আগমন করিয়া তাঁহাদের সময় বেশ আনন্দে কাটিতে লাগিল।

১ মোল্লা সাদী— জন্ম ১১৭৪—মৃত্যু ১২৯২ সাল।

গুরু ভগবানের দিনগুলি একটি একটি করিয়া কমিয়া আসিতেছে,—তিনি ইহা অনুভব করিতে পারিতেছেন। শিষ্যদের জন্য আকুল তাঁহার প্রাণ। তিনি একাধারেই 'বালক''দ্বয়ের মাতা, পিতা ও গুরু। তিনি চলিয়া যাইতেছেন; ইঁহাদিগকে কাঁহার জিম্মায় রাখিয়া যান,—এই তাঁহার ভাবনা। হায়রে গুরুর প্রাণ!

গুরু ভগবান হিতলাল মিশ্রকে নির্ভরযোগ্য জানিয়া, তাঁহার হস্তে শিষ্যদ্বয়ের ভার সমর্পণ করিয়া স্নেহার্দ্রকণ্ঠে কহিলেন, "মিশ্রঠাকুর, আমার এই বালক দুটিকে আমি তোমার হস্তে অর্পণ করিলাম, তুমি ইহাদের ভার গ্রহণ কর।" মিশ্রঠাকুর সন্তুষ্টচিত্তে রাজি হইলেন। গুরু ভগবান ভাবনামুক্ত হইলেন।

ইহার অল্প কয়েক দিন পরই গুরু ভগবানের ইহকালের শেষ রজনী প্রভাত হইল। অতি প্রত্যুষে অভ্যাস মত তিনি অন্যান্য দিনের ন্যায় আজও গঙ্গাস্নানে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইলেন, এবং শিষ্যদ্বয়কে বলিলেন, "আমি গঙ্গাস্নানে চলিলাম। স্নানান্তে কিছুকাল জপ করিব—বাসনা।" ইতিঃপূর্ব্বে তিনি আর কখনও এরূপ বাক্য রাখিয়া গঙ্গাস্নানে যান নাই।

তিনি গঙ্গায় যাইয়া স্নানাদি সমাপন করিয়া মণিকর্ণিকার ঘাটে এইবারের মত শেষ জপে আসন গ্রহণ করিলেন। মণিকর্ণিকা অর্থাৎ কর্ণাভরণ মণিবিশেষ। মণিকর্ণিকা মহাদেবের কর্ণভূষণ ছিল। কথিত আছে, কাশীধামে গঙ্গাতীরে বিষ্ণুর তপস্যা-দর্শনে মহাদেব বিস্মিত হওয়ার ফলে, তাঁহার কর্ণমণি এই স্থানে পতিত হয়। এই জন্যই ইহার নাম মণিকর্ণিকা। ইহা কাশীধামে গঙ্গার অন্যতম তীর্থঘাট। কাশীধামের মহাশ্মশান এই মণিকর্ণিকা ঘাটে অবস্থিত। এখানেই রাজা হরিশ্চন্দ্র ক্রীতদাস হইয়া স্বীয় স্ত্রী-পুত্রের সহিত পুনর্মিলিত হন। এই মণিকাণকা ঘাটেই আজ আসনে উপবিষ্ট গুরু ভগবান মহাজপে।

অন্যান্য দিন গুরু যে সময়ের মধ্যে গঙ্গাস্নান অন্তে আশ্রমে ফিরিয়া আসেন, আজ সেই সময় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। গুরু ফিরিতেছেন না দেখিয়া শিষ্যদ্বয় উদ্বিগ্ন হইলেন। আরও কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া, তাঁহারা মণিকর্ণিকার ঘাটে যাইয়া গুরুকে জপে নিবিষ্ট দেখিলেন। দর্শনমাত্রই ব্রহ্মাচারী লোকনাথ বুঝিলেন,—গুরু দেহত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তখন তিনি গুরুর পরিত্যক্ত অঙ্গখানি স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "তোমার আবার জপ!"

স্পর্শমাত্রই দেহখানি ভূতলে পড়িয়া গেল। লোকনাথ গুরুর জন্য শোক করিলেন না। তখন তাঁহারা শাস্ত্রের বিধান অনুসারে গুরু ভগবানের পাঞ্চভৌতিক দেহের দাহ-সৎক্রিয়া মণিকর্ণিকার ঘাটে সম্পন্ন করিলেন।

দেড় শত বৎসর বয়ঃক্রমকালে গুরু ভগবান তাঁহার গুরু-লীলা সাঙ্গ করিলেন। তখন লোকনাথের বয়স এক শত বৎসর।

গুরুকে তুলিয়া লইবার ভার এখন শিষ্যরূপী গুরুর উপর বর্ত্তমান রহিল।

পর্য্যটন—পশ্চিমাঞ্চলে, আরবদেশে

মহাপুরুষ লোকনাথ ব্রহ্মদর্শন লাভ করিয়াছেন। এখন ব্রহ্ম-সৃষ্টির অংশ বিশেষ এই পৃথিবীর যথাসম্ভব কতকাংশ পর্য্যটন করিয়া দেখার তাঁহার ইচ্ছা হইল। বেণীমাধব সঙ্গে আছেন। আর আছেন মুক্ত পরিব্রাজক গুরুস্থানীয় হিতলাল মিশ্র ঠাকুর।

স্থির হইল বেণীমাধব সহ ব্রহ্মচারী লোকনাথ যথাক্রমে পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব্বাঞ্চলে ভূপ্রদর্শনে যাত্রা করিবেন। সাধুর দেশভ্রমণ—

কম্বল আর কমণ্ডলু হইলেই হইল। বেণীমাধব লোকনাথের নেতৃত্ব সব সময়ই মানিয়া চলিতেন। আর প্রয়োজন কালে হিতলাল নিজেই তাঁহাদিগকে খোঁজ করিয়া লইবেন বলিলেন। যথাসময়ে বেণীমাধবকে লইয়া ব্রহ্মচারী লোকনাথ পদব্রজে পশ্চিমাঞ্চল অভিমুখে রওনা হইলেন। আফগানিস্থান ও পারস্যদেশ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা আরবদেশে উপনীত হইলেন—মুসলমানদের তীর্থস্থান মক্কা ও মদিনা নগরী দর্শন করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য। মক্কা হজরত মহম্মদের জন্মস্থান, আর মদিনায় তিনি ইহলীলা সম্বরণ করেন। দীর্ঘ মরুপথ অতিক্রম করিয়া প্রথম তাঁহারা মক্কায় উপস্থিত হইলেন। এখানের বিশিষ্ট মুসলমানগণ এই দুই হিন্দু সন্ন্যাসীর প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া, তাঁহাদিগকে অতিথিরূপে গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের মধ্য হইতে এক ফকির-দর্শন প্রবীণ মুসলমান লোকনাথের নিকট অগ্রসর হইয়া প্রস্তাব করিলেন, "আপনারা নিজে রসুই করিয়া খাইতে ইচ্ছা করিলে, আমরা সিধা দিতেছি, গ্রহণ করুন। নতুবা আদেশ করিলে, আমরাও রসুই করিয়া দিতে প্রস্তুত আছি।"

মহাপুরুষ লোকনাথ জাতি বিচারের ঊর্দ্ধে। তিনি উক্ত ফকিরের দ্বিতীয় প্রস্তাবটি সাদরে গ্রহণ করিলেন। কয়েক জন মুসলমান যথারীতি স্নানাদি সমাপনান্তে, কাপড় দিয়া মুখ বাঁধিয়া, তাঁহাদের জন্য রন্ধনকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। কাপড় দিয়া মুখ বাঁধার অর্থ এই যে রন্ধনকালে কথা বলিলে পাক-দ্রব্যাদিতে পাচকের অজ্ঞাতসারে নিষ্ঠীবন পড়ার সম্ভাবনা; মুখ আবদ্ধ থাকিলে আর সে প্রশ্ন উঠে না। যে কয় দিন তাঁহারা মক্কায় ছিলেন, এই ভাবেই তাঁহাদের আহার্য্য প্রস্তুত হইত, এবং তাঁহারাও ইহা তৃপ্তির সহিত গ্রহণ করিতেন। ব্রহ্মচারী লোকনাথ এখন সকলেরই আপন; কি হিন্দু, কি মুসলমান—সকলেই তাঁহার আপন। তিনি বাহিরের বেশভূষা দেখেন না, তিনি দেখেন ভিতরের নির্ম্মলতা;

সুতরাং হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খৃষ্টান সকলেই তাঁহার নিকট সমান।

মক্কার তীর্থস্থানাদি পরিদর্শন করিয়া তাঁহারা মদিনায় উপনীত হইলেন। সেখানেও ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমানগণ তাঁহাদিগকে পরম আদর-যত্নের সহিত অভ্যর্থনা ও গ্রহণ করিলেন। এখানেও মুসলমানগণ মক্কাবাসীদের ন্যায় মুখ বাঁধিয়া রসুই করিয়া তাঁহাদিগকে ভোজন করাইতেন। মদিনায় আসিয়া লোকনাথ "মক্কেশ্বর"[১] এর কথা শুনিলেন, এবং সেখানে যাইবেন ভাবিলেন। মদিনা হইতে মক্কেশ্বর পদব্রজে প্রায় তিন মাসের মরুপথ।

তাঁহারা মক্কেশ্বরের পথ ধরিলেন। কয়েক দিন পথ গমনের পর তাঁহারা আবদুল গফুর নামক এক মহাপুরুষের সংবাদ শুনিলেন। তিনি ঐ অঞ্চলে সুপরিচিত এবং মুসলমানরা তাঁহাকে অত্যন্ত ভক্তি করেন। মরু অঞ্চলের এই ক্ষুদ্র বসতির বাহিরে তিনি জীবন-যাপন করিতেছেন। তিনি নীরবে কাল কাটান, কাহারও সহিত বড় একটা কথাবার্ত্তা বলেন না। অনেক অনুসন্ধানের পর লোকনাথ অতি বৃদ্ধ আবদুল গফুরের দর্শন লাভ করিলেন। তিনি অগ্রসর হইয়া তাঁহার নিকট গিয়া নীরবে উপবেশ করিলেন। কিন্তু বৃথা! আবদুল গফুর লোকনাথের উপস্থিতি পর্য্যন্ত লক্ষ্য করিলেন না, বাক্যালাপ তো দূরের কথা!

লোকনাথ থাকিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে দুই-একটি কথা তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন; কিন্তু ফকিরের তরফ হইতে কোন সাড়া শব্দ নাই। জহুরী জহর চিনে; সুতরাং লোকনাথ ইহাতে দুঃখিত বা ইহা হইতে বিরত হইলেন না। মধ্যে মধ্যে অতি মৃদুস্বরে তাঁহার জিজ্ঞাসা চলিতেই লাগিল।

১ মক্কেশ্বর—সম্ভবতঃ জেরুসালেম। জেরুসালেম একটি পবিত্র নগর। এখানে বহু দরবেশ ফকিরের সমাধি-ক্ষেত্র আছে বলিয়া জানা যায়। ইহা খৃষ্টানদেরও অতি পবিত্র স্থান।

ব্রহ্মচারী বাবার স্বহস্ত-লিখিত পত্র

(ডাঃ নিশিকান্ত বসুর সৌজন্যে)

ফকির বুঝিলেন—আগন্তুক পাত্রটি সহজ নয়। তিনি তাঁহার প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিলেন এবং স্নিগ্ধকণ্ঠে লোকনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কয় দিনের লোক হে ?"

লোকনাথ ফকিরের এই প্রশ্ন শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। কিঞ্চিৎ-কাল চিন্তা করিয়া তিনি বুঝিলেন—মহাপুরুষ নিশ্চয়ই তাঁহাকে তাঁহার বয়স কত তাহা জিজ্ঞাসা করেন নাই। এই প্রশ্নের ভিতর গূঢ় রহস্য আছে। লোকনাথ আরও কিছু কাল ভাবিলেন। তিনি এখন নিশ্চিত বুঝিলেন,—মহাপুরুষ জানিতে চান, বিগত কয় জীবনের কথা তাঁহার স্মরণ আছে। তিনি বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, "আমি দুই দিনের লোক। আপনি কয় দিনের ?"

উত্তর হইল, "আমি চার দিনের।"

পরস্পরের প্রশ্নোত্তরে পরস্পর পরস্পরকে চিনিলেন এবং পরম আনন্দ লাভ করিলেন।

লোকনাথ আবদুল গফুরের সংসর্গে কতক দিন কাটাইলেন। মহাপুরুষদের আসর উপযোগী বিশেষ বিশেষ আলাপ তাঁহাদের উভয়ের আনন্দ-বর্দ্ধন করিল। লোকনাথের অলৌকিক শক্তি দর্শনে মহাপুরুষ আবদুল গফুর বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি পাকা ওস্তাদের [গুরু ভগবান গাঙ্গুলীর] হাতে পড়েছিলে, তাই এত উন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছ।"

কি অপূর্ব্ব মিলন! ব্রহ্মচারী লোকনাথ দুই দিনের লোক, মিশ্র ঠাকুর হিতলাল তিন দিনের আর সাধক আবদুল গফুর চার দিনের! কোথায় হিমালয়, কোথায় কাশীধাম, আর কোথায় বা আরবদেশ! ইহাও আবার পদব্রজে। এই মিলন পারস্পরিক আধ্যাত্মিক আকর্ষণ। জগতের বিভিন্ন স্থানে এরূপ মহাপুরুষ যে কত আছেন, তার ইয়ত্তা কে রাখে? মহাপুরুষগণ এক পরিবারভুক্ত। তাঁহাদের মধ্যে লৌকিক জাত-বিচার নাই। পরবর্ত্তী কালে বারদীতে শিষ্য সমাবেশে এই মহাপুরুষ আবদুল

গফুর সম্বন্ধে ব্রহ্মচারী লোকনাথ বলিয়াছেন, "আমি মক্কায় আবদুল গফুর নামে একজন ব্রাহ্মণ দেখেছি।" "ব্রাহ্মণ" শব্দটির ব্যাখ্যা করিয়া তিনি বলিতেন, "যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনিই ব্রাহ্মণ।"

আবদুল গফুরের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া বেণীমাধব সহ লোকনাথ চলিলেন আরও পশ্চিমে—ইউরোপ অভিমুখে।[১]

ইউরোপে

আরবদেশ হইতে স্থলপথে তাঁহারা এসিয়া-মাইনর, তুরস্ক, গ্রীস, ইতালি ও সুইজারল্যাণ্ড অতিক্রম করিয়া ফ্রান্স দেশে উপস্থিত হইলেন। এখানে দুই ছত্রের মধ্যেই আমরা আরবদেশ হইতে ফরাসীদেশে আসিয়া পড়িলাম। পদব্রজে এই সকল স্থান অতিক্রম করিতে যে কি পরিমাণ সময় লাগিতে পারে এবং তাহা কতখানি শ্রমসাধ্য, আর পথঘাটের অবস্থাই বা কি প্রকার, তাহা ভাবিয়া দেখা দরকার—কোথাও কিঞ্চিৎ সমতলভূমি, কোথাও বা দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড়-পর্ব্বত, আবার কোথাও বা বিশাল নদ-নদী।

এই সময় ফ্রান্সদেশে রাজনৈতিক গোলযোগ চলিতেছিল। সম্রাট্ নেপোলিয়ন্ বোনাপার্টের পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র তৃতীয় নেপোলিয়ন ফরাসী গণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি।

লোকনাথের এই ভ্রমণ পর্য্যায়ের বিশেষত্ব এই ছিল যে তিনি যখন যে দেশ পরিদর্শন করিয়াছেন, তখনই প্রয়োজন কালে ভাব বিনিময়ের জন্য সেই দেশের ভাষা কম-বেশী আয়ত্ত করিয়া লইতেন।[২]

১ মহাপুরুষের জীবনীর উপাদানসমূহে "মক্কেশ্বর" সম্বন্ধে আর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

২ পরবর্ত্তী কালের কথা। একদা বারদী আশ্রমে দুইটি স্থানীয় শিক্ষিত যুবক একটি ফরাসী শব্দের উচ্চারণ লইয়া একে অন্যের সহিত বিতর্ক করিতেছিল। ব্রহ্মচারী বাবা শব্দটির সঠিক উচ্চারণ করিয়া দিয়া তাহাদের তর্ক মিটাইয়া দেন।

উত্তরাঞ্চলে

সুমেরু শৃঙ্গ অভিযান

ইউরোপ হইতে পুনঃ স্থলপথেই তাঁহাদিগকে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল। এই বার বরফের দেশ উত্তরাঞ্চলের পালা। লোকনাথ বেণীমাধবকে লইয়া হিমালয়ের বদরিকা আশ্রমে আসিলেন। অতি প্রাচীনকালে এখানে মহামুনি ব্যাসদেবের আশ্রম ছিল। এখানে বদরীনারায়ণ নামে বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই অঞ্চলে হরিদ্বার, বদ্রীনাথ, কেদারনাথ ও গঙ্গোত্রী প্রভৃতি কয়েকটি তীর্থস্থান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পূত-সলিলা গঙ্গা মানস সরোবরের নিকট গঙ্গোত্রী হইতে উত্থিত হইয়া এই সকল স্থান দিয়া প্রবাহিত হইয়া নিম্ন ভূমিতে নামিয়া আসিয়াছেন। পূণ্য কুম্ভযোগ উপলক্ষে প্রয়াগাদি তীর্থস্থান সমূহে সাধু-সন্ন্যাসীদের মহাসম্মেলনের নাম কুম্ভমেলা। হরিদ্বার কুম্ভ-মেলার অন্যতম তীর্থক্ষেত্র।

এই তুষারাঞ্চলে বৎসরের ছয় মাস—বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত—লোক চলাচল সম্ভবপর হয়, বাকি ছয় মাস ইহা তুষারাবৃত থাকে। সহজ ভাষায় বৈশাখ হইতে আশ্বিন গ্রীষ্মকাল, আর কার্ত্তিক হইতে চৈত্র শীতকাল। গ্রীষ্মকাল বলিতে, বঙ্গদেশের গ্রীষ্মকাল বুঝিলে ভুল হইবে, তখনও বেশ শীত থাকে, তবে সহ্য করা যায়। আশ্বিনের মাঝামাঝি হইতেই এই সকল স্থানের রাস্তার চটিগুলি[১] উঠিয়া যায়, এবং যাত্রি-সমাগম বন্ধ হইতে থাকে। শীতকালের জন্য পাণ্ডারা ছয়মাসের পূজোপকরণ ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া মন্দিরের অভ্যন্তরে রাখিয়া মন্দির-দরজা বন্ধ করিয়া

১ পান্থ-নিবাস।

দেয় এবং নিম্নভূমিতে চলিয়া আসে; সুতরাং এই ছয়মাস মনুষ্য কর্ত্তৃক আর এই সকল মন্দিরে পূজার্চ্চনা সম্ভবপর হয় না। তখন চতুর্দ্দিকে বরফ, বরফ, আর বরফ। চৈত্রমাস আগমে এই স্তব্ধ বরফ কোন্ মহা যাদুকরের ইঙ্গিতে যেন গলিতে আরম্ভ হয়। পাণ্ডারা তখন লোকজনের সাহায্যে বরফ কাটাইয়া মন্দিরে যাওয়ার পথগুলি মুক্ত করিয়া লয়। বৈশাখ মাসের অক্ষয় তৃতীয়া দিন আবার অবরুদ্ধ মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত হয়। রাস্তার চটিগুলি খুলিয়া যায়, এবং লোক সমাগম আরম্ভ হয়।

ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ দ্রৌপদী সহ বদ্রীনাথ ও কেদার-নাথের পথে মহা-প্রস্থান করিয়াছিলেন। কিছুদূর গমন করিয়া দ্রৌপদীর দেহপাত হয়। পরে পথে অগ্রসর হইতে হইতে ক্রমে সহদেব, নকুল, অর্জ্জুন এবং ভীমেরও শরীর পতন হয়। গ্রীষ্মকালে বরফ গলিতে আরম্ভ হইলে, দ্রৌপদী ও পাণ্ডব চতুষ্টয়ের বিশীর্ণ দেহ বরফ-জলের সঙ্গে কেদারনাথে ভাসিয়া আসে, এবং ইহা এক মহাতীর্থে পরিণত হয়।

এইরূপ অঞ্চলে লোকনাথ ও বেণীমাধব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এবার তাঁহাদের গন্তব্যস্থল সুমেরু বা উত্তরাঞ্চলের বরফের রাজ্য। এইরূপ ভ্রমণে বর্ত্তমান যুগে আসল ভ্রমণকারীর সাহায্যার্থে বহু শ্রমিকের জোগান দিতে হয়। ইহা ছাড়া নানারূপ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের তো কথাই নাই। আর এই ব্রহ্মচারীরা কিনা রওনা হইতেছেন নিজ নিজ দেহখানি অবলম্বন করিয়া!

হ্যাঁ, যোগপক্ক দেহই তাঁহাদের একমাত্র লৌকিক সম্বল।

তাঁহারা স্থির করিলেন যে, বদরিকা-আশ্রমে কিছু কাল অবস্থান করিয়া তাঁদের যোগপক্ক দেহ প্রাকৃতিক অবস্থা হইতেও অধিকতর শক্তিশালী করিয়া লইবেন। ইহাতে তাঁহাদের কোন বহির্বাসের দরকার হইবে না। যেখানে পানীয়টুক পর্য্যন্ত বরফ হইয়া যায়,

সেই বদরিকাশ্রমে, একদিন নয়, দুদিন নয়, একমাস নয়, দুমাস নয়—দীর্ঘ তিন বৎসর বেণীমাধব সহ ব্রহ্মচারী লোকনাথ পর্ব্বত আরোহণের প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসাবে অবস্থান করিলেন। ইহার ফলে তাঁহাদের শরীরের চর্ম্ম বরফের সংস্পর্শে সাদা ও পুরু হইয়া গেল, অর্থাৎ শুভ্র চর্ম্মচ্ছদ গঠিত হইল; ইহা দেখিতে বরফের ন্যায় সাদা, শীত আর এখন এই কঠিন চর্ম্মস্তর ভেদ করিয়া দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না। এক কথায় ইহাদের শরীর এখন বরফ-প্রুফ্।

এইবার তাঁহারা তাঁহাদের যাত্রাপথ মেরু অঞ্চলের উদ্দেশ্যে বাহির হইবেন। কিন্তু বাধা পড়িল। কাশীধামে হিতলাল মিশ্র তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন, "প্রয়োজন বোধে আমিই তোমাদিগকে খোঁজ করিয়া লইব।" গুরু ভগবান হিতলালের হাতে এই দুই "বালকের" ভার সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন। যোগবলে হিতলাল জানিতে পারিলেন—ইহারা বরফের দেশে রওনা হইতেছেন। তিনিও এই সময় মেরু অঞ্চলের যাত্রী হইয়া, বদরিকা-আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। তিনের পুনঃ এই মিলনে সকলেই খুব আনন্দ পাইলেন।

নিজেদের লৌকিক দেহের অবস্থার কথা ভাবিয়াই হউক, বা অন্য কোন কারণেই হউক, "বালকদ্বয়" বয়োবৃদ্ধ[১] হিতলালকে অতি বিনীতভাবে বলিলেন, 'ঠাকুর, এখান হইতে দেহটিকে আরও একটু শক্তিশালী করিয়া লইলে কেমন হয়?"

"বালাদপি সুভাষিতং গ্রাহ্যম্"—বিবেচনা করিয়া হিতলাল হাসিমুখে তাঁহাদের এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। হিতলালের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহারা বদরিকা-আশ্রমে আরও তিন বৎসর কাটাইলেন। অবশেষ সর্ব্বশেষে বহির্বাসটুক পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া তাঁহারা হিমালয়ের এক সু-উচ্চ শৃঙ্গস্থিত বরফরাশির উপর

১ তাঁহাদের বয়সের পার্থক্য ১২০ বৎসর।

আরোহণ করিয়া পাণ্ডবাদি চলিত মহাপ্রস্থানের পথ ধরিলেন। সুমেরু অভিযান আরম্ভ হইল।

আধুনিক যুগে হিমালয়ের শৃঙ্গাদি অভিযানের হিড়িক পড়িয়া গিয়াছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে অভিযাত্রীদের দল কত অর্থব্যয় ও কত কষ্ট স্বীকার করিয়া হিমালয়ের বিভিন্ন শৃঙ্গ জয়ের সুনাম অর্জ্জন করিতে আসিয়াছে ও আসিতেছে। তাহাদের কেহ বা সফলতা লাভ করিতে পারিতেছে, কেহ বা বিফল হইতেছে।[১] আর আমাদের দেশের সাধু সন্ন্যাসীরা তাঁহাদের যোগপক্ক লৌকিক দেহমাত্র সম্বল করিয়া কতশত সু-উচ্চ পর্ব্বত-শৃঙ্গের শীর্ষদেশে যে আরোহণ করিয়াছেন ও করিতেছেন,— ইহার খোঁজ কে রাখে?

ব্রহ্মচারিগণ ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, ক্লান্তি—সবই জয় করিয়াছেন। তাঁহারা যে পথে চলিলেন, তাহা কোথাও বা বরফ-বিরল প্রস্তরময়, আবার কোথাও বা গভীর বরফে আবৃত। কদাচিৎ প্রয়োজন হইলে, প্রস্তর-ভেদী কিঞ্চিৎ কন্দমূল[২] আহার করিলেই, তাহাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি হইত। এই একাকার বরফ-পথে তাঁহারা তিব্বত ও সাইবেরিয়া অতিক্রম করিয়া উত্তর মহাসাগরে উপস্থিত হইলেন। বরফেরও বিরাম নাই, পথচারীদেরও আলস্য বা বিরক্তি নাই।

এইবার তাঁহারা উত্তর মেরুর সেই অঞ্চলে আসিলেন, যেখানে বৎসরের ছয় মাসকাল অস্পষ্ট দিবালোক, আর ছয় মাসকাল গভীর অন্ধকার। এই অঞ্চলও পিছু করিয়া, তাঁহারা আরও উত্তরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এখন তাঁহারা এমন এক স্থানে আসিয়া পড়িলেন, যেখানে দিবালোক নাই, কেবলই অন্ধকার,— ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার। বরফের দেশ, সুতরাং আকাশের তারকাও

১ বর্ত্তমানে আমাদের দেশের যুবকদের মধ্যেও পর্ব্বত-শৃঙ্গ অভিযানের প্রয়াস দেখা যাইতেছে।

২ কন্দমূল—ইহা আকারে দেখিতে বঙ্গদেশের সরল, সুপুষ্ট মানকচুর গোড়ার অংশের ন্যায়। ইহা দৈর্ঘ্যে দু হাত পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ভিতরের অংশ দেখিতে ও খাইতে শাক-আলুর ন্যায়। দাক্ষিণাত্যের পূর্ব্ব উপকূলের কোন কোন স্থানে ইহা জন্মিয়া থাকে।

কুয়াশাজালে আবদ্ধ। দৃষ্টিশক্তি অচল। বাস্! দেখা যাবে এবার! ব্রহ্মচারীদের একমাত্র পথ-প্রদর্শক নয়নযুগল তাহাও বাতিল! আর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব!

বাস্তবিকই তাঁহারা আর উত্তর দিকে চলিতে পারিলেন না। সঙ্কল্প যাহার অটল, উপায় তাঁহার হাতের মুঠায়। তাঁহারা এই দুর্ভেদ্য অন্ধকার রাজ্যে এক ছাউনী করিয়া বসিয়া গেলেন। 'ছাউনী' বলিতে তাঁবু, আর 'বসিয়া গেলেন' বলিতে কম্বল বুঝিলে চলিবে না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—তাঁহাদের বহির্বাস কৌপিনটুক পর্য্যন্ত পরিত্যক্ত হইয়াছে। সুতরাং বরফ আসন, আর বরফ বসন হইল তাঁহাদের ছাউনী। এইরূপে কতককাল বসবাস করিতে করিতে ধীরে ধীরে অন্ধকারের মধ্যেই তাঁহাদের এক নূতন দৃষ্টিশক্তি খুলিতে লাগিল। তাঁহাদের স্বাভাবিক দর্শন-শক্তির চরিত্রগত লক্ষণ বদলাইয়া গেল, এবং ইহা অন্য এক আশ্চর্য্যজনক শক্তি লাভ করিল। ইহার ফলে ও বলে, তাঁহারা এখন ঐ অন্ধকার রাজ্যে স্বচ্ছন্দে পথ-চলার অবস্থায় আসিলেন,—তাঁহারা এখন বেশ দেখিতে পান।

অন্ধকার রাজ্যে ছাউনীতে অবস্থান কালে, তাঁহারা এক জাতীয় অতি ক্ষুদ্রকায় অদ্ভুত মনুষ্য দেখিলেন। এই সকল মানুষ এক হাত কি সওয়া হাত উঁচু। ইহাদের শরীরের রঙ্ সাদা, দেহ আবরণহীন। ইহারা দূর হইতে মহাপুরুষদিগকে প্রথম প্রথম সকৌতুক দৃষ্টিতে দেখিত,—তাঁহাদের নিকট আসিতে সাহস পাইত না। তারপর মহাপুরুষদের আচার-ব্যবহারে ক্রমে যখন উহারা বুঝিতে পারিল যে এই সকল দীর্ঘকায় প্রাণী হইতে উহাদের ক্ষতির কোন সম্ভাবনা নাই, তখন তাঁহাদিগকে খুব একটা ভয় করিত না বটে, তবে খুব নিকটেও ঘেঁসিত না। কি জানি, কে জানে যদিই বা তাহাদের কেহ লিলিপুট দেশে গালিভারের ন্যায় কাহাকেও ধরিয়া খাইয়া ফেলার উপক্রম করিয়া বসে! অতি ক্ষুদ্রকায়

মনুষ্য সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে মহাভারতে অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ বালখিল্য মুনিদেরও উল্লেখ আছে।

এই খর্ব্বাকৃতিগণ বড় অতিথিপরায়ণ। তাহাদের অঞ্চলে আগত এই দীর্ঘাকৃতি প্রাণীদের আহারের জন্য তাহারা কন্দমূল সংগ্রহ করিয়া অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী স্থানে রাখিয়া যাইত। সময় সময় অদূরে থাকিয়া ইহারা তাঁহাদের সঙ্গে তুচারটা কথাও বলিত। কিন্তু বৃথা! ইহাদের হাবভাব ও আচার-ব্যবহার দেখিয়া লোকনাথ ধারণা করিলেন যে ইহারা স্বাধীনভাবে বিচরণ করে, বিবাহাদি সমাজবন্ধন ইহাদের মধ্যে নাই, ইহাদের কথাবার্ত্তা হইতে লোকনাথ "ধোকড়" শব্দটি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ধোকড়[১] কথাটি ব্যবহার করার সময় তাহাদের চোখ, মুখ ও হাতের যে ভাব ভঙ্গি হইত, তাহাতে লোকনাথ বুঝিয়াছিলেন যে ধোকড় অর্থ "কিছুই না", অর্থাৎ অতি তুচ্ছ জিনিস।

এই অন্ধকার দেশে ব্রহ্মচারীগণ দীর্ঘকাল কেবল উত্তর দিকে পথ অতিবাহিত করিয়া চলিলেন। তাঁহারা দেখিলেন সেই চিরঅমানিশারাজ্যেও বদ্রীনাথ, কেদারনাথ ও গঙ্গোত্রীর ন্যায়, বৎসরের কতক কাল, বরফের উপরের স্তর কিঞ্চিৎ গলিতে আরম্ভ করে, আর কতক কাল জমাট বাঁধাই থাকে, ইহাতে তাঁহারা ঐ স্থানের গ্রীষ্মকাল ও শীতকাল ধরিয়া লইতেন।

অন্ধকারের মধ্যদিয়া তাঁহারা অবিরাম চলিতে লাগিলেন। এতকাল তাঁহাদের গমন-পথ বরফের উপর হয় সমতল, নয় ক্রমশঃ উচু হইয়া চলিয়াছে। কিন্তু অবশেষে এই পথ চলিতে চলিতে তাঁহাদের বোধ হইল যেন তাঁহাদের গতি-পথ সমতলও নয়, উচু ত নয়ই; ইহা যেন ক্রমশঃ কেবলই নীচু হইয়া

১ ধোকড় শব্দটির ব্যবহার বাঙ্গালা ভাষায়ও দেখা যায়। ধোকড় অর্থে ছেঁড়া কাঁথা অর্থাৎ তুচ্ছ দ্রব্যাদি বুঝায়। এই অতি খর্ব্বাকৃতি মানবজাতি সম্বন্ধে কোন কিছু তত্ত্ব এখন পর্য্যন্ত কেহ আবিষ্কার করেন নাই। তবে অতিকায় মানবের সংবাদ মাঝে মাঝে শুনা যায়।

চলিয়াছে। তবুও তাঁহারা অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এখন তাঁহারা নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহারা নিম্নদিকে[১] চলিয়াছেন। তাঁহারা থামিলেন, কারণ সুমেরু-শৃঙ্গ আরোহণ করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য।

তাঁহারা পথ ফিরিয়া চলিলেন। যেখান হইতে পথের অধোগমন আরম্ভ হইয়াছে, সেখানে ফিরিয়া আসিলেন, এবং বিস্তৃত স্থান ব্যাপিয়া সুমেরু-শৃঙ্গের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অনেক চেষ্টার পর, তাঁহারা বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি উচ্চ বরফ স্তম্ভ দেখিতে পাইলেন; এবং ইহাদের মধ্যে যেইটি সর্ব্বোচ্চ, তাহাই মেরু শৃঙ্গ ভাবিয়া তাঁহারা উহার শীর্ষদেশে আরোহণ করিলেন। তাঁহারা স্পষ্টতঃ অনুভব করিলেন যে এই স্তম্ভের উপরিভাগে বায়ুতে হিল্লোল নাই, সুতরাং ইহাতে সাধারণ লোকের পক্ষে সহজ শ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য্য বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু তাঁহাদের কোন প্রকার কষ্টবোধ হইল না।

নাবিক কলাম্বাস পৃথিবীকে পূর্ব্ব-পশ্চিমে পরিক্রমণ করিয়া অমর হইয়া রহিয়াছেন। কিন্তু অদ্যাপি পৃথিবীকে কোন ভ্রমণকারী উত্তর-দক্ষিণে প্রদক্ষিণ করেন নাই। এই ব্রহ্মচারী অভিযাত্রীর দল যদি উত্তর মেরু হইতে সেই ক্রমনিম্নগামী পথে অগ্রসর হইতেন, তবে হয়তো ভূতত্ত্বের অনেক রহস্যোদ্ঘাটন হইত।[২]

১ পাতালপুরে।

২ ইদানীং আর্কটিক ও এণ্টার্কটিক অঞ্চল জয় করিয়া মানব সভ্যতা বিস্তারের চেষ্টা চলিতেছে। Atom শক্তির প্রভাবে বরফ রাজ্যে জাহাজ চালানোর ব্যাপারে রাশিয়ার বৈজ্ঞানিকগণ অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছেন। উত্তর-দক্ষিণে বরফপথ অতিক্রম করিয়া ভূপ্রদক্ষিণ করা অদূর ভবিষ্যতে অসম্ভব নয়।

পূর্ব্বাঞ্চলে

চীন দেশে

উত্তরাঞ্চল হইতে তাঁহারা প্রত্যাবর্ত্তন করিতে করিতে অবশেষে সমতল পথে নামিয়া আসিলেন। তখন মহাপুরুষ হিতলাল মিশ্র লোকনাথ ও বেণীমাধবকে বলিলেন, "সুমেরু অঞ্চল যাত্রা সফল হইল। উদয়াচল দর্শনার্থে আমি পূর্ব্বাঞ্চলে যাইতেছি।"

"আমরাও আপনার সঙ্গী হইব," ব্রহ্মচারীদ্বয় মিশ্র ঠাকুরকে বলিলেন। হিতলাল অমত করিলেন না। তাঁহারা চীনদেশ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সাইবেরিয়া হইতে মঙ্গোলিয়া আসিতে তাঁহাদিগকে বহু পাহাড়-পর্ব্বত ও নদ-নদী অতিক্রম করিতে হইল। অবশেষে তাঁহারা চীনদেশে উপস্থিত হইলেন। এই ঘটনা প্রায় এক শত বৎসরের পূর্ব্বের কথা। ব্রহ্মচারীগণ সকলেই জটাজূটধারী, বিবস্ত্র। চীনাদের নিকট ইহারা অতি অদ্ভুত ও অভিনব জীব বলিয়া বিবেচিত হইলেন। হয়তো কোন রাজ-নৈতিক উদ্দেশ্যে ছদ্মবেশে ইহারা চীনদেশে আসিয়াছে ভাবিয়া চীনকর্ম্মচারিগণ তাঁহাদিগকে আটক করিয়া নানাপ্রকার জেরা করিতে লাগিল। আকার ইঙ্গিতে হিতলাল মিশ্র তাহাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে তাঁহারা ভারতীয় সন্ন্যাসী, দেশ ভ্রমণ তাঁহাদের উদ্দেশ্য। বর্ত্তমানে মেরু অঞ্চল হইতে তাঁহারা চীনদেশে আসিয়াছেন। তাঁহারা রাজনীতি বা অর্থনীতির কোন ধার ধারেন না। কিন্তু হিতলালের এই সকল কৈফিয়ৎ চীন-রাজকর্ম্মচারীদের নিকট খাটিল না। তাহারা ব্রহ্মচারীদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিল। চীন-কারাগারে কতক কাল কাটিল। ক্রমে ব্রহ্মচারীদের আচার-ব্যবহারে রাজকর্ম্মচারিগণ বুঝিতে পারিল যে ইহারা বাস্তবিকই নিরপরাধ। ইহাদের দ্বারা চীন

সরকারের কোন প্রকার ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। তখন তাহারা তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিল।

কারামুক্ত হইয়া তাঁহারা বাহিরে আসিলেন। এই সময় হিতলাল তপোবলে জানিতে পারিলেন যে, কর্ম্মযোগী লোকনাথের নিষ্কাম লোকহিতকর কর্ম্মক্ষেত্র উপস্থিত হওয়ার আর বেশী বিলম্ব নাই। একদিন তিনি লোকনাথকে বলিলেন, "লোকনাথ, নিম্ন-ভূমিতে তোমার কর্ম্ম রহিয়াছে; সুতরাং আমার সহিত তোমার আর গমন করা উচিত নয়, তুমি প্রত্যাবৃত্ত হও।"

আবার বিদায়ের পালা। প্রথম বিদায় কাঁকড়া-কচুয়া গ্রামে পিতা-মাতা হইতে; দ্বিতীয় বিদায় কাশীধামে গুরুদেহান্তে; আর তৃতীয় বিদায় চীনদেশে গুরুস্থানীয় হিতলাল মিশ্র ঠাকুর হইতে।

মিশ্র ঠাকুর পূর্ব্বাভিমুখে পথ ধরিলেন। লোকনাথ বেণীমাধব সহ দক্ষিণে চলিতে লাগিলেন।

হিতলালের সংক্ষিপ্ত জীবনী

এখানে মহাপুরুষ হিতলাল মিশ্রের অতি সংক্ষিপ্ত জীবনী লিপিবদ্ধ করা হইল। এই হিতলাল মিশ্রই কাশীধামের সুপ্রসিদ্ধ ত্রৈলঙ্গস্বামী। দাক্ষিণাত্যের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে এই মহাপুরুষের জন্ম হয়। মাতৃ-বিয়োগের পর তিনি গৃহত্যাগ করিয়া দীর্ঘকাল যোগাভ্যাসে রত থাকেন। তারপর রাজপুতানার অন্তর্গত পুষ্কর গমন করিয়া তিনি ভগীরথ নামক এক সন্ন্যাসীর নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। দাক্ষিণাত্যের তীর্থস্থানাদি পরিদর্শন করিয়া, অবশেষে তিনি হিমালয়ে উপস্থিত হন, এবং সেখানে যোগসাধনায় রত থাকেন। ইহার পর তিনি তিব্বতস্থিত মানস সরোবরে গমন করেন। এখানে দীর্ঘকাল যোগসাধনার পর তাঁহার ব্রহ্মলাভ হয়। এই সময় হইতে তিনি ত্রৈলঙ্গস্বামী নামে

অভিহিত হন। অতঃপর ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি বহু প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানাদি পরিদর্শন করেন। হিমালয় হইতে অবতরণকালে কাশীধামের পথে লোকনাথ ও বেণীমাধব সহ গুরু ভগবান গাঙ্গুলীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, এবং কাশীধামে গুরু ভগবান তাঁহার "বালকদ্বয়"কে হিতলালের হস্তে সমর্পণ করেন। সুমেরু ও চীনদেশে ভ্রমণ কাহিনী পূর্ব্বেই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। উদয়াচল ভ্রমণ শেষ করিয়া পুনঃ তিনি কাশীধামে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি জাতিস্মর ছিলেন—তাঁহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব তিন জন্মের কথা তিনি স্মরণ করিতে পারিতেন। যোগবলে ২৮০ বৎসর বয়সে কাশীধামে যোগাসনে এই মহাপুরুষের তিরোধান হয়।[১]

১ ত্রৈলঙ্গ স্বামীর তিরোধানের তিন কি চার বৎসর পর শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবা দেহরক্ষা করেন।

দ্বিতীয় খণ্ড

বারদীর পথে

ব্রহ্মচারী লোকনাথ বেণীমাধব সহ হিমালয়ের পূর্ব্বাঞ্চল ধরিয়া ভারত অভিমুখে অবতরণ করিতে লাগিলেন। তখন আসাম সীমান্তের গুহাপথ দিয়া তথাকথিত বহু সাধু সন্ন্যাসী ভারত এবং হিমালয়ের উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চলে অবস্থিত দেশসমূহে যাতায়াত করিত, এবং সীমান্তস্থিত ভারতীয় শুল্ক-পুলিশের খপ্পরে পড়িয়া তাহাদের জটার ভিতর হইতে বে-আইনিভাবে আনীত টাকা মোহর ইত্যাদি ধনরত্ন আবিষ্কৃত হইত। লোকনাথ বেণীমাধবও এই বেড়াজালে পড়িলেন। সীমান্ত অতিক্রম করার সময় একদল সাধু-সন্ন্যাসীসহ ধৃত হইয়া তাঁহারাও এক উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারীর নিকট আনীত হইলেন। পুলিশের তল্লাসীতে তাঁহাদের জটাজাল নিরপরাধ ঘোষিত হইল। তাঁহারা মুক্তিলাভ করিলেন।

লোকনাথের সুদূরস্থিত নিষ্কাম কর্ম্মক্ষেত্রের আকর্ষণে তাঁহারা চন্দ্রনাথ পাহাড় পর্যন্ত আসিলেন। এখানে আসিয়া তাঁহারা উক্ত পাহাড়ের জনমানবশূন্য অরণ্যময় এক শৃঙ্গে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময় এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটিল—ব্রহ্মচারী লোকনাথের কর্ম্মক্ষেত্র ঘনাইয়া আসিল।

চন্দ্রনাথ পাহাড়ের দাবানলে শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়

শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় নদীয়া জেলার অন্তর্গত শান্তিপুরের সুবিখ্যাত বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমৎ অদ্বৈতাচার্য্যের[১] বংশধর। তিনি বাল্যে পিতৃহীন হন। পরিণত বয়সে ধর্ম্ম-পিপাসার প্রবল

১ অদ্বৈতাচার্য্য—শ্রীচৈতন্য দেবের প্রধান ভক্তদের অন্যতম। দণ্ডী কেশব ভারতীর নিকট হইতে সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণের কিছুকাল পর প্রেমাবতার মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে আগমন করেন, এবং সেখানে মাতা শচীদেবীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়।

তাড়নায় তিনি কলিকাতায় ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং ইহার প্রচার-কার্য্য আরম্ভ করেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের নিরাকার-অনাদি-অনন্ত ব্রহ্মের সাকার অস্তিত্ব হিন্দুধর্ম্মের মূর্ত্তিপূজা, ধর্ম্মপিপাসু গোস্বামী মহাশয়ের মন নিরাকার ব্রহ্মোপাসনায়ত্ত শান্তিলাভ করিতে পারিল না। তিনি অপরাপর বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সাধন-ভজনের মধ্যে আপন পন্থা খুঁজিতে লাগিলেন। ইহাতেও তাঁহার লক্ষ্যবস্তু ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শনলাভ ঘটিলনা। পরে তিনি অনাহারে, অনিদ্রায় দুর্গম বন-জঙ্গল ও পাহাড়-পর্ব্বতে উন্মত্তের ন্যায় সদ্গুরুর[১] অনুসন্ধানে দিবারাত্র ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহার সদগুরু লাভ হইল। শ্রীশ্রীব্রহ্মানন্দ পরমহংসজী মানস সরোবর হইতে আকাশপথে গয়াপাহাড়ে আগমন করিয়া তাঁহাকে দীক্ষা প্রদান করিলেন, এবং "দেশে যাইয়া গৃহী হইয়া প্রচারকার্য্য চালাও" এই উপদেশ দিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে অন্তর্হিত হইলেন। গোস্বামী মহাশয়ের অভীষ্ট সিদ্ধি হইল।

সদ্গুরুর অনুসন্ধানে পাহাড়-পর্ব্বতে ছুটাছুটি করার সময় গোস্বামী মহাশয় একবার চন্দ্রনাথ পাহাড়ের কোন সানুপ্রদেশে উপনীত হইয়া অকস্মাৎ এক অদ্ভুত দুর্ঘটনায় পড়িয়া গেলেন। তিনি দেখিলেন—তাঁহার চতুর্দিকে বাঘ ভালুক মহিষ ইত্যাদি বন্য জন্তু প্রাণভয়ে ছুটিয়া পালাইতেছে, বিহঙ্গকুল ভয়কাতর কলরব করিয়া উড়িয়া যাইতেছে। ফট্-ফাট্, ঠাস্-ঠুস্ শব্দ করিয়া কি যেন চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহাকে ঘিরিয়া দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে। অল্পকাল মধ্যেই তিনি দেখিলেন, পাহাড়ে ভীষণ দাবানল উপস্থিত। তাঁহার অদূরে চতুর্দিকেই অনল বাতাসের সঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া তাঁহাকে ধ্বংসলীলা দেখাইতেছে। অবস্থাটি ঠিক পলাইবার পথ

১ সদ্গুরু বলিলে সচ্চিদানন্দস্বরূপ গুরুকে বুঝায়, যিনি চিৎ সৎ ও আনন্দ তিনি সদ্গুরু। অস্ ধাতুর অর্থ—বর্ত্তমান থাকা। অস্+শতৃ=সৎ। সৎ=নিত্য। চিৎ=চৈতন্য। আনন্দ=পরম আত্মা, ব্রহ্ম।

নাই, বহ্নি ঘিরিয়া আছে। গোস্বামী মহাশয় দেখিলেন, তাঁহার পক্ষে স্থান-পরিবর্ত্তনের কোন সুযোগই নাই। তিনি অধীর হইলেন না। যেখানে ছিলেন, সেখানেই প্রশান্ত ভাবে আসন করিয়া উপবিষ্ট হইয়া সর্ব্বনিয়ন্তা মঙ্গলময়ের ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন—যা করেন বিধাতা।

এই সময় চন্দ্রনাথ পাহাড়ে বেণীমাধব সহ ব্রহ্মচারী লোকনাথ অবস্থান করিতেছিলেন। যোগবলে তিনি গোস্বামী মহাশয়ের দাবানলে আবেষ্টনের অবস্থা অবগত হইলেন।

আসনে উপবিষ্ট গোস্বামী মহাশয় বিপদ-বারণের নাম জপে নিবিষ্টচিত্ত আছেন, এমন সময় এক মহাশক্তিশালী সন্ন্যাসী তথায় উপস্থিত হইয়া বিশালকায় গোস্বামী মহাশয়কে আপন বক্ষে তুলিয়া লইলেন এবং অদগ্ধ অবস্থায় সেই ভয়াবহ দাবানল-ব্যূহ ভেদ করিয়া তাঁহাকে এক নিরাপদ স্থানে রাখিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন। মহাপুরুষের অঙ্গস্পর্শে ইতঃপূর্ব্বেই গোস্বামী মহাশয়ের ধ্যান ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তিনি বাহ্যতঃ সবই দেখিলেন, কিন্তু কিছুই বলার সময় পাইলেন না। এ যেন নিমেষের খেলা! জ্বালাময়ী অগ্নিশিখা গোস্বামী মহাশয়ের নিকট শান্ত শীতল কর-সঞ্চালন বলিয়া অনুভূত হইল। তাঁহার নিকট ব্যাপারটি স্বপ্নবৎ মনে হইতে লাগিল। কিন্তু এ তো স্বপ্ন নয়—ঐ যে দূরে তিনি এখনও দাবানল দেখিতে পাইতেছেন। কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বের ঘটনা বই তো নয়;—এখনও তাঁহার চক্ষে ভাসিতেছে সেই জটাজূটশির আজানুলম্বিত বাহু, দিব্যকান্তি-বিশিষ্ট দেহযষ্টি! সেই শান্ত শীতল অঙ্গের স্পর্শে এখনও তাঁহার দেহ শীতল। ধন্য তুমি বিজয়কৃষ্ণ, তুমিই ব্রহ্মচারী বাবার সর্ব্বপ্রথম কোল পাইলে!

বিস্ময় দূর হইলে গোস্বামী মহাশয় আশে পাশে সেই মহাপুরুষের অনেক অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু বৃথা।[১]

১ শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের বারদীর আশ্রমে আগমন—দ্রষ্টব্য।

চন্দ্রনাথ পাহাড়ে বাঘিনী

মহাপুরুষ লোকনাথের বিভূতি বিকাশ আরম্ভ হইল। চন্দ্রনাথ পাহাড়ে লোকনাথ ও বেণীমাধব নিজেদের ভাবে আছেন, এমন সময় একদিন অদূরে তাঁহারা ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্র গর্জ্জন শুনিতে পাইলেন। গর্জ্জন থামিতেছে না, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া, লোকনাথ সেই দিকে মন দিলেন। ধ্যানে তিনি অবগত হইলেন —একটি সদ্যঃপ্রসূতা বাঘিনী কয়েকটি শাবক সম্মুখে রাখিয়া গর্জ্জন করিতেছে। মানুষ শ্রেণী হিসাবে সাধারণতঃ বন্য পশু-পক্ষীর স্বভাবজাত শত্রু। বাঘিনী ভাবিতেছে—এই লোক দুইটি তাহার প্রিয় সন্তানগুলির এত সম্মুখে অবস্থিত। ইহারা না শাবকগুলিকে অপহরণ করিয়া লইয়া যায়—বাঘিনীর এই ভয়, এবং এই জন্যই সে আর্ত্তনাদ করিতেছে।

জঙ্গলের মধ্যে কিছু দূর অগ্রসর হইয়া লোকনাথ দেখিলেন, বাঘিনী হিংস্রজাতীয়া, চোখে তাহার ভয়। সন্তানগুলি বুকে রাখিয়া সে অর্দ্ধ-শায়িত অবস্থায় সন্ত্রস্ত। সে ব্রহ্মচারীর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। দয়ারসাগর লোকনাথ হস্তসঞ্চালনে উহাকে বলিলেন, "তোমার কোন ভয় নেই। আমরা ব্রহ্মচারী। আমাদের দ্বারা তোমার কোন ক্ষতি হবে না। তুমি শান্ত হও, শিশুসন্তান লইয়া সুখে বিশ্রাম কর।"

বাঘিনী যেন তাঁহার কথা বুঝিল,—সে আস্তে আস্তে নীরব হইল। পরদিন সন্ধ্যাকালে বাঘিনী আবার গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। ব্রহ্মচারী পুনরায় ধ্যানে জানিতে পারিলেন, বাঘিনী প্রথম প্রসূতা। সন্তানগুলিকে কিরূপে রক্ষা করিতে হইবে, তাহা সে বুঝিতে পারিতেছে না। সে নিজে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর, আহার্য্য সংগ্রহ করা একান্ত দরকার, এদিকে সন্তানগুলিই বা কোথায় রাখিয়া যায়। এই সকল সমস্যায় পড়িয়া বাঘিনী নিরুপায় হইয়া চীৎকার করিতেছে। ব্রহ্মচারী আবার বাঘিনীর নিকট গেলেন, এবং
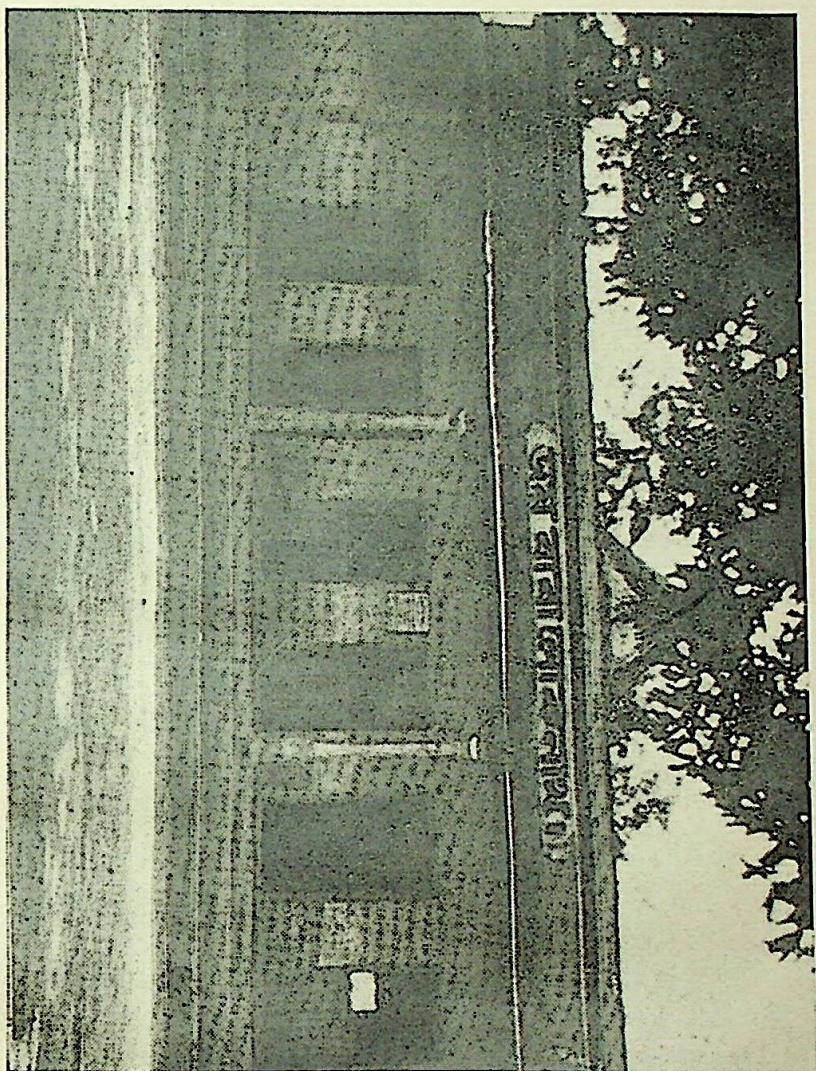
অতিথিশালা, ব্রহ্মচারী বাবার আশ্রম, বারদী (ফটো ১৯৬০)

বাঘিনীকে মধুর কণ্ঠে বলিলেন, "শিশুদিগকে এখানেই রেখে, তুমি শিকার করতে যাও। ইহাদের জন্য কোন আশঙ্কা করো না। আমি ইহাদিগকে রক্ষা করব।"

দয়াল ঠাকুর বাবা লোকনাথ হিংস্র বাঘিনীর সন্তান রক্ষণে নিজকে নিযুক্ত করিলেন। বাঘিনী ব্রহ্মচারী বাবার কথা ও তদনুযায়ী হাবভাব জানিয়া লইয়া শিকারে বাহির হইল। কতক-কাল পর পুনঃ বাঘিনীর ডাক শুনিয়া ব্রহ্মচারী বাঘিনীর ভাষায় বুঝিলেন,—আমি ফিরিয়া আসিলাম, এখন তোমার ছুটি।

ইহার পর হইতে প্রত্যহ বাঘিনী শিকার যাওয়ার সময় তাহার শিশুদের পাহারাওয়ালাকে গর্জ্জন করিয়া জানাইয়া বাহির হইত এবং শিকার অন্তে ফিরিয়া আসিয়া আর এক গর্জ্জনে তাঁহাকে ছুটি দিত। এইরূপে বাঘিনীর প্রতিবেশী হিসাবে তাঁহাদের কতক কাল কাটিল।

অতঃপর লোকনাথ এই স্থান ত্যাগ করিবেন ভাবিলেন, এবং এক দিন সন্ধ্যাবেলা রওনা হইয়া তাঁহারা কিছু দূর গেলেনও, এমন সময় সেই বাঘিনীর বন-জঙ্গল কাঁপান গর্জ্জন আবার তাঁহারা শুনিতে পাইলেন। ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া, ব্রহ্মচারী লোকনাথ বেণীমাধবকে বলিলেন, "না, বেণী, আজ আর যাওয়া হলনা। ঐ শোন! বাঘিনীর আহারের সময় উপস্থিত। সে টের পেয়েছে যে আমরা ওখানে নেই। তাহার কষ্ট হইতেছে। আরও কিছুকাল এখানে থাকতে হবে।"

তাঁহারা পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসিলেন। লোকনাথ বাঘিনীর নিকট গিয়া বলিলেন, "যত দিন তোমার সন্তানেরা তোমার সঙ্গে বাহির হইয়া যাইতে না পারিবে, তত দিন আমরা এখানে রহিয়া গেলাম। আর দুঃখ করোনা।"

পূর্ব্বের ন্যায় প্রতিবেশিনী বাঘিনীর সন্তানের পাহারা কার্য্য চলিতে লাগিল। শাবকগুলির প্রতি ব্রহ্মচারী লোকনাথের সতর্ক

দৃষ্টি রহিয়াছে। উহারা নিজেরা নিজেরা, বা মায়ের লেজের সঙ্গে নানারূপ খেলাধূলা করে। ইদানীং উহারা শিকারের সময় মায়ের সঙ্গে কতক পথ যায়, কিন্তু সম্পূর্ণ সাহস হয় না, আবার ফিরিয়া আসে। এইরূপে আরও মাসাধিক কাল গত হইল। একদিন ব্রহ্মচারী লোকনাথ দেখিলেন সন্তানেরা শিকারের সময় মায়ের পিছু পিছু পথ ধরিয়াছে। অন্যান্য দিনের মত উহারা আজ আর ফিরিয়া আসিল না। নিজের অঙ্গীকার প্রতিপালিত হইয়াছে ভাবিয়া, লোকনাথ চন্দ্রনাথ ত্যাগ করিবেন স্থির করিলেন। তখন তাঁহাদের বয়স কিছু কমবেশী এক শত ত্রিশ বৎসর।

আবার বিদায়! শৈশবের সাথী বেণীমাধব একত্র বসা, একত্র উঠা; সাধনপথে ক্রিয়াকলাপ সবই উভয়ের এক সঙ্গে। স্থির হইল চন্দ্রনাথ পাহাড় হইতে ব্রহ্মচারীদ্বয় বিভিন্ন পথ ধরিবেন,—বেণীমাধব অগ্রসর হইবেন কামরূপ অভিমুখে[১]; আর ব্রহ্মচারী লোকনাথ নামিবেন পূর্ব্ববঙ্গের সমতল ভূমিতে। বেণীমাধব ও লোকনাথ পরস্পর হইতে লৌকিকভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া নিজ নিজ কর্ম্মপথে চলিলেন।

দাউদকান্দিতে লোকনাথ
বারদীর ডেঙ্গু কর্ম্মকার

শীতকাল। চন্দ্রনাথ পাহাড়ে বেণীমাধকে বিদায় দিয়া ব্রহ্মচারী লোকনাথ ভ্রমণ করিতে করিতে পূর্ব্ববঙ্গে ত্রিপুরা জেলার দাউদকান্দি গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দাউদকান্দি কৃষিপ্রধান স্থান। এখানে আসিয়া তিনি মাঠের এক বৃক্ষতলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভাবে তিনি আছেন।

১ কামরূপ—ভারতের একান্ন পীঠস্থানের অন্যতম। এখানে শ্রীশ্রীকামাখ্যা দেবীর মন্দির অবস্থিত।

স্থানীয় কৃষকগণ নিজ নিজ ক্ষেত হইতে ক্ষীরা[১] তুলিয়া গৃহে ফিরিবার সময় দুই-একটা এই সাধুর সম্মুখে রাখিয়া যাইত। প্রয়োজন হইলে তাহা দ্বারাই তিনি ক্ষুণ্নিবারণ করিতেন।

ঢাকা জিলায় নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বারদী একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। মেঘনা নদীর পশ্চিম তটে এই গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামের ডেঙ্গু কর্ম্মকার নামে একজন লোক তাঁহার বিষয়কর্ম্মে দাউদকান্দি বাস করিতেন। তিনি রোজই মাঠের এই সাধুকে দর্শন করিতে আসিতেন, এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পায়ের ধূলি লইতেন। একবার ডেঙ্গু কর্ম্মকার একটা ফৌজদারী মোকদ্দমায় আসামীরূপে জড়িত হন। কুমিল্লা সহরে তাঁহার বিচার। জামিনে মুক্ত হইয়া তিনি দাউদকান্দি ফিরিয়া আসেন, এবং মাঠের সাধুর শরণাপন্ন হন। তাঁহার বিশ্বাস সাধু ইচ্ছা করিলেই তাঁহাকে এই বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারেন। মোকদ্দমার আদ্যোপান্ত সব বৃত্তান্ত ডেঙ্গু সাধুর নিকট নিবেদন করিলেন। সাধু তাঁহার সব কথা স্থির ভাবে শুনিলেন, এবং কিঞ্চিৎকাল মৌন থাকিয়া বলিলেন, "যা, তুই খালাস পাবি।"

মোকদ্দমার নির্দ্দিষ্ট তারিখে ডেঙ্গু বিচারালয়ে উপস্থিত হইলেন। মোকদ্দমা সংক্রান্ত ঘটনাদি শ্রবণ করিয়া বিচারক তাঁহাকে খালাস দিলেন। ডেঙ্গুর বিশ্বাস সত্যে পরিণত হইল।

কুমিল্লা হইতে ফিরিয়া অসিয়া সাধুবাবা এক দৈবশক্তি-সম্পন্ন মহাপুরুষ ভাবিয়া ডেঙ্গু তাঁহার চরণতলে পতিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন—এই মহাপুরুষকে তাঁহার নিজ গ্রাম বারদীতে লইয়া গিয়া তাঁহার বাড়ীতে তাঁহার আস্তানা করিয়া দিতে পারিলে লোকের উপকার হইবে। কিছু কাল পর এক দিন তিনি আন্তরিক ভক্তির সহিত তাঁহার সাধুবাবাকে বলিলেন, "বাবা গোসাঁই, যদি আপনার আজ্ঞা হয়, তবে আপনাকে আমাদের স্বগ্রাম বারদীতে লইয়া যাই।"

১ গোলাকার শশা বিশেষ।

কিঞ্চিৎকাল মৌন থাকিয়া ব্রহ্মচারীবাবা ডেঙ্গুর প্রস্তাবে রাজি হইলেন। আস্তানা আপাততঃ ঠিক হইল।

লোকনাথ ব্রহ্মচারীর বারদীতে আগমন ডেঙ্গু কর্ম্মকারের গৃহে

দাউদকান্দিতে ডেঙ্গু তাঁহার গোসাঁই বাবার সম্মতি লাভ করিলেন,—তিনি বারদী আসিবেন। ডেঙ্গুর আজ কি আনন্দ, কি উৎসাহ! তিনি তাঁহার সাধ্যমত একটি ভাল নৌকায় তাঁহার গোসাঁই বাবাকে লইয়া স্বগৃহাভিমুখে রওনা হইলেন। আমরা ভাবিতেছি, গোসাঁই বাবার সম্মতি পাইয়া ডেঙ্গু কর্ম্মকার তাঁহাকে বারদী লইয়া আসিতেছেন! ডেঙ্গু কর্ম্মকার নিমিত্তমাত্র—ইহা খাঁটি কথা।

'তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা,
লোকে বলে করি আমি।"

যথাসময়ে নৌকা আসিয়া বারদীর বাজারে ছাগল-বাঘিনীর[১] ঘাটে লাগিল। গোসাঁই বাবাকে নৌকায় রাখিয়া, ডেঙ্গু তাঁহার বাড়ীতে সংবাদ দিতে গেলেন। তাঁহার মুখে একজন সাধু আসিয়াছেন—এই সংবাদ শুনিয়া, তাঁহার পাড়ার স্ত্রী-পুরুষ অনেকেই সাধু দেখিতে ছুটিয়া আসিল। অনেক আশা করিয়া প্রতিবেশীরা আসিয়া সাধুকে যে অবস্থায় দেখিল, তাহাতে তাহারা সুখী বা সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। তাহারা নানা রকম সমালোচনা করিতে লাগিল। বিশেষ করিয়া সাধু যে বসনহীন—ইহাই তাহাদের রুচিপ্রদ হইল না।

ডেঙ্গু দমিলেন না। তিনি পরম সমাদরে গোসাঁই বাবাকে তাঁহার বাড়ীতে আনিয়া তাঁহার বাসের জন্য একখানা পৃথক ঘর ছাড়িয়া দিলেন।

১ ক্ষুদ্র প্রবাহিণী। "ছাওয়াল-বাঘিনী" নাম ও প্রচলিত।

শ্রীশ্রীব্রহ্মচারী বাবা লোকনাথ বারদীতে পদার্পণ করিলেন। এখানে একটি প্রশ্ন—তিনি অন্য কোথাও না যাইয়া বারদী কেন আসিলেন ?

আমাদের সীমাবদ্ধ সামান্য বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা ইহার সঠিক উত্তর দেওয়া অসম্ভব। মহাপুরুষের কি ইচ্ছা, তাহা তিনিই জানেন। আমরা শুধু জানি—তিনি আমাদের হিতের জন্য এখানে আসিলেন। শতাধিক বৎসরেরও অধিক কাল যে অক্ষয় ধন-সম্পত্তি তিনি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজের জন্য নয়, তাহা সংসারের মায়াবদ্ধ জীবের জন্য—কীট-পতঙ্গ, পশু-পক্ষী নানা প্রকার জীবজন্তু ও মানবের কল্যাণের জন্য।

লোকনাথের ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অব্যবহিত পরেই যখন তিনি গুরুর জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতেছিলেন, তখন গুরু ভগবান তাঁহাকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে তিনি আবার আসিবেন[১], এবং শিষ্য লোকনাথ তখন তাঁহার গুরু হইয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিবেন।

গুরু যে কোথায় আছেন, তাহা যোগবলে লোকনাথের জানা আছে। তাঁহার গুরু এখন তাঁহার শিষ্য হইয়া তাঁহার নিকট আসিবেন—ইহাই সাধারণ লৌকিক আচার; অবশ্য ইহার ব্যতিক্রমও দৃষ্ট হয়—গুরুও শিষ্যের নিকট আসেন।

গুরুস্থানীয় হিতলাল মিশ্র যোগবলে সব বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন। তিনি ব্রহ্মচারী লোকনাথকে চীনদেশে বলিয়াছিলেন, "নিম্নভূমিতে তোমার কাজ[২] আছে।"

ঢাকা পূর্ব্ব-বঙ্গের প্রধান নগরী। ঢাকা হইতে বারদী বার-চৌদ্দ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। বারদী নাগ-জমিদার প্রধান গ্রাম।[৩] ঢাকা হইতে বারদী যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা—দুইটি স্থলপথ ও

১ আসিবেন = জন্মগ্রহণ করিবেন।

২ 'কাজ' অর্থে গুরুর উদ্ধার সাধন—এই ভাবটিই সর্ব্বাগ্রে মনে উপস্থিত হয়।

৩ ভারত বিভাগের পর পূর্ব্ব-বঙ্গের অন্যান্য হিন্দুপ্রধান স্থানের ন্যায় বর্ত্তমানে বারদী গ্রামেরও গুরুত্ব কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু বাবার আশ্রমটি অক্ষুণ্ণ আছে।

দুইটি জলপথ। বারদীতে তখন ষ্টীমার ষ্টেশন থাকায়, পূর্ব্ববঙ্গের অন্যান্য স্থান হইতেও বারদী যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা ছিল।

পূর্ব্ব-বঙ্গে নারায়ণগঞ্জ সহরের পূর্ব্বদিকে হিন্দুর অন্যতম তীর্থস্থান লাঙ্গলবন্ধ অবস্থিত। প্রবাদ আছে,—বিষ্ণুর অষ্টম অবতার বসুদেবতনয় মহাবীর শ্রীবলরাম পঞ্চ-পাণ্ডব কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তাহার লাঙ্গল সংযোগে পাণ্ডব-সাম্রাজ্যের সীমারেখা স্থাপন করিতে বহির্গত হন। এখানে আসিয়া তাঁহার 'লাঙ্গল' চালনা অব্যক্ত কিছুতে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া 'বন্ধ' হইয়া যায়। এই জন্য ইহার নাম লাঙ্গলবন্ধ হয়। হল চালনায় যে খাত হয়, তাহা একটি নদে পরিণত হয়। নদটীর স্থানীয় নাম ব্রহ্মপুত্র। ইহা উত্তর দিক হইতে প্রবাহিত হইয়া মেঘনা নদীতে পতিত হইয়াছে। বারদীর ছাগল-বাঘিনীর সঙ্গে ইহার সংযোগ আছে। কাশীধামের গঙ্গার ন্যায় লাঙ্গলবন্ধের ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিমতটে অন্ততঃ দুই মাইল ব্যাপী বহু সুপ্রশস্ত ইষ্টক-নির্ম্মিত স্নান-ঘাট—প্রত্যেক ঘাটের উপরই একটি করিয়া দেবমন্দির। বার মাসই এই সকল মন্দিরে ভক্তসমাগম হইয়া থাকে। উত্তর দিক হইতে আরম্ভ করিয়া প্রধান প্রধান মন্দিরে প্রতিষ্ঠিতা আছেন জগন্মাতা অন্নপূর্ণা, রক্ষাকালী, জয়কালী, পাষাণকালী ও শ্মশানকালী। এই সকল মন্দিরের সঙ্গে সঙ্গে বহু শিবমন্দিরও আছে। ইহা ছাড়া আরও অনেক দেব-দেবীর মন্দির আছে।

লাঙ্গলবন্ধের বিশেষ পর্ব্ব—বাসন্তী অষ্টমী স্নানযাত্রা ও আষাঢ়ী পূর্ণিমা স্নানযাত্রা। আষাঢ় মাসে নদ কূলে কূলে ভরা থাকে, তখন বর্ষাকাল। আষাঢ়ী স্নানে পূর্ব্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে হাজার হাজার যাত্রী নৌকাযোগে লাঙ্গলবন্ধে আসিয়া স্নানাদি তীর্থকর্ম্ম করিয়া থাকে। চৈত্রমাসে নদ জল-বিরল। তখন বাসন্তী অষ্টমী স্নানযাত্রা উপলক্ষে জল স্থল উভয় পথেই ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু সাধু-সন্ন্যাসী ও যাত্রীর সমাগম হয়। জয়কালী মাতার

মন্দিরের দক্ষিণে বিস্তীর্ণ একটি প্রান্তর। এই প্রান্তরে কয়েকটি বিশাল বটবৃক্ষ। অষ্টমীস্নান উপলক্ষে এই প্রান্তর সমাগত বহু সাধু-সন্ন্যাসী ও ভক্তগণের মিলন-কেন্দ্র হয়। ইহার নাম প্রেমতলা। এখানে কেহ বা ধ্যানমগ্ন, কেহ বা শাস্ত্রপাঠে রত, কেহ বা ভজন গানে উন্মত্ত, নানাভাবে সাধু-সন্ন্যাসী ও ভক্তগণ প্রেম বা নাম বিলাইয়া থাকেন।[১]

বারদী গ্রাম লাঙ্গলবন্ধ হইতে তিন মাইল ব্যবধান। বাসন্তী অষ্টমীতে লাঙ্গলবন্ধের স্নানান্তে বহু সাধু-সন্ন্যাসী ও যাত্রী নিকটবর্ত্তী এই বারদীতে যাইয়া যথাসময়ে মহাপুরুষ লোকনাথের দর্শনলাভ করিয়া কৃতার্থ হইতেন।

গোসাঁইবাবা লোকনাথ ডেঙ্গু কর্ম্মকারের বাড়ীতে কতক কাল কাটাইলেন। তাঁহার শুভাগমন অবধি ডেঙ্গুর দিন দিন সৌভাগ্যবৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহার ঘরবাড়ী এখন ধনে জনে পূর্ণ। কিন্তু ডেঙ্গুর গোসাঁই বাবা যে বহির্বাসটুক পর্য্যন্ত পরিধান করেন না। বাড়ীর অন্যান্য অংশের আত্মীয়গণ এবং পাড়ার অনেকেই ডেঙ্গুর অসাক্ষাতে বলাবলি করিতে লাগিল যে, এই পাগল এখানে থাকায়, তাহাদের বউ-ঝিদের গমনাগমনে বিঘ্নসৃষ্টি হইতেছে। ডেঙ্গু এখন সঙ্গতি-সম্পন্ন, প্রতিবেশীর উপর তাঁহার প্রভাবও কম নয়। কাজেই শত অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও তাহারা মুখ ফুটিয়া এই কথা ডেঙ্গুকে বলিতে সাহস পাইল না। শুধু পাড়ার লোক নয়, বারদীর ও আশেপাশের গ্রামের সকলেই ডেঙ্গুর গোসাঁই বাবাকে একটা কাণ্ডজ্ঞানবর্জ্জিত হীন জাতের লোক বলিয়া সাব্যস্ত করিল।

মহাপুরুষ লোকনাথ অধিকাংশ সময়ই ঘরের বাহিরে থাকিতেন। তখন ছেলের দল তাঁহাকে নানা ভাবে জ্বালাতন

১ ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কম বেশী এই অবস্থা ছিল। ১৯৬৪ সালের ভীষণ দাঙ্গায় ইহা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

করিয়া আমোদ উপভোগ করিত। ছেলেদের উৎপাত অসহ্য হইলে তিনি কোন কোন সময় নিকটস্থ বৃক্ষ বা ঝোঁপ-জঙ্গলের আড়ালে আশ্রয় নিতেন। কালীঘাটের ঐ জটাজূটধারী জীবদের প্রতি বাল্যাবস্থায় লোকনাথের ব্যবহারে গুরু ভগবান তো ভবিষ্যৎ-বাণী করিয়াই রাখিয়াছিলেন, "তোমরা বড় হইয়া যখন ইঁহাদের মত হইবে, তখন অন্যে যদি তোমাদের প্রতি এরূপ আচরণ করে, তবে তোমাদের কেমন লাগিবে ?"

ছেলেদের এই আমোদ অধিকাংশ সময় নিকটস্থ বয়োবৃদ্ধেরাও উপভোগ করিত, এবং তাহাদের অনেকেই এই মহাপুরুষকে গ্রাম্য ভাষায় অযথা গালিগালাজ করিতেও ছাড়িত না। এই কাণ্ডজ্ঞান-হীন উন্মাদের একটা বিশেষত্ব এই ছিল যে আবালবৃদ্ধের এত উপদ্রব তিনি নীরবে সহ্য করিতেন ; তাঁহার প্রতি অন্যায় আচরণের জন্য কাহাকেও তিনি কোন সময় কিছু বলিতেন না। এত জ্বালাতন, এত উৎপাত—তবুও তিনি বারদী ত্যাগ করিলেন না। কেন ?

যজ্ঞোপবীত

বারদীনিবাসী লোকে এমন কি বয়স্কগণও—কি ব্রাহ্মণ, কি অব্রাহ্মণ—সকলেই এ পর্য্যন্ত লোকনাথকে অপবিত্র, নীচ জাতি ও বিকৃতমস্তিস্ক ভাবিয়া উপেক্ষা করিত। হঠাৎ একদিন তাহাদের ভুল ভাঙ্গিয়া গেল।

বারদী গ্রামের দুই তিন জন ব্রাহ্মণ একদিন একত্র বসিয়া পৈতা গ্রন্থি দেওয়ার চেষ্টা করিতেছেন ; কিন্তু সূতায় পাক লাগিয়া যাওয়ায় তাঁহারা বড় অসুবিধায় পড়িয়া গেলেন, এমন সময় অস্পৃশ্য এই পাগল যদৃচ্ছাক্রমে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে নিকটে দেখামাত্রই ব্রাহ্মণেরা ক্ষেপিয়া উঠিলেন এবং ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "এই, এদিকে আ্সিস্ না, খবরদার ! আমরা পৈতা গ্রন্থি দিতেছি, আমাদিগকে ছুঁইস্ না।"

ব্রাহ্মণদের এই হুমকিতে মহাপুরুষ লোকনাথ ঈষৎ হাসিভাব দেখাইলেন, এবং বলিলেন, "কেন, আমি ছুঁইলে কি তোমাদের জাতি যাবে নাকি ?"

ব্রাহ্মণেরা পাগলের এই আস্পর্দ্ধা দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে এক জন বলিলেন, "জাতি যাবে না তো কি ? তুই কি জাত না কি জাত তা কে জানে ?"

অবস্থা চরমে উঠিল। এবার প্রতিক্রিয়া।

মহাপুরুষ ব্রাহ্মণদের জাতির বড়াই দেখিয়া হাসিলেন এবং মৃদুস্বরে বলিলেন, "তোমরা কোন্ গোত্র ?"

পাগলের মুখে এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে ব্রাহ্মণগণ অপ্রতিভ হইয়া একে অন্যের মুখের দিকে তাকাইতে লাগিলেন, এবং ইহাদের অন্যতম সুর নামাইয়া উত্তর করিলেন, "আমরা কাশ্যপ গোত্র।"

ব্রহ্মচারী এবার বলিতে লাগিলেন, "কাশ্যপ-অবসর-নৈধ্রুব-প্রবর।"

যাঁহাকে কিছুক্ষণ পূর্ব্বে সমাজের অস্পৃশ্য নীচ বা অনার্য্য জাতিসম্ভূত ভাবিয়া ব্রাহ্মণগণ নিজদিগকে বর্ণশ্রেষ্ঠ বলিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করিতেছিলেন, সেই হীন ও পতিতের মুখে নিজেদের গোত্র-পতিদের নাম শুনিয়া তাঁহারা চমকিয়া উঠিলেন!

মহাপুরুষ লোকনাথ তাঁহাদের তখনকার ভাব দেখিয়া আরও বলিতে লাগিলেন, "কি থামলে কেন ? গ্রন্থি দাও না ?"

পাগলের এই উক্তিতে তাঁহাদের চৈতন্যোদয় হইল,—আগন্তুক নিশ্চয়ই কোন ছদ্মবেশী মহাপুরুষ ভাবিয়া, তাঁহারা আর কিছু বলিতে সাহস পাইলেন না।

আগন্তুক আবার একটু দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, "গ্রন্থি দিতে বিরত হইলে কেন ?"

বেশ একটু নরম সুরে তাঁহাদের এক জন প্রকাশ করিয়া

ফেলিলেন, "পৈতাটা পাক লাগিয়া জড়াইয়া গিয়াছে, আমরা খুলতে পাচ্ছিনা।"

মহাপুরুষ। পৈতায় পাক লাগলে কিরূপে খুলতে হয় ?

উত্তর। [সবিস্ময়ে] গায়ত্রী জপ ক'রে !

মহাপুরুষ। তা কর না কেন ?

ব্রহ্মচারী লোকনাথের মুখে এই কথা শুনিয়া তাঁহারা হতভম্ব হইলেন, এবং নিজদিগকে বড়ই বিব্রত বোধ করিতে লাগিলেন,—কি উত্তর যে দিবেন, তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তাঁহাদের তখনকার অবস্থাটি বড়ই সঙ্কটজনক হইয়া উঠিল। গায়ত্রী ঠিকমত উচ্চারিত হইলে, সূতার পাক খুলিবে—ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব টিকিবে। আর গায়ত্রীর অশুদ্ধ উচ্চারণে, পাকও খুলিবে না, ব্রাহ্মণত্বের বড়াইও টিকিবে না। অবশেষে তাঁহারা নিজেদের নতি স্বীকার করিলেন, এবং তাঁহাদের এক জন বিনীতভাবে ও কাতর কণ্ঠে আগন্তুককে বলিলেন, "আমরা তেমন ভরসা পাচ্ছি না। দয়া করে আপনি যদি পৈতার পাকটা খুলে দেন, তবে বড়ই উপকার হয়।"

ব্রহ্মচারী লোকনাথের পদোন্নতি হইল,—তিনি বর্ণশ্রেষ্ঠের আসরে "তুই" হইতে "আপনি" পর্য্যায়ে উঠিলেন। তখন ব্রাহ্মণদিগকে পৈতার দুই মাথা আস্তে আস্তে টানিতে বলিয়া নিজে স্বয়ং পৈতার উপর গায়ত্রী জপ করিয়া করতালি দিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে পৈতার পাক খুলিয়া গেল—সূত্র সরল হইল। ব্রাহ্মণগণ এই মহাশক্তিধর পুরুষের শক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহার চরণতলে পতিত হইলেন। তাঁহারা বুঝিলেন—পাগল ত পাগল নয়, এ যে সিদ্ধবাবা! ব্রহ্মচারী বাবা নিজে ধরা দিলেন,—ব্রাহ্মণেরা এখানে উপলক্ষমাত্র।

এই বিস্ময়কর ঘটনার সংবাদ বায়ুবেগে চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। মহাপুরুষের দর্শন লাভ করার জন্য নানা স্থান হইতে দলে দলে লোক বারদী আসিতে আরম্ভ করিল। এখন হইতে তিনি যখন

যেখানে থাকেন, সেখানেই লোকের ভীড়। তাহারা ঠিক ধরিয়া ফেলিল,—গোসাঁই বাবা যাহাকে যাহা বলেন, তাহাই ঠিক হয়।

স্থানীয় জমিদারগণও পৈতাগ্রন্থির সংবাদটি শুনিলেন। তাঁহাদের অনেকেই মহাপুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন, এবং ভাবিলেন—সাধু একজন প্রচ্ছন্ন মহাপুরুষ।

এই সময় ডেঙ্গু কর্ম্মকারের মৃত্যু হয়। এবার তাঁহার পরিবারের একজন লোক মহাপুরুষ লোকনাথকে তাহাদের বাড়ী ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতে বলিল। ইহাতে ব্রহ্মচারীর বাক্যস্ফূরণ হইল; তিনি বলিলেন, "আমি সন্ন্যাসী, এ স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে আমার কোন অসুবিধাই নাই। কিন্তু তুই ভাল বুঝিস্ নি।"

ব্রহ্মচারী ডেঙ্গুর বাড়ী ছাড়িলেন। তিনি এতদিন কর্ম্মকার-দিগকে দৈবদুর্ব্বিপাক হইতে রক্ষা করিতেছিলেন। তিনি চলিয়া যাওয়ার পর, ইহাদের উপর দৈব প্রবল হইয়া উঠিল, এবং অনতিকাল মধ্যেই তাহাদের ধনে জনে ভাটা পড়িল।

জমিদারগণ শুনিলেন যে সাধু ডেঙ্গুর বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে। তাঁহাদের অনেকেই অচিরে একত্র হইয়া ব্রহ্মচারীর নিকট আসিলেন, এবং বারদীতে একটি আশ্রম করিয়া অবস্থান করার জন্য তাঁহাকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন।

লোকনাথ তাঁহাদিগকে বলিলেন, "যদি তোমরা আমাকে একখণ্ড নিষ্কর ভূমি দান করিতে পার, তবে আমি সেখানে আশ্রম করিয়া থাকিতে পারি।"

জমিদারগণ এই প্রস্তাব শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। বর্ত্তমান বারদীর বাজারের পূর্ব্বাংশে একখণ্ড জমিতে তখন শবদাহ করা হইত বলিয়া, ইহার কোন খাজনা পাওয়া যাইত না। ইহা শরীকি মালিকের অধীন ছিল। মালিকগণ ঐ স্থানটুক আশ্রম করার জন্য ব্রহ্মচারীকে ছাড়িয়া দিলেন।

বারদীতে গোসাঁইর আশ্রম
ও তাঁহার সংসার

আশ্রমের জন্য প্রদত্ত জমির সামান্য উত্তরে ছাগল-বাঘিনী প্রবাহিত, দক্ষিণে খোলামাঠ। এই খোলামাঠ বাজারেরই অংশ। পূর্ব্বদিকে চাষাবাদী জমি ও পশ্চিমে বন্দরতুল্য বাজার। সকালে প্রাত্যহিক দৈনিক বাজার ছাড়া সপ্তাহে তুই দিন হাট বসে। দৈনিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যে কোন সময় এখানে পাওয়া যায়।

অল্পকালের মধ্যেই গৃহ নির্ম্মাণোপযোগী বাঁশ-বেত ইত্যাদি উপকরণ সংগৃহীত হইয়া গেল। কর্ম্মীর অভাব নাই। ব্রহ্মচারী নিজেও গৃহ-নির্ম্মাণকার্য্যে সুদক্ষ। তিনিও কর্ম্মীদের সঙ্গে ঘর তোলার কাজে লাগিয়া গেলেন। দেখিতে দেখিতে উত্তরের ভিটিতে দক্ষিণ-মুখ আশ্রম-মন্দির বাসযোগ্য হইয়া উঠিল। ব্রহ্মচারী বাবার প্রথম গৃহাধিষ্ঠান-উৎসবের দিন তাঁহারই অনুমতিক্রমে স্থানীয় জমিদারগণ তাঁহাকে গৈরিক কৌপিন বহির্ব্বাস এবং ব্রাহ্মণোপযোগী উপবীত প্রদান করিলেন। শ্মশানে শিব প্রতিষ্ঠিত হইলেন। চতুর্দ্দিক হইতে হাজার হাজার লোক এই মহোৎসব অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া ভজন-কীর্ত্তনাদি করিল ও প্রসাদ পাইল।

ধন্য কচুয়ানিবাসী রামকানাই ঘোষাল! ধন্যা মাতা কমলাদেবী! আজ তোমাদের চতুর্থ রত্ন লোকনাথ লোকের নাথ হইয়াছেন। আর ধন্য গুরু ভগবান গাঙ্গুলী! তোমার আপ্রাণ যত্ন-চেষ্টায় আজ তোমারই প্রাণপ্রিয় পুত্রতুল্য শিষ্য তোমাকে তুলিয়া লইতে বারদীতে আসন পাতিলেন।

এই সময় হইতে ব্রহ্মচারী বাবার দেহের কঠিন শুভ্র বরফচ্ছদ ক্রমে ক্রমে মসৃণ হইয়া অবশেষে গৌরবর্ণত্বকে পরিণত হইল। ব্রহ্মচারীর আশ্রম অতি অল্পকালের মধ্যেই এক নিষ্কাম সংসার-

ক্ষেত্রে পরিণত হইল। গোয়ালিনী মা এখানে আশ্রম-রক্ষয়িত্রী, কৈবর্ত্ত মেয়ে ভজলেরাম আশ্রম-সেবিকা, মোহনগিরি ও বৌমভোলা হিন্দুস্থানী ভক্তদ্বয়, কৃষ্ণকায় ষাঁড় কালাচাঁন, আদরিণী বিড়ালী, কুকুর, সাপ, পিঁপড়া ও নানাবিধ পক্ষী—সকলেই শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবার পরিবারস্থ প্রাণী—সকলেরই এখানে সমান অধিকার।

আশ্রমের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে অতি মনোরম একটি বিল্ববৃক্ষ। ইহা খানিক উপরে উঠিয়াই চতুর্দ্দিকে শাখা প্রসারণ করিয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। দূর হইতে দেখিলে মনে হইত ইহা যেন একটি তরুণ অথচ বিস্তৃত বটবৃক্ষ। বৃক্ষটির পাদদেশে মৃন্ময় বৃত্তাকার অলিন্দ ইহার আরও শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিল। অনেক সময় দীর্ঘকায় লোকনাথ এই অলিন্দের উপর বিল্ববৃক্ষের শাখায় হাত রাখিয়া ভর করিয়া দাঁড়াইতেন, আর কালাচাঁন আদর পাওয়ার জন্য মন্থর গতিতে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া মাথা উচু করিয়া দিত। ব্রতচারী বাবা সস্নেহে তাহার গলকম্বলে হাত বুলাইতেন, আর সে চোখ বুজিয়া পরম আরামে রোমন্থন করিত। যাহারা দেখিত তাহারা ভাবিত—বেলতলায় দেবাদিদেব মহাদেব, পাশেই বাহন কালাচাঁন।

প্রথম প্রথম আশ্রম-গৃহের উত্তরাংশে আবদ্ধ স্থানে ব্রহ্মচারী লোকনাথ নিজ ভোগ স্বহস্তে প্রস্তুত করিতেন। আদরিণী বিড়ালী, ডাকনাম তার আদুরী, প্রসাদের অপেক্ষায় স্তিমিত নেত্রে তাঁহার পাশেই উপবিষ্ট থাকিত। বাহিরে প্রভুভক্ত কুকুরের পাল, ভিতরে আছে বলিয়া আদুরীকে কখনও হিংসা করিত না; তাহারা বরং ভাবিত,—বাহিরে থাকিতেই আমরা অভ্যস্ত, তাই বাহিরে আছি, প্রসাদ আমরাও পাব। সময় সময় একটি সাপ দুধ-কলা ভোগের অংশ পাইত। বাহিরে একটি পরিষ্কার স্থানে পাথরের পাত্রে দুধ-কলা রাখিয়া বাবা ডাকিতেন, "আয়, আয়।" অচিরে সন্নিহিত জঙ্গল হইতে একটি চক্রধর সর্প আসিয়া সেই দুধ-কলার

কিয়দংশ খাইয়া পুনঃ যথাস্থানে প্রস্থান করিত। ব্রহ্মচারী বাবা আশ্রম-গৃহের ভিতরে ও বারেন্দায় চিনি-বাতাসা ইত্যাদি সযত্নে ছড়াইয়া রাখিতেন। পিপীলিকার দল আসিয়া তাহা পরম পরিতৃপ্তির সহিত নিঃশেষিত করিয়া ফেলিত। সময়মত কাক, শালিক ইত্যাদি পক্ষীরাও আসিয়া ছিটান প্রসাদ গ্রহণে প্রতি-যোগিতা লাগাইয়া দিত।

বারদী গ্রামেই আশ্রমের পূর্ব্বদিকে এক অসহায়া বর্ষীয়সী গোয়ালিনী রমণী বাস করিতেন। তাঁহার একটি দুগ্ধদা গাভী ছিল। আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর হইতেই তিনি প্রচলিত মূল্যে[১] প্রত্যহ গোসাঁই বাবার জন্য দুধ যোগাইতেন। গোয়ালিনীর নাম কমলা।

অল্প কয়েকদিন পরের কথা। এক দিন গোসাঁইর জন্য রক্ষিত দুধের ভাণ্ড তাহারই অসাবধানতার ফলে বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়, এবং খানিকটা দুধ মাটিতে পড়িয়া যায়। গোসাঁইর দুধ পূর্ণ মাত্রায় দিতেই হইবে, অথচ ঘরে দুধও নাই। তখন কমলার ব্যবসায়গত বুদ্ধি উপস্থিত হইল। তিনি অবশিষ্ট দুধের সঙ্গে জল মিশাইয়া দৈনিক দুধের পরিমাণ ঠিক করিয়া লইলেন, এবং অন্যান্য দিনের মত দুধ লইয়া গোসাঁইর আশ্রমে আসিলেন। এ দিকে অন্তর্য্যামী লোকনাথ দুধের অবস্থা পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছেন। গোয়ালিনী মহিলাকে দেখিয়া ব্রহ্মচারী বাবা পরিহাসচ্ছলে বলিলেন, "ওগো দুধে জল পড়েনি, জলে দুধ পড়েছে।"

দুধে জল দিলে জলটা মিশানের জন্য অনেক বার পাত্র হইতে পাত্রান্তরে ঢালাঢালি করিতে হয়। ইহাতে মিশ্রিত দুধের উপর কমবেশী একটা কৃত্রিম-ফেনা জমে। আর জলে দুধ ঢালিলে অল্প আয়াসেই কাজ সিদ্ধ হয়। ব্রহ্মচারী বাবার কথা শুনিয়া গোয়ালিনী কমলার অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। তিনি কাতরভাবে গোসাঁই

১ সেই সময়ে গ্রামাঞ্চলে দুধ প্রতি সের এক আনারও কম মূল্যে বিক্রয় হইত।

বাবার পদতলে পড়িয়া আত্মকৃত অপরাধের জন্য পুনঃ পুনঃ ক্ষমা ভিক্ষা চাহিতে লাগিলেন।

বৃদ্ধা বুঝিলেন, গোসাঁই বাবা সাক্ষাৎ ঈশ্বর। এই ঘটনায় বৃদ্ধা গোয়ালিনীর জীবন-যাত্রা ঘুরিয়া গেল। তাঁহার একান্ত বাসনা হইল, তিনি যদি আশ্রমে থাকার অনুমতি পাইতেন! অচিরে তাঁহার বাসনা পূর্ণ হইল। গোসাঁই বাবার অনুমতি লাভ করিয়া তিনি আশ্রমে আসিয়া ইহার ঘরকন্নার সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিলেন।

ব্রহ্মচারী বাবার আপন মায়ের নাম কমলা দেবী, বৃদ্ধা গোয়ালিনীর নামও কমলা। যোগবলে তিনি জানিয়াছিলেন যে তাঁহার মাতা কমলাদেবী দেহত্যাগ করিয়া এক গোপ পরিবারে পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এবং তাঁহার দুধ-যোগান উপলক্ষ করিয়া বারদীতে পুত্রের সহিত মিলিত হইবেন।

গোয়ালিনী মায়ের প্রশান্ত মূর্ত্তি, স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার, ক্রিয়াকলাপ ও বুদ্ধিবৃত্তি সমাজের এই স্তরের সাধারণ নারী অপেক্ষা অনেক উচ্চাঙ্গের ছিল, শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমা যশোদার ন্যায় লোকনাথের প্রতি তাঁহার অপার বাৎসল্য ও অসীম ভক্তি ছিল। ব্রহ্মচারী বাবা দিনের শেষ বেলায় একাহার করিতেন, এবং তিনিই প্রতিদিন অপরাহ্ণে তাঁহার ভোগ প্রস্তুত করিয়া দিতেন। আশ্রমে দুধ যোগান অবধি ব্রহ্মচারী বাবা তাঁহাকে মাতৃজ্ঞানে দেখিতেন, এবং আশ্রমে আসার পর হইতে তাঁহাকে "মা" বলিয়া ডাকিতেন! গোয়ালিনী কমলা গোসাঁইবাবার মা হইলেন। চক্রীর চক্রান্তে আশ্রম সংসার পরিচালনার ছলে, দুগ্ধ-বিপর্য্যয় উপলক্ষ করিয়া কাঁকড়া-কচুয়া গ্রামের মা কমলা দেবী পুত্রের সহিত মিলিত হইলেন, এবং তাঁহার পূর্ব্বজন্মের অতৃপ্ত বাসনা বারদীর আশ্রমে তৃপ্ত হইতে লাগিল।

আশ্রমের সন্নিহিত কৈবর্ত্তপাড়ার একটি আধা-বয়সী অনাথা কৈবর্ত্তরমণী রোজই আশ্রমে আসে, এবং আশ্রমের এটুক-সেটুক

কাজ আপনা হইতেই করে, কাহারও অপেক্ষায় বা আদেশের জন্য থাকে না, মেয়েটি বড় সরল-প্রকৃতির। তাহার আপন পর ভেদ নাই। সে জানে কেবল কাজ করতে আর হাসতে। তাহার হাসিতে হাবার কোন লক্ষণ নাই, অথচ তীক্ষ্ণবুদ্ধিরও পরিচয় পাওয়া যায় না। গোসাঁই বাবা ইহাকেও তাঁহার পরিবারস্থ করিয়া লইলেন। তিনি ইহার নাম রাখিলেন "ভজলে রাম।" সহকারিণী-রূপে ভজলে-রামকে পাওয়ায় আশ্রম পরিচালনায় মায়ের খুব সুবিধা হইল। আশ্রমটি ঘরে বাহিরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, ভোগের দ্রব্যাদি রান্নার উপযোগী করিয়া দেওয়া, আশ্রমের তৈজসপত্রাদি মাজা ধোয়া ও সংরক্ষণ করাই ছিল ভজলে রামের প্রধান কাজ। গোসাঁই বাবা যখনই কোন প্রয়োজনে তাঁহাকে ডাকিতেন, তখনই সে দৌড়াইয়া তাঁহার নিকট আসিত, এবং তাহার প্রথম কাজই ছিল অকারণে এক ঝলক হাসি।

এই সময়ে দুই জন পশ্চিম দেশীয় হিন্দুস্থানী সন্ন্যাসী আসিয়া আশ্রমে অবস্থান করিতে থাকেন। ইহাদের এক জনের নাম মোহনগিরি। অপর ব্যক্তি গঞ্জিকাসেবী ছিলেন। ব্রহ্মচারী বাবাই তাঁহার দৈনিক গাঁজা যোগাইতেন। গাঁজা সেবনের সময় "বৌম ভোলানাথ" বলিয়া করতালি দিয়া ধূমায়মান কলিকা শ্রদ্ধার সহিত তিনি মাটির উপর হইতে তুলিয়া লইতেন বলিয়া বাবা তাঁহার নাম রাখেন "বৌম ভোলা"। মোহনগিরি ও বৌম ভোলা উভয়েই পরিব্রাজক ভক্ত হিসাবে আশ্রমে ছিলেন।

এই সময় বারদীর গোসাঁইর কথা চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইতে লাগিল, এবং দিনের পর দিন ভক্ত সমাগম বৃদ্ধি পাইতে থাকায় আশ্রমে সদাব্রত খোলা হইল। দৈনিক দর্শনার্থী ও কৃপাপ্রার্থী ভক্তের সংখ্যা ন্যূনকল্পে ষাট সত্তর এবং সময় সময় শতাধিক পর্য্যন্ত হইয়া যাইত। মা স্বয়ং অতি আনন্দের সহিত ও অনায়াসে ইহাদের জন্য পাক এবং স্বহস্তে পরিবেশনাদি করিয়া সকলকে
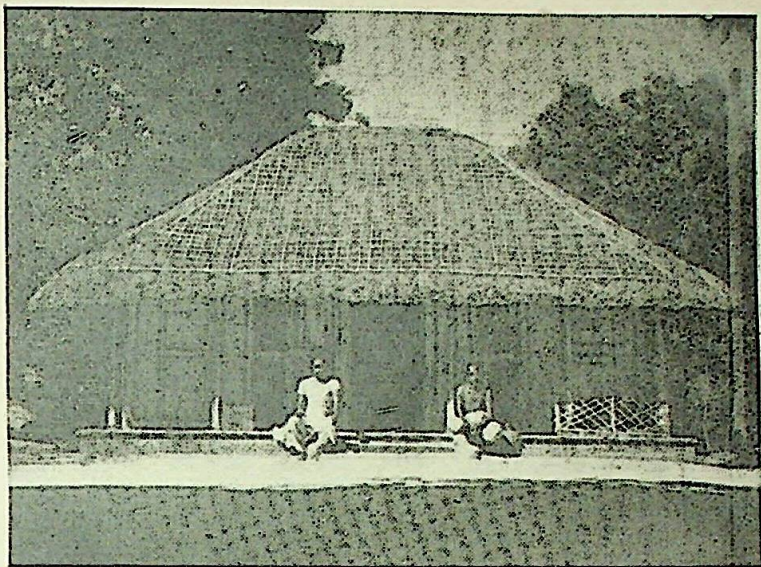
ব্রহ্মচারী বাবার বাসগৃহ, আশ্রম, বারদী (ফটো ১৯৬০)
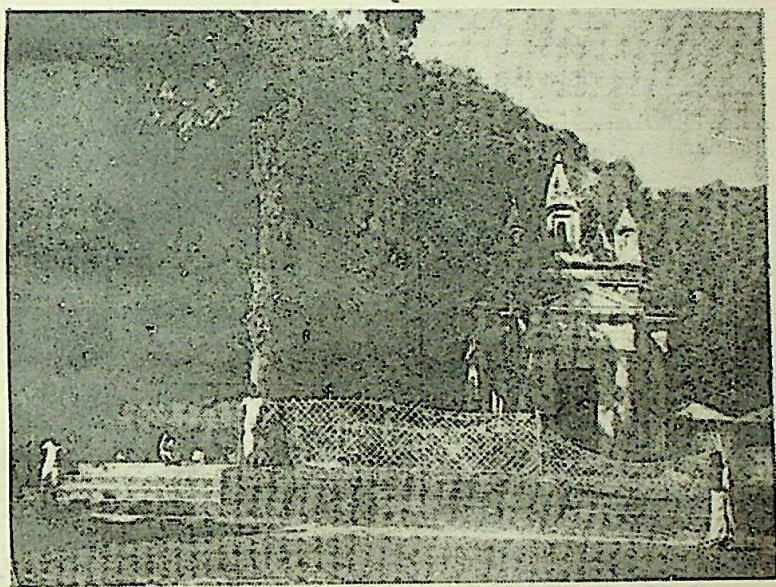
বারদী ব্রহ্মচারী বাবার সমাধি-মন্দির ও আশ্রমের একাংশ (ফটো ১৯৬০)
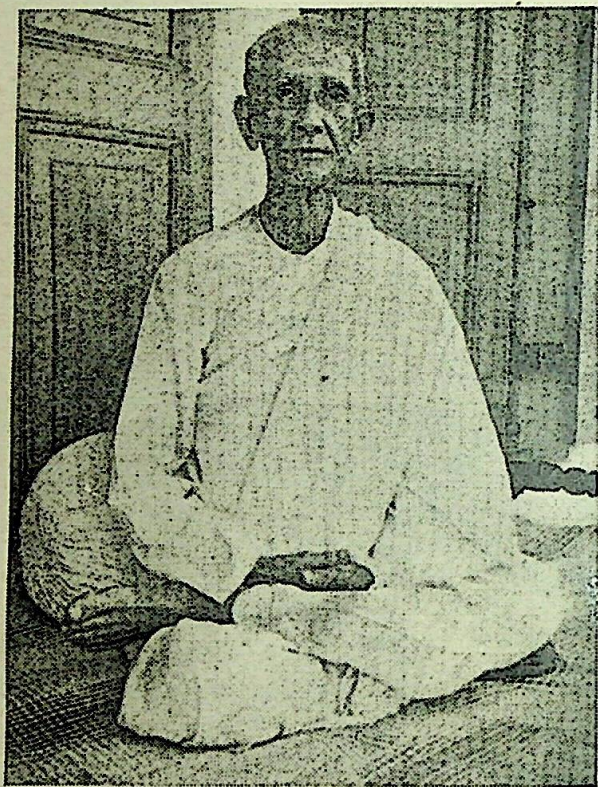
শ্রীশ্রীব্রহ্মচারী বাবার একনিষ্ঠ ভক্ত ডাঃ নিশিকান্ত বসু
(জন্ম ১লা কার্ত্তিক ১২৮৭, দেহত্যাগ ভাদ্র ১৩৭০)

ভোজন করাইতেন। তিনি এই সেবাব্রতে অত্যন্ত আনন্দ পাইতেন।

আশ্রমে আগত ভক্ত ও প্রার্থীদের মধ্যে অধিকাংশই পাড়া-গাঁয়ের লোক। সকলেই ব্রহ্মচারী বাবাকে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করিত। তিনি ভক্তদের গোসাঁই বাবা বা ব্রহ্মচারী বাবা। সমাগত লোকদের মধ্যে প্রায় সকলেই নিজ নিজ বিষয়-বাসনা লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত। গাছে ফল হইতেছে না, ক্ষেতে সুফসল জন্মিতেছে না, গাভীতে দোহন কালে লাথি মারে, সন্তান জন্মিতেছে না বা জন্মিয়াই বিনষ্ট হইতেছে, কন্যার বিবাহ-প্রস্তাব আসিতেছে না, ব্যবসায়ে তেমন লাভ হইতেছে না, মোকদ্দমায় যেন সুফল লাভ হয় ইত্যাদি, ইত্যাদি বিষয় লইয়া ইহারা তাঁহার নিকট আসিয়া নিজ নিজ প্রার্থনা জানাইত, এবং যথাশক্তি ব্রহ্মচারী বাবা নামে মানত[১] করিত। তাহারা স্ব স্ব ইষ্টলাভে কৃতার্থ হইয়া যথাসময়ে তাঁহার চরণে মানৎ করা অর্ঘ্য প্রদান করিত। দর্শনার্থীদের মধ্যে জরা-ব্যাধি-গ্রস্ত লোকের সংখ্যাও কেবল কম হইত না! আর্ত্তের কাতরতায় ব্রহ্মচারী বাবার কোমল প্রাণ গলিয়া যাইত, এবং তিনি তাহাদিগকে তাহাদের আশানুরূপ ফল-প্রদান করিতেন। এইরূপে বারদীর আশ্রমে দীর্ঘ তেইশ বৎসর কাটিয়া গেল। পূর্ব্ববঙ্গে সর্ব্বসাধারণের ঘরে ঘরে লোকনাথ নাম প্রচারিত হইল; কিন্তু শিক্ষিতসমাজে তখনও তিনি প্রায় অজ্ঞাত।[২]

১ মানত—দেবতার অনুগ্রহ লাভার্থ তাঁহাকে কোন বস্তু প্রদান করা হইবে বলিয়া মনে মনে অঙ্গীকার।

২ পশ্চিমবঙ্গে এই সময় ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সর্বধর্মসমন্বয়ে কথা প্রচার করিতেছিলেন।

শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর

বারদী আশ্রমে আগমন

কলিকাতার ব্রাহ্মসমাজের নেতা কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের সহিত ধর্ম্মাদর্শে মতানৈক্য হওয়ায় শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া ঢাকায় আগমন করেন, এবং সেখানে সাধারণ ব্রহ্মসমাজের আচার্য্যের পদ গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মমতাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার হিন্দুতীর্থ ভ্রমণ ও সাধু-সন্ন্যাসী দর্শনের আকাঙ্ক্ষা অতি প্রবল ছিল। ঢাকায় অবস্থানকালে একবার তিনি তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়া মানস-সরোবরের নিকটবর্ত্তী হিমালয়ের কোনও এক অতি উচ্চশৃঙ্গে আরোহণ করেন, এবং তথায় কতিপয় ধ্যানমগ্ন মহাপুরুষ দেখিতে পান। সেখানে দাঁড়াইয়া ভক্তিভরে তিনি তাঁহাদিগকে দর্শন করিতেছেন, এমন সময় তাঁহাদের মধ্যে এক জন নয়ন উন্মীলন করিয়া সম্মুখে গোস্বামী মহাশয়কে দণ্ডায়মান দেখিলেন, এবং বলিলেন, "তুই এখানে আসিয়াছিস্ কেন? তোর বাসস্থানের নিকটেই তো আমাদের অপেক্ষা এক জন শ্রেষ্ঠ পুরুষ আছেন।"

আধ্যাত্মিক জগতের সংযোগ এক বিচিত্র ব্যাপার! সুদূর হিমালয়ের কোন্ শিখরে বসিয়া এই মহাপুরুষ খবর রাখেন তাঁহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ লোকনাথ কোথায় আছেন। হয়ত বা একই সঙ্গে তিনি লোকনাথকেও গোস্বামী মহাশয়ের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। গোস্বামী মহাশয় মহাপুরুষের এই কথা শুনিয়া বিস্মিত ও আশান্বিত হইলেন। যথাসময়ে তিনি ঢাকায় ফিরিয়া আসিলেন।

বাংলা ১২৯৪ সালের কথা। একদিন গোস্বামী মহাশয় স্বীয় আবাসস্থলে[১] ধ্যানস্থ আছেন, এমন সময় জানিতে পারিলেন—

[১] তখন তিনি ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের বাড়ীতে বাস করিতেন।

বারদী গ্রামে এক মহাপুরুষ আছেন। তখনই মানস-সরোবরের মহাপুরুষ-বাক্য তাঁহার মনে পড়িল। ধ্যান ভঙ্গের পর তিনি স্থির করিলেন যে যথাসম্ভব সত্বর তিনি বারদী যাইবেন।

প্রায় একই সময়ে বারদীর আশ্রমেও ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। গোস্বামী মহাশয়ের জনৈক ভক্ত বারদীর আশ্রমে ব্রহ্মচারী বাবার দর্শন লাভের জন্য উপস্থিত হইয়াছেন। লোকনাথ তাঁহার মুখে গোস্বামী মহাশয়ের সংবাদ শুনিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "গোসাঁই একবার এসে আমাকে দর্শন দিবেন না ?"

"তারে তারে বাঁধা প্রাণ !"[১]

ইহার কিছু কাল পর এক দিন পূর্ব্বাহ্নে বারদীর আশ্রমে ভক্ত কামিনীকুমার নাগ ও তাঁহার আত্মীয় হরিশ্চন্দ্র রায়, এবং জানকীনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের[২] জ্যেষ্ঠতাত কানাই কবিরাজ মহাশয় ব্রহ্মচারী বাবার উপদেশবাণী শ্রবণ করিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ ব্রহ্মচারী বাবা প্রসঙ্গ থামাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "কামিনী, বিজয় আসছেরে।"

কামিনী নাগ মহাশয়ের সহিত গোস্বামী মহাশয়ের পূর্ব্ব হইতেই বিশেষ পরিচয় ছিল। গোস্বামী মহাশয়কে অভ্যর্থনা করিয়া আনিতে হইবে, সুতরাং নাগ মহাশয় ব্রহ্মচারী বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি কোন্ পথে আসিতেছেন ?"

উত্তর হইল, "নৌকাযোগে ব্রহ্মপুত্রনদ-পথে।"

ব্রহ্মপুত্রনদ-পথে নৌকা ছাগলবাঘিনীতে পড়িবে। তখন শীতকাল। ছাগলবাঘিনীতে জল অল্প, তাহাও আবার ভাটার সময়। আশ্রমের পশ্চিম দিকে মুচি-পাড়ার নিকট নৌকা অচল হওয়ার সম্ভাবনা ভাবিয়া কামিনী বাবু লোকজন সহ তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং দেখিলেন অদূরে চরা-ভূমিতে একখানি নৌকা

১ নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ।
২ পরবর্ত্তী কালে আশ্রমের সেবায়েত।

অচল অবস্থায় রহিয়াছে। তিনি প্রশ্ন করিতেই গোস্বামী মহাশয় ছৈ-এর ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া কামিনী বাবুকে দেখিতে পাইলেন। কামিনী বাবু প্রস্তুত হইয়াই গিয়াছেন,—লোকজনের চেষ্টায় নৌকা জল-পথে নামিল, এবং অল্প কতটুক পথ আসিয়া আশ্রমে যাওয়ার সুবিধামত ঘাটে থামিল। গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার দুই জন ভক্তও আসিয়াছিল। তিনি নৌকা হইতে তীরে নামিলেন, কামিনীবাবু পথ দেখাইয়া চলিলেন। আশ্রমে উপস্থিত হইয়াই হঠাৎ গোস্বামী মহাশয়ের অঙ্গে শিহরণ আরম্ভ হইল। লোকনাথ আসনে থাকিয়া এক জন ধর্ম্মপিপাসুর আগমন হইয়াছে দেখিয়া অপার আনন্দ অনুভব করিলেন। গোস্বামী মহাশয় গৃহের বারান্দায় উঠিতেই তাঁহার দেহ প্রায় বিবশ হইয়া আসিল, এবং তিনি আত্মগত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "দেবদেবী, দেবদেবী, ঘরের সমস্ত জায়গায় দেবদেবী, গায়ের কাপড়েও।"

সঙ্গী কামিনী বাবু প্রভৃতি কেহই ইহার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহাদের বোধ হইল গোস্বামী মহাশয়কে দর্শনমাত্র লোকনাথের নয়নযুগল হইতে হঠাৎ এক জ্যোতিঃ বাহির হইয়া তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিল। ভাবাবেশে গোস্বামী মহাশয়ের বিশাল বপু টলিতেছে দেখিয়া, ব্রহ্মচারী বাবা আসন হইতে উঠিয়া আসিয়া তাঁহাকে নিজ বক্ষে ধারণ করিলেন, এবং উপবিষ্ট হইলেন। লোকনাথের তপঃক্লিষ্ট কৃশতনুর সংস্পর্শে গোস্বামী মহাশয়ের দেহে কম্পন হইতে লাগিল। গোস্বামী মহাশয়ের তখনকার অব্যক্ত ভাবের অতি সামান্য তাঁহার "হু হু" ধ্বনিতে প্রকাশ পাইতে লাগিল। ক্রমবর্দ্ধমান এই "হু হু" ধ্বনিতে আশ্রম-ঘরখানিসহ চতুর্দ্দিকের প্রকৃতি কাঁপিতেছে—এরূপ বোধ হইল। এই উদাত্ত ধ্বনি শ্রবণ করিয়া চতুর্দ্দিক হইতে লোক আসিয়া আশ্রমের প্রাঙ্গণ ভরিয়া ফেলিল।

কি মধুর এই মহা-মিলন!

কাঁহার বক্ষে কে আসিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িলেন ?

গোস্বামী মহাশয় ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং ব্রহ্মচারী বাবাকে সর্ব্বপ্রথম অনুযোগ দিয়া কহিলেন, "এত দিন আমার প্রতি দয়া হয় নাই কেন ?"

"তুই ও তো পাষাণ !" লোকনাথ উত্তর করিলেন।

অনুযোগের প্রকৃত স্নেহপূর্ণ উত্তর লাভ করিয়া গোস্বামী মহাশয় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। মানস সরোবরে পর্য্যটন কালে সন্ন্যাসী যে তাঁহাকে এক শ্রেষ্ঠ পুরুষের কথা বলিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার মনে পড়িল, এবং ব্রহ্মচারী লোকনাথই যে সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষ, এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিত হইলেন।

এই সময়ে একটি বালক একটি সুপক্ক বেল লইয়া আশ্রমে উপস্থিত হইল। লোকনাথ কানাই কবিরাজ মহাশয়কে বলিলেন, "কানাই, ঐ যে ছেলেটি বেল নিয়ে এসেছে, তা নিয়ে আয় ত, আমি খাব।"

ব্রহ্মচারী বাবার সঙ্গে কানাই কবিরাজের ঠাট্টা-মস্করা চলিত। ব্রহ্মচারী বেল খাইবেন শুনিয়া তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ, আপনি দিনের শেষ বেলায় একাহার করেন, আর আজ কিনা আপনার এই সকাল বেলাই ক্ষুধা পেয়েছে !"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "বাস্তবিকই ক্ষুধা পেয়েছে।"

কানাই কবিরাজ আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। বেলটি আনিয়া ধুইয়া তিনি লোকনাথের হাতে দিলেন। তিনি ইহা ভাঙ্গিয়া একটুখানি নিজের জিহ্বাগ্রে স্পর্শ করাইলেন, এবং কতকাংশ স্বহস্তে গোস্বামী মহাশয়কে খাওয়াইয়া দিলেন। অবশিষ্ট যাহা রহিল, তাহা ভক্তগণ প্রসাদ পাইল।

মা স্নান করিতে গিয়াছিলেন। স্নানান্তে আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া, তিনি মধুর কণ্ঠে লোকনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটি কে, বাবা ?"

"ঘরের ছেলে, মা," তিনি উত্তর করিলেন।

উত্তর শুনিয়া মা অপত্যস্নেহে গোস্বামী মহাশয়কে অভ্যর্থনা করিলেন।

গোস্বামী মহাশয়ের আগমনবার্ত্তা বারদী গ্রামে অত্যল্প কালের মধ্যেই ছড়াইয়া পড়িল। তাঁহাকে দেখার জন্য স্ত্রীপুরুষ সকলেই উৎসুক। আহারাদির পর, অপরাহ্ণে লোকনাথের উপদেশমত তিনি কামিনীবাবুর সহিত তাঁহার বাড়ীতে চলিলেন। পথিমধ্যে আলাপ-প্রসঙ্গে কামিনীবাবু গোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্রহ্মচারীতে কি দেখিতে পাইলেন?"

প্রশ্নটির উত্তরে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে গোস্বামী মহাশয় বলিতে লাগিলেন, "আমি বহু পাহাড়-পর্ব্বত পরিভ্রমণ, এবং বহু তীর্থস্থান ও সাধু-সন্ন্যাসীর আশ্রম দর্শন করেছি। কোথাও এক-আনা, কোথাও দু-আনা, কোথাও বা ইহার কিছু বেশী দেখেছি। কোন কোন আশ্রমে এমনও ঘটেছে, যত ক্ষণ আশ্রমে অবস্থান করেছি, তত ক্ষণই সাধুর প্রভাব আমাতে বিদ্যমান রয়েছে। আশ্রম থেকে বাইরে আসার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত চলে গেছে। কিন্তু এখানের কথা যা শুনে এসেছিলাম, তার চেয়ে কল্পনার অতীত বেশী দর্শন ও লাভ করলাম। ব্রহ্মচারীর সর্ব্বাঙ্গ দেবদেবীময়, গাত্রবস্ত্র দেবদেবীময়, বাসগৃহখানা পর্য্যন্ত দেবদেবীময়। তিনি নিবৃত্ত্যাত্মক মহাপুরুষ। ইচ্ছা করলে যে কোন মুহূর্ত্তে তিনি দেহ রক্ষা করতে পারেন, অথবা যত দিন ইচ্ছা দেহ ধারণ করতে পারেন। তিনি আমাকে এক মুহূর্ত্তে যে কৃপা দান করেছেন, তাতেই আমি ধর্ম্মজীবনে উন্নতি লাভ করতে পারব—ইহা আমার ধ্রুব বিশ্বাস। বারদী আমার ধর্ম্মজীবনের জন্মস্থান। তোমরা আমার ভাই।"

গাস্বামী মহাশয় এ যাত্রা আশ্রমে চারি দিন অবস্থান করিলেন। কথাপ্রসঙ্গে এক দিন বাবা লোকনাথ গোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা

করিলেন, "হা-রে বিজয়, চন্দ্রনাথ পাহাড়ে দাবানলের কথা তোর মনে পড়ে ?"

এই প্রশ্নে পলকমধ্যে গোস্বামী মহাশয়ের দাবানল-স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। তিনি মানস-পটে দেখিলেন—এই সেই মহাপুরুষ, যিনি তাঁহাকে সেই ভীষণ অগ্নিব্যূহ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

ঢাকায় প্রত্যাবর্ত্তন-কালে ব্রহ্মচারী বাবা তাঁহার এক জোড়া পাদুকা গোস্বামী মহাশয়কে প্রদান করিলেন; পাদুকা প্রাপ্তে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন।

শ্রীশ্রীলোকনাথ নাম প্রচার

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, দীর্ঘ বিশ বৎসরেরও অধিক কাল লোকনাথ প্রধানতঃ পূর্ব্ববঙ্গে গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণের "গোঁসাইবাবা" রূপে প্রায় সীমাবদ্ধ ছিলেন। লোকনাথ ব্রহ্মচারী ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের প্রথম সংযোগের পর, এই বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়া "বারদীর ব্রহ্মচারী" নামের বন্যায় পূর্ব্ববঙ্গের শিক্ষিত সমাজ ও ভদ্রমহল প্লাবিত হইয়া গেল। ঢাকায় ফিরিয়া বারদীর ব্রহ্মচারীর জয়ডঙ্কা সাধক বিজয়কৃষ্ণ মনের আনন্দে ইচ্ছামত বাজাইতে লাগিলেন। গোস্বামী মহাশয় সুপণ্ডিত ও সুপ্রচারক। শিক্ষিত সমাজের সর্ব্বত্র তিনি সুপরিচিত। তিনি মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিতে লাগিলেন, বারদীর ব্রহ্মচারীর ন্যায় মহাপুরুষ অতি অল্পই দৃষ্ট হন। তিনি মুক্তপুরুষ। তাঁহার নয়ন পলকহীন, তিনি নিদ্রাজয়ী। সন্ধ্যার পরই তাহার আশ্রম-ঘরের দরজা বন্ধ হইয়া যায়, এবং তখন তিনি স্থূল দেহখানা স্বীয় আসনে রাখিয়া, সূক্ষ্মদেহে জগতের অপরাপর মহাপুরুষদের সংসর্গে কাল অতিবাহিত করেন[১]।

গোস্বামী মহাশয়ের মুখে লোকনাথ বাবার মাহাত্ম্যের কথা শুনিয়া পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ,

১ মানস সরোবরে সাধুর মুখে গোস্বামী মহাশয়ের "শ্রেষ্ঠ পুরুষ"-এর সংবাদ শ্রবণ দ্রষ্টব্য।

ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, কুমিল্লা প্রভৃতি স্থান হইতে দলে দলে শিক্ষিত ভক্তগণ "বারদীর ব্রহ্মচারীকে" দর্শন করার মানসে বারদী আসিতে লাগিল এবং সিদ্ধির চরম আদর্শ প্রত্যক্ষ করিয়া কৃতার্থ হইল। আর দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত রোগীরা আসিতে লাগিল ব্যাধির কবল হইতে মুক্তিলাভের আশায়। সকলেই নিজ নিজ আকাঙ্ক্ষানুযায়ী ফল লাভ করিয়া আপন আপন বাসস্থলে ফিরিয়া গিয়া লোকনাথের নামকীর্ত্তন করিতে লাগিল। এইরূপে ব্যাপক নাম-প্রচারের ফলে, বারদীর আশ্রম তীর্থস্থানে পরিণত হইল।

শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের ঢাকা গেণ্ডারিয়ায় আশ্রম প্রতিষ্ঠা

গোস্বামী মহাশয়ের হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অনুরাগের ফলে ঢাকার ব্রাহ্মসমাজে এক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইল। ব্রাহ্মদের মতে তিনি এখন পৌত্তলিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেন। ব্রাহ্মসমাজ হইতে তাঁহাকে মাসিক পঞ্চাশ টাকা করিয়া বৃত্তি দেওয়া হইত; তাহা বন্ধ হইয়া গেল। সুতরাং অচিরে তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজের বাড়ীও ছাড়িয়া দিতে হইবে—তিনি ইহা ঠিক করিলেন। গোস্বামী মহাশয় গৃহী, সুতরাং এই পরিবর্ত্তনে তাঁহার জীবন-যাত্রার অনেক অসুবিধা উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু তিনি ভাবিলেন—গুরু যাহা করেন, মঙ্গলের জন্য।

ঢাকার ব্রাহ্ম-সমাজগৃহ হইতে বুড়ীগঙ্গা নদী পাঁচ মিনিটের পথ। একদিন গোস্বামী মহাশয় গামছা-হাতে বুড়ীগঙ্গায় স্নান করিতে চলিয়াছেন, এমন সময় হঠাৎ তিনি লোকনাথ ব্রহ্মচারীর

মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

ডাক অন্তরে অনুভব করিলেন। তখনই তাঁহার ভাবাবেশ হইল। তাঁহার চতুর্দ্দিকে সবই আছে, অথচ কিছুই নাই। তাঁহার ষোল-আনা অনুরাগ লোকনাথের ডাকে তাঁহার দেহখানাকে বুড়ীগঙ্গার ঘাট হইতে পূর্ব্বদিকে কলচালিত পুতুলের ন্যায় চালাইয়া লইয়া যাইতে লাগিল। কি সেই গতিবেগ! সেই গামছা-হাতেই প্রায় সন্ধ্যার সময় তিনি বারদীর আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কি আকর্ষণ! কি অনুরাগ! এ যেন স্বপ্ন-ভ্রমণ অথচ সবই বাস্তব!

তিনি বুড়ীগঙ্গায় অন্যান্য দিনের ন্যায় স্নানে গিয়াছেন, অথচ ফিরিতেছেন না শুনিয়া সকলেই অত্যন্ত চিন্তিত হইল। বুড়ীগঙ্গায় স্নানঘাটগুলিতে তাঁহার অনুসন্ধান করা হইল, কিন্তু বৃথা। তখন অনুমান করা হইল—তিনি হয়তো বারদীর আশ্রমে চলিয়া গিয়াছেন। ঢাকা হইতে তাঁহার ভক্তেরা বিভিন্ন স্থলপথে তিনটি দলে তাঁহার খোঁজে বারদী অভিমুখে রওনা হইল।

পরদিন অন্তর্য্যামী লোকনাথ নিজেই গোস্বামী মহাশয়কে বলিলেন, "ব্রাহ্মসমাজ হইতে তারা তোকে মাসিক পঞ্চাশ টাকা করে দিচ্ছিল। এর পরিবর্ত্তে মাসে দু-শ টাকা করে পেলে, পরিবার পোষণ করতে পারবি তো?"

গোস্বামী মহাশয় উত্তর করিলেন, "আমার পঞ্চাশ টাকায়ই যথেষ্ট; দু-শ হলে তো কথাই নেই।"

ব্রহ্মচারী। তুই ঢাকা ফিরে গিয়ে ব্রাহ্মসমাজের বাড়ী ছেড়ে দিয়ে গেণ্ডারিয়ায় ছনের (খড়ের) কুড়ে করে বাস কর। সংসার খরচের টাকার জন্য তোর ভাবতে হবে না।'

গোস্বামী মহাশয় ঢাকায় ফিরিয়া লোকনাথ বাবার নির্দ্দেশ মত ব্রাহ্মসমাজের বাড়ী ছাড়িয়া দিলেন, এবং ঢাকা গেণ্ডারিয়াতে নিজে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। আশ্রম করা অবধি কখনও তাঁহার কোন আর্থিক অভাব হয় নাই।

যখনই তাঁহার যাহা দরকার হইত, তাহা আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হইত।

কলিকাতায় প্রথম ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ কালে গোস্বামী মহাশয় স্বীয় উপবীত ত্যাগ করেন। পরে গয়াধামে গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করার পর, তিনি পুনঃ উপবীত গ্রহণ করেন, শেষে আবার ইহা পরিত্যাগ করেন। উপবীত উপলক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মচারী বাবা এক দিন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "হা রে বিজয়, পৈতা ফেলেছিস্ কেন? এ যে ব্রাহ্মণের চিহ্ন। জোর করে কি কোন কাজ হয় রে?"[১]

আর এক বার উভয়ের মধ্যে কথা-বার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময় স্নেহবিমিশ্রিত প্রীতির কণ্ঠে লোকনাথ বাবা কোন এক প্রসঙ্গে গোস্বামী মহাশয়কে বলিলেন, "অরে, আমাদের কুলের ধর্ম্ম এরূপ নয়।"

বহু কাল পূর্ব্বে গোস্বামী মহাশয়ের খুল্ল-পিতামহ সংসার-বিরাগী হইয়া নিরুদ্দেশ ছিলেন। সংসারত্যাগী প্রাচীন সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যে সেই খুল্ল-পিতামহের দর্শনলাভ করার আশা পোষণ করা গোস্বামী মহাশয়ের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। যতই তিনি ব্রহ্মচারী বাবার সঙ্গলাভ করিতেছেন, ততই তাঁহার মনে খুল্ল-পিতামহের কথা প্রবল হইয়া উঠিতেছে। আজ ব্রহ্মচারী বাবার নিজমুখে "আমাদের কুলের ধর্ম্ম" কথাটি শুনিয়া তিনি হয়তো অনুপ্রাণিত হইয়া ভাবিলেন যে ব্রহ্মচারী বাবা নিজকে গোস্বামী মহাশয়ের সহিত এককুলসম্ভূত বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। সুতরাং ব্রহ্মচারী বাবাকেই সম্ভবতঃ তিনি তাঁহার সেই নিরুদ্দেশ খুল্ল-পিতামহ বলিয়া ধরিয়া লইলেন, এবং

১ গুরু ভগবান গাঙ্গুলী মহাশয়ের দেহরক্ষার পর কালক্রমে ব্রহ্মচারী বাবার ব্যবহার-জনিত ক্ষয়প্রাপ্ত উপবীত পুনঃ গ্রহণের অবস্থা বা সুযোগ, তাঁহার বারদী আগমনের পুর্ব্বে আর উপস্থিত হয় নাই। বারদীতে আশ্রম প্রতিষ্ঠাকালে তিনি পুনঃ উপবীত গ্রহণ করেন।

অন্তর্য্যামী লোকনাথও অতঃপর তাঁহার সেই ভাব রক্ষা করিয়াই চলিতে লাগিলেন।

গোস্বামী মহাশয় একাধিক বার তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও শাশুড়ী মাতাকে লইয়া বারদীর আশ্রমে গিয়াছেন। ব্রহ্মচারী বাবা তাঁহার পত্নীকে "নাত-বৌ" বলিয়া সম্বোধন করিতেন, এবং সময় সময় তাঁহার সহিত ঠাট্টা-তামাসাও করিতেন।

এখানে "আমাদের কুলের ধর্ম্ম" কথাটির একটু আলোচনা করা দরকার।

"আমাদের কুলের ধর্ম্ম" কথাটি গৃহী মহাপুরুষ গোস্বামী মহাশয় যদি সাধারণ অর্থে ধরিয়া লইয়া, এবং ব্রহ্মচারী লোকনাথকে অদ্বৈতাচার্য্যের বংশধর বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে ব্রহ্মচারী বাবার মুখনিঃসৃত "আমাদের কুলের ধর্ম্ম" বর্ণনায়, গোস্বামী মহাশয়ের পক্ষে তাঁহাকে আপন নিরুদ্দিষ্ট পরিব্রাজক খুল্লপিতামহ বলিয়া গ্রহণ করা অস্বাভাবিক নহে।

অন্য দিকে, মহাপুরুষদের উক্তির ভাব উদ্ধার করা অন্যের পক্ষে সব সময় সহজসাধ্য নয়। "আমাদের কুলের ধর্ম্ম" কথাটি বাবা লোকনাথ কোন্ অর্থে ধরিয়া গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে আলাপের সময় ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা তিনি জানেন। যদি "আমাদের" বলিতে "মহাপুরুষদের বা সন্ন্যাসীদের", "কুলের" অর্থাৎ "সম্প্রদায়ের", এবং "ধর্ম্ম" অর্থাৎ "গুণ, স্বভাব, আচার, রীতি-নীতি" ইত্যাদি ধরা যায়, তবে আর সাধারণ সমাজ-গত অর্থ আসে না। তখন "আমাদের কুলের ধর্ম্ম" বলিতে সাধারণ সমাজমুক্ত সাধু-সন্ন্যাসী বা মহাপুরুষদের সম্প্রদায়গত গুণ-স্বভাব ইত্যাদি মনে হয়। লোকনাথ বাবা অতি শৈশবে গৃহত্যাগ বা সমাজ বন্ধন ছিন্ন করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পক্ষে পুনঃ লৌকিক সমাজগণ্ডিতে নিজকে আবদ্ধ করিয়া কথা-বার্তা বা আলাপ-আলোচনা করা কত দূর সম্ভবপর তাহাও ভাবিয়া দেখা

উচিত। বাবা লোকনাথ ও গোস্বামী মহাশয় উভয়েই মহাপুরুষ। সুতরাং মহাপুরুষে মহাপুরুষে আলাপে "আমাদের" শব্দটির অর্থ "মহাপুরুষদের" এইরূপ ধরাও চলে।

ব্রহ্মচারী বাবার এই উক্তিটির অল্প কতক কাল পরের কথা। লোকনাথ বাবার শিষ্য ব্রহ্মানন্দ ভারতী মহাশয় [১] স্বয়ং কাঁকড়া-কচুয়া গ্রামে যাইয়া সেখানের ঘোষাল উপাধিধারীদের ভূ-সম্পত্তির উল্লেখ আছে এমন একটি কবালা দেখিয়াছিলেন। কচুয়া গ্রামের "মইজলা" বিলটির উল্লেখ করায় বাবা লোকনাথ ব্রহ্মানন্দ ভারতী মহাশয়ের নিকট স্বীকার করিয়াছিলেন যে এই বিলের কথা তাঁহার বেশ মনে পড়িতেছে।

এস্থলে একটি প্রশ্ন হইতে পারে—ব্রহ্মচারী বাবা অন্তর্যামী। তিনি জানিতেন যে হয়ত গোস্বামী মহাশয় "আমাদের কুলের ধর্ম্ম" কথাটির সাধারণ লৌকিক সমাজগত অর্থে, তাঁহার সঙ্গে লৌকিক বা সাংসারিক সম্বন্ধের কথাই ধরিয়া লইয়াছেন। এরূপ স্থলে তিনি গোস্বামী মহাশয়ের ভুল ভাঙ্গিয়া দিলেন না কেন?

ইহার উত্তর দেওয়া কঠিন ব্যাপার। এইমাত্র অনুমান করা যাইতে পারে যে ব্রহ্মচারী বাবা গুণগ্রাহী ও ভক্তমাত্রেরই আপন জন। তাঁহাকে যিনি যে ভাবে দেখেন বা ভজনা করেন, তিনি তাঁহার নিকট ঠিক সেই ভাবেই আটক আছেন। আশ্রম-মাতার তিনি পুত্র, ভজলেরামের তিনি গোসাঁই, ভক্তের তিনি বাবা লোক-নাথ, এবং অন্য সাধারণের তিনি বারদীর ব্রহ্মচারী। এই অবস্থায় গোস্বামী মহাশয়ের ভুল এরূপ বলা চলে না। বাবা লোকনাথ বা গোস্বামী মহাশয়ের এ বিষয়ে নিজস্ব কোন স্পষ্ট উক্তি বিদ্যমান আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। যত কিছু ব্যাখ্যা বা আলোচনা "আমাদের কুলের ধর্ম্ম" এই কথাটির উপর।

১ "ব্রহ্মচারী বাবার জন্মস্থান দর্শন"—দ্রষ্টব্য।

মহাপুরুষ-শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের ব্রহ্মচারী লোকনাথ বাবার সহিত লৌকিক বংশগত সম্পর্ক থাকুক বা না থাকুক ইহাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। গোস্বামী মহাশয় স্বীয় নামেই সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুবিদিত। উপরন্তু লোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবার সহিত তাঁহার আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ বড়ই ঘনিষ্ঠ ছিল। তিনিই একমাত্র উল্লেখযোগ্য ধর্ম্মপিপাসু "ভবরোগী" যাঁহাকে বারদীয় আশ্রমে প্রথম দর্শনমাত্র ভক্ত-প্রাণ লোকনাথ স্বীয় আসন হইতে উঠিয়া অগ্রসর হইয়া সস্নেহে আপন বক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন।

গোস্বামী মহাশয়ের সম্বন্ধে আশ্রম-মাতার প্রশ্নের উত্তরে পুত্র লোকনাথ গোস্বামী মহাশয়কে "ঘরের ছেলে" বলিয়া পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন। পরিচয় পাইয়া মা-ও তাঁহাকে অপত্যস্নেহে গ্রহণ করিলেন। এ যেন এক বৃন্তে দুইটি ফুল।

গোস্বামী মহাশয়ের "খুল্লপিতামহ" প্রসঙ্গে ব্রহ্মচারী লোকনাথের সহিত লৌকিক সম্বন্ধ অপেক্ষা আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ অধিকতর নিবিড়—এই যুক্তিও কম মূল্যবান নয়, বরং অধিকতর বলিয়াই মনে হয়।

ভক্ত-প্রসঙ্গ

শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাতের সময় বারদীতে লোকনাথ বাবার তেইশ বৎসর অতীত হইয়া গেল[১]। গুরু ভগবানের এখন পর্যন্ত কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না।

কাশীধামে গুরু ভগবান ও মহাপুরুষ হিতলাল মিশ্রের সাক্ষাৎ, চীনদেশে লোকনাথের প্রতি হিতলালের উপদেশ, "নিম্নভূমিতে তোমার কাজ রহিয়াছে"—অর্থাৎ নিম্নভূমিতে তোমার গুরু ভগবান গাঙ্গুলী দেহ-ধারণ করিয়াছেন, দীক্ষা-প্রদানান্তে শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের গুরু পরমহংসজি কর্ত্তৃক তাঁহাকে আদেশ, "দেশে যাইয়া গৃহী হইয়া প্রচার-কার্য্য চালাও"। মানস সরোবরে, সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক গোস্বামী মহাশয়ের নিকট "শ্রেষ্ঠ পুরুষের" উল্লেখ, ঢাকায় ধ্যানযোগে গোস্বামী মহাশয়ের লোকনাথ ব্রহ্মচারী দর্শন লাভ এবং সর্ব্বশেষ ব্রহ্মচারী বাবার গোস্বামী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাতের অভিলাষ প্রকাশ,—সবই যেন প্রধানতঃ একমুখী হইয়া চলিয়াছে—গুরুকে তুলিয়া লওয়া। গোস্বামী মহাশয়ের লোকনাথ মাহাত্ম্য প্রচারের ফলে, দিনের পর দিন বারদীর আশ্রমে শিক্ষিত-ভক্তের সংখ্যা কেবল বাড়িয়াই চলিয়াছে--কত ভক্ত আসিতেছেন, কত যাইতেছেন। কিন্তু গুরু কোথায়?

শিক্ষিত ভক্তদের মধ্যে মাত্র দুই জনকে বাবা লোকনাথ দীক্ষাদান অন্তে নূতন নাম দিয়াছেন—ব্রহ্মানন্দ ভারতী ও সুরথ ব্রহ্মচারী। অপর কোনও শিষ্য গুরু-প্রদত্ত নাম প্রাপ্ত হন নাই। দুই জনকে কেন তিনি নূতন নাম দিলেন, তাহা বলা কঠিন।

লোকনাথ বাবার শিষ্য ও ভক্তদের মধ্যে এখানে বিশিষ্ট কয়েক-জনের সামান্য পরিচয় দেওয়া হইল।

১ বারদীতে তাঁহার মোট ছাব্বিশ বৎসর অধিষ্ঠান।

শ্রী তারাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

ব্রহ্মানন্দ ভারতী

তারাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় ঢাকা-বিক্রমপুরের অন্তর্গত পশ্চিমপাড়া গ্রামের কুলীন বংশজাত সন্তান। শিশুকাল হইতেই তাঁহার ঠাকুর দেবতার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। যৌবনে তিনি ওকালতী পাশ করিয়া নারায়ণগঞ্জ মুন্সেফ্ কোর্টে আইন-ব্যবসায় আরম্ভ করেন। অল্প কালের মধ্যেই ব্যবসায়ে তাঁহার বেশ সুনাম হয়। তিনি শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন ও সাত্ত্বিকভাবে জীবন-যাপন করিতেন। কি জানি কেন তাঁহার বিষয়-বাসনা ভাল লাগিল না। ওকালতী ব্যবসায় ছাড়িয়া দিয়া তিনি সাধন-ভজনে মনোনিবেশ করিলেন। লোকমুখে বারদীর ব্রহ্মচারীর মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া একবার তিনি বারদীর আশ্রমে তাঁহাকে দর্শন করিতে গেলেন।

বহু ভক্ত আশ্রমে উপস্থিত। তারাকান্ত তাঁহাদের সঙ্গে মিশিয়া উপবেশন করিলেন এবং নীরবে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অপর সকলের সহিত কার্য্যান্তে ব্রহ্মচারী বাবা তারাকান্তের দিকে চাহিয়া তাঁহাকে আস্তে আস্তে ডাকিলেন। তিনি নিকটে গেলে, ব্রহ্মচারী বাবা তাঁহাকে কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি জন্য এসেছ ?"

তারাকান্ত সাহসের সহিত উত্তর করিলেন, "ভক্ত রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন, 'স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা',—সংসারে এসে ঠেকেছি। আপনার ফাঁদে আপনি পড়েছি। আমাকে সঙ্কেত বলে দিন, যাতে আমি মায়াপাশ কাটাতে পারি।"

তারাকান্তের 'ফাঁদ' কথাটির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া বাবা বলিলেন, "গুটিপোকা আপন চতুর্দ্দিকস্থ রেশম গুটি কেটে সময় কালে আপনি বাহির হয়, অন্যের সাহায্যের প্রতীক্ষা করে না।"

তারাকান্ত বুঝিলেন,—ব্রহ্মচারী তাঁহাকে ধরা দিবেন না; তিনি তাঁহাকে সময়ের অপেক্ষা করিতে বলিতেছেন। ব্রহ্মচারীর এই বাক্যে তাঁহার মনস্তুষ্টি হইল না; কারণ তিনি অনেক আশা করিয়া তাঁহার নিকট আসিয়াছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সদর্পে আশ্রম ত্যাগ করিয়া চলিলেন, কিয়দ্দূর পথ গেলেনও। তখন ব্রহ্মচারী বাবা লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া আনাইলেন, এবং স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "কয়েক দিন এখানে অবস্থান কর, পরে বিশেষ আলাপ হবে।"

পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রথম পর্য্যায় অতি সহজেই সমাপ্ত হইল।

পরদিন উভয়ের মধ্যে মায়াবাদ সম্বন্ধে অনেক তর্ক-বিতর্ক চলিল। উকিল তারাকান্ত জ্ঞানমার্গাবলম্বী, শাস্ত্রবিদ্, সুপণ্ডিত; সুতরাং তিনি শাস্ত্রের নানা প্রকার জেরাদ্বারা ব্রহ্মচারী লোকনাথকে আট্‌কাইতে চেষ্টা করিলেন। বিষয়টি তারাকান্তের নিকট বিশেষ জটিল। তিনি লোকনাথকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। বেশ উত্তপ্ত আলাপ-আলোচনা চলিতেছে, এমন সময় তিনি ব্রহ্মচারী বাবার মুখের দিকে তাকাইয়া হঠাৎ নির্ব্বাক হইয়া গেলেন। তিনি দেখিলেন—তাঁহার চক্ষু স্থির এবং তারকাদ্বয় নাসিকার নিকটবর্ত্তী। তিনি যেন কোন্ এক অজানা দেশে চলিয়া গিয়াছেন, অথচ দেহযষ্টি আসনস্থ, নিশ্চল। তারাকান্ত জীবনে অন্য কোনও লোকের এরূপ ভাব আর কখনও দেখেন নাই। মানুষের যে এই অবস্থা হইতে পারে, ইহা তাঁহার ধারণারও অতীত। ব্রহ্মচারী বাবার এই সমাধিভাব তারাকান্তের হৃদয়ে রেখাপাত করিল। তাঁহার বিশ্বাস হইল, তিনি বিফল মনোরথ হইবেন না।

সমাধি ভাঙ্গিল। ব্রহ্মচারী লোকনাথ তারাকান্তকে বলিলেন, "আমার কথায় তোমার প্রত্যয় হইতেছে না।" তারাকান্ত আর তর্ক করিলেন না, তাঁহার মন শান্ত হইল। এই সময় হইতে
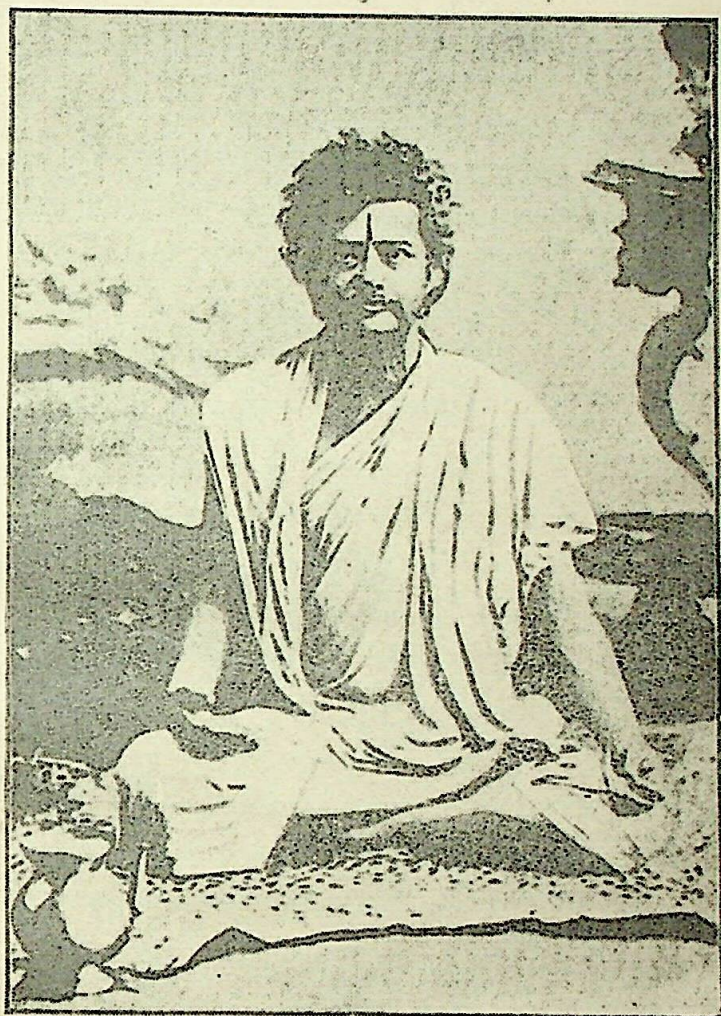
শ্রীমৎ স্বরথনাথ ব্রহ্মচারী

তিনি প্রায়ই আশ্রমে যাতায়াত করিতে লাগিলেন, এবং যাতায়াতের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মচারী বাবার সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি এখন ব্রহ্মচারী বাবাকে তুমি[১] সম্বোধন করেন। তারাকান্তের এই সম্বোধনে ব্রহ্মচারী বাবাও সন্তুষ্ট। অল্পকালের মধ্যেই ব্রহ্মচারী বাবার আদেশে তারাকান্ত জামা-জুতা পরিধান পরিত্যাগ করিলেন। শিক্ষা আরম্ভ হইল।

একবার আশ্রমে তারাকান্ত নীরবে একান্তে ব্রহ্মচারী বাবার পার্শ্বে উপবিষ্ট আছেন। অন্যান্য লোকজন বিদায় হইয়া গেলে, ব্রহ্মচারী বাবা তাঁহার দিকে ফিরিয়া তাঁহাকে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দীক্ষা গ্রহণ করবে?"

উত্তর হইল, "এ বিষয় আমা-অপেক্ষা তুমিই ভাল বোঝ। অতএব আমাকে জিজ্ঞাসা করা নিষ্প্রয়োজন।"

তারাকান্তের উত্তর শুনিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইলেন। তারপর তিনি তাঁহাকে গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন—গুরু আগে মোক্ষলাভ করিলে, তাঁহাকে শিষ্যের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়, আর শিষ্য আগে মোক্ষলাভ করিলে, তাহাকেও গুরুর জন্য অপেক্ষা করিতে হয়, এই মধুর সম্পর্কটি পরস্পর মোক্ষ-সাপেক্ষ।

তারাকান্ত সব কথা অতি মনোযোগের সহিত শুনিলেন এবং অতি সহজ ভাবে আত্ম-বিশ্লেষণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "তুমি বিরক্ত হবে ভয়ে জামা-জুতা ছেড়েছি; কিন্তু মনে মনে এখনও বাবু রহিয়াছি। তোমায় আমায় গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ হইলে, তোমার ক্ষতি। আমি যে কি প্রকৃতির লোক, তাহা আমি নিজে বেশ জানি। বাল্যকাল হ'তে তীব্র কঠোরতার ভিতর দিয়ে, সুদীর্ঘকাল সাধন-ভজন করে তুমি মহাসিদ্ধি লাভ করেছ। আমি তোমার শিষ্য হলে, কে জানে তোমাকে কত কাল আমার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। সুতরাং তোমার থেকে আমার দীক্ষা গ্রহণ করা উচিত নয়!"

১ ঠাকুর দেবতাকে সকলেই "তুমি" বলিয়া ডাকেন, কেহই "আপনি" বলেন না।

উকিলের ওকালতী যুক্তি!

তারাকান্তের এই উক্তিতে ব্রহ্মচারী বাবা একটু হাসিলেন। অনতিকাল পর তাঁহাকে দীক্ষা প্রদান করিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, "গুরু-বাক্য পাইলে, এখন তোমার লব্ধ বেদান্ত বাক্যের সঙ্গে মিল দিয়ে দেখ।" দীক্ষা প্রদান-অন্তে ব্রহ্মচারী বাবা তারাকান্তের লৌকিক নাম বদলাইয়া "ব্রহ্মানন্দ ভারতী"[১] রাখিলেন।

ব্রহ্মানন্দ ভারতীর সঙ্গে ব্রহ্মচারী বাবার আলাপ-আলোচনার আরও কয়েকটি প্রসঙ্গ এখানে দেওয়া হইল।

একদা ভারতী মহাশয় আশ্রমে আসিয়াছেন। বেলা দ্বিপ্রহর অতীত। বাবা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, আহুতি দেওয়া হয়েছে ত?"

ভারতী মহাশয় একটু চিন্তা করিয়া বুঝিলেন,—তাঁহাকে আহারের কথা জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে। তিনি উত্তরে বলিলেন, "হ্যাঁ, ঐ কাজ সেরে এসেছি।" ভারতী মহাশয়ের সঙ্গে বাবা লোকনাথের বেশ রসিকতা চলিত।

রাত্রি প্রভাত হইলেই আশ্রমে নানা প্রকার রোগীর ভীড় ও হট্টগোল আরম্ভ হয়। একবার ভারতী মহাশয় আশ্রমে উপস্থিত আছেন, এমন সময় রোগীরা তাহাদের রোগ প্রতিকারের জন্য ব্রহ্মচারী বাবাকে বড়ই বিরক্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আশ্রমটি যেন একটি দাতব্য চিকিৎসালয়। বাবা রোগীদিগকে বুঝাইতে অনেক চেষ্টা করিলেন যে তিনি ডাক্তারও নন্, কবিরাজও নন্। কিন্তু তাঁহার কথা কে কানে তোলে! যতই তিনি রোগীদিগকে তাঁহার নিকট আসিতে নিষেধ করিতে লাগিলেন, ততই তাহাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবস্থা দেখিয়া ভারতী মহাশয় রোগীদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া একটু গরম হইয়া বাবাকে বলিয়া

১ "সিদ্ধজীবনী"-প্রণেতা ব্রহ্মানন্দ ভারতী।

বসিলেন, "রোগীরা তাহাদের স্বেচ্ছায় এখানে এসেছে, তুমি তাহাদিগকে তাড়ায়ে দেওয়ার কে ?"

ব্রহ্মচারী স্মিতমুখে বলিলেন, "ইহারা যে আমাকে লক্ষ্য করে এখানে আসে, এবং আমার শরণাপন্ন হয়, তাতে আমি সুস্থির থাকতে পারি না। ইহাদের দুঃখে আমার দুঃখ বোধ হয়। দুঃখবোধে দয়া আসে। দয়াতে আমার শক্তি পরিচালিত হয়, এবং ইহাতে রোগীরা রোগমুক্ত হয়ে যায়।"

গ্রন্থারম্ভে লোকনাথকে 'লোকের নাথ'[১] বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। দুঃখীর দুঃখে তাঁহার দুঃখবোধ হয়, দুঃখবোধে দয়া আসে। করুণানিধান লোকনাথের এই আশ্বাস-বাক্যে ভক্ত মাত্রেরই হৃদয়ে আশা ও নিরাপত্তার সঞ্চার হয়।

ভারতী মহাশয় সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত। তিনি শাস্ত্রালাপ বড় ভালবাসেন। এক দিন ব্রহ্মচারী বাবার সহিত শাস্ত্রালাপ করিতে করিতে আলোচ্য বিষয়-বস্তুটির অর্থ দুই জনে দুই রকম ধরিয়া নিজ নিজ যুক্তি-তর্ক চালাইতেছেন। মীমাংসার কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। ব্রহ্মচারী বাবা তাঁহার মতানুবর্ত্তী হইতেছেন না দেখিয়া, হঠাৎ ভারতী মহাশয় সাময়িক উত্তেজনাবশতঃ ভুলিয়া গেলেন, কাঁহার সহিত তিনি তর্ক করিতেছেন, এবং বাবাকে বলিয়া ফেলিলেন, "তুমি মূর্খ।"

ব্রহ্মচারী বাবাও আসর গরম রাখিয়া শ্রুত উক্তিটিরই আবৃত্তি করিলেন, "তুই মূর্খ।"

মনে হ'ল যেন উভয় দিকেই একটা প্রচণ্ড ঝড় বহিয়া গেল। ভারতী মহাশয় পর মুহূর্ত্তেই আপন ভুল বুঝিতে পারিয়া অধোবদনে মৌন রহিলেন। তাঁহার অবস্থা বুঝিতে বাবার বাকী রহিল না। তিনি আস্তে করিয়া বলিলেন, "চুপ রইলে কেন ?"

"তোমাকে মূর্খ বলেছি।"

১ জগতের নাথ, জগতের প্রাণী মাত্রেরই আশ্রয়।

ব্রহ্মচারী। তাতে দুঃখিত হওয়ার কি আছে। 'মূর্খ' শব্দের অর্থ "অজ্ঞ", তুই আমাকে মূর্খ বলেছিস্, কারণ আমি তোর কথার অর্থ জানি না। আর আমি তোকে মূর্খ বলেছি, কারণ তুই আমার কথার অর্থ জানিস্ না।

ব্রহ্মচারী বাবার মীমাংসাটি হইয়া গেল অতি সুন্দর—যেন উভয়েরই ভুল, আবার উভয়েরই শুদ্ধ হইয়াছে।

ব্রহ্মচারী বাবার জন্মস্থান দর্শন

ব্রহ্মানন্দ ভারতী মহাশয়ের একান্ত অভিলাষ হইল তিনি ব্রহ্মচারী বাবার জন্মস্থান কাঁকড়া-কচুয়া দর্শন করেন। বারাসত হইতে রওনা হইয়া তিনি কচুয়া নামে একটি গ্রামে উপস্থিত হইলেন। অনেক অনুসন্ধান করিয়াও এই গ্রামে ঘোষাল পরিবারের কোন সূত্র বা অস্তিত্ব পাওয়া গেল না। অবশেষে তিনি সেখানে শুনিলেন যে আরও কিছু দূরে কাঁকড়া-কচুয়া বলিয়া আর একটি গ্রাম আছে। সেখানে উপস্থিত হইয়া তিনি তৎকালীন নবীনকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে আতিথ্য স্বীকার করিয়া কিছু দিন অবস্থান করিলেন। এই গ্রামে তিনি অন্যান্য দর্শনীয় বস্তুর সহিত "মইজলা" নামে একটি সুবৃহৎ জলাভূমি[১] দেখিলেন। স্থানীয় বিশিষ্ট লোকদের সঙ্গে আলাপ-অনুসন্ধানের ফলে তিনি এক জনের নিকট একটা অতি পুরাতন কবালা পাইলেন। এই কবালার চৌহদ্দি বা চতুঃসীমায় ঘোষাল উপাধিধারীদের ভূ-সম্পত্তির উল্লেখ রহিয়াছে—ইহা তিনি দেখিতে পাইলেন। ইহাতে প্রমাণিত হইল যে এই গ্রামে পূর্ব্বে ঘোষাল উপাধিধারী কোন ব্রাহ্মণ পরিবারের বসতি ছিল।

১ বিল

ভারতী মহাশয় বারদী ফিরিয়া গিয়া ব্রহ্মচারী বাবাকে কাঁকড়া-কচুয়া গ্রামের বর্ণনা দিলেন। "মইজলার" বিষয় স্বীকার করিয়া বাবা বলিলেন, "এই বিলের কথা আমার বেশ মনে পড়িতেছে!"

ভারতী মহাশয়ের কাঁকড়া-কচুয়া গ্রামখানা পরিদর্শনের ফলে, এইরূপ অনুমান করা সহজ যে শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবা কাঁকড়া-কচুয়া নিবাসী ঘোষাল পরিবারেরই সন্তান[১]।

শ্রীঅখিল চন্দ্র সেন
সুরথ নাথ ব্রহ্মচারী

ঢাকা জিলার সোণারগাঁ[২] পরগণায় গোবিন্দপুর গ্রামে অখিল চন্দ্র সেন মহাশয়ের পৈতৃক বাসভূমি ছিল। সেন মহাশয় দেখিতে অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন। তিনি বিলাসী গৃহী। পোষাক পরিচ্ছদে তাঁহাকে বেশ মানাইত। প্রকাশ, জীবনের প্রথমাংশে তিনি উচ্ছৃঙ্খল-স্বভাব ছিলেন। ইহা তাঁহার পরবর্ত্তী কালের সাধনপথে ভোগ-নিবৃত্তি বিশেষও ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। গোবিন্দপুর ও বারদী নিকটবর্ত্তী গ্রাম—তিন কি চারি মাইল ব্যবধান হইবে। মহাপুরুষ লোকনাথের মাহাত্ম্য শুনিয়া অখিল সেন মহাশয় বারদীর আশ্রমে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। কয়েক বৎসর ব্রহ্মচারী বাবার সঙ্গলাভে তাঁহার পূর্ব্বাভ্যাস ক্রমে সংশোধিত হইতে লাগিল।

একবার তিনি সার্ট-কোট, চেইন-ঘড়ি[৩], জুতা-মোজা পরিধান করিয়া, বেশ ফিট-ফাট্ বাবু সাজিয়া ব্রহ্মচারী বাবার

১ এই যুক্তিবাদে শ্রীমৎ বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের সহিত বাবা লোকনাথের লৌকিক সম্বন্ধের নিরসন হয়।

২ বারভূঁইয়ার অন্যতম—ঈশা খাঁর সুবর্ণগ্রাম।

৩ সেই যুগে কব্জি-ঘড়ি কদাচিৎ দৃষ্ট হইত, পকেট ঘড়িই বেশী প্রচলিত ছিল।

আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। বাবা তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন, "বড় যে সাজ-সজ্জা করে এসেছিস্।"

সেন মহাশয় উপস্থিত মতে উত্তর করিলেন, "শরীর যে দেব-মন্দির। একে সাজাব না তো সাজাব কাকে ?

প্রশ্নের উত্তরটি শুনিয়া বাবা খুব সন্তুষ্ট হইলেন। অবশেষে উপযুক্ত সময়ে ব্রহ্মচারী বাবা সেন মহাশয়কে দীক্ষা দান করিলেন, এবং সুরথ নাথ ব্রহ্মচারী নামে অভিহিত করিয়া গৈরিক বসন দান করিলেন। সুরথ নাথ ব্রহ্মচারী বলিয়া গিয়াছেন, "আমার ন্যায় নরাধমও ব্রহ্মচারী বাবার স্পর্শে সোণা হইয়া গেল!"

তারাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় ও অখিল চন্দ্র সেন—ইহাদের এক জন মহাশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, অপর জন সংসারের আবিলতায় নিমজ্জিত, এক জন জ্ঞানের উচ্চশিখরে, অন্য জন অজ্ঞানতার ঘোর অন্ধকারে, এক জন সাত্ত্বিক, অপর ঘোর তামসিক। মনে হয় যেন ব্রহ্মচারী বাবা ভক্ত-ক্ষেত্র হইতে ব্রহ্মানন্দ ভারতী ও সুরথ নাথ ব্রহ্মচারীকে বিশেষ নমুনা-স্বরূপ বাছিয়া তাঁহাদিগকে কৃপাদান করিলেন, এবং জগৎকে দেখাইলেন যে গুরু-কৃপায় সবই সম্ভবপর হয়।

"গুরু আমার দয়াল বটে, থাকে না কেউ পড়ে ঘাটে,
পাপী তাপী বেছে নিয়ে, পালে তরী ছুটে রে ছুটে।"

শ্রীরজনী ব্রহ্মচারী

পূর্ব্ববঙ্গে ফরিদপুর জেলায় পালং থানার অধীন মহিসার গ্রামে রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের জন্মস্থান, কর্ম্মজীবনে তিনি ঢাকা প্রথম সাবজজ কোর্টে সেরেস্তাদার ছিলেন। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তখন ঢাকায় আশ্রম স্থাপন করিয়া অবস্থিতি

করিতেছিলেন। রজনী চক্রবর্ত্তী মহাশয় মাঝে মাঝে গোস্বামী মহাশয়ের আশ্রমে যাতায়াত করিতেন। এক দিন গোস্বামী মহাশয় তাঁহাকে ব্রহ্মচারী লোকনাথের কথা বলিলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের তখন ব্রহ্মচারী বাবার দর্শন লাভ করার জন্য একান্ত বাসনা জন্মিল। কোন এক ছুটি উপলক্ষে তিনি নৌকাযোগে বারদী গেলেন, ব্রহ্মচারী বাবার আশ্রম-ঘরে প্রবেশ করিয়া, তাঁহার চরণ স্পর্শ করিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করার সময় এক মনোমুগ্ধকর অব্যক্ত সৌরভ তাঁহার অনুভূত হইল। প্রণাম করিয়া উঠিয়া তিনি নিকটেই মেজের উপর উপবেশন করিলেন। তিনি ভক্তিপ্লুত নয়নে বাবার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন। তিনি যতই দর্শন করিতেছেন, ততই তাঁহার দর্শন করার তৃষ্ণা বৃদ্ধি পাইতেছে। হঠাৎ তিনি দেখিলেন, ব্রহ্মচারী বাবার পলকশূন্য চক্ষু দুইটি স্থির, শ্বাস-প্রশ্বাসের কোন চিহ্ন নাই। তাঁহার মনে হইল, ব্রহ্মচারী বাবার দৃষ্টি মর্ত্ত্যধাম ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। পনের মিনিটেরও অধিককাল মহাপুরুষ এই অবস্থায় রহিলেন। ভক্তবিশেষে বাবা ব্রহ্মচারীর ইহা আধ্যাত্মিক দর্শন দান বলিয়া মনে হয়। সমাধিভঙ্গের কিছুকাল পর ব্রহ্মচারী বাবা চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে প্রশ্ন করিয়া জানিলেন,—তিনি মৃতদার, সংসার-বিরাগী ও গুরুকৃপাপ্রার্থী।

ইহার পর অবসর পাইলেই তিনি ঢাকা হইতে বারদী আশ্রমে ছুটিয়া যাইতেন। তিনিও ব্রহ্মচারী বাবার বিশেষ কৃপালাভ করিয়াছিলেন। তিনি যোগী ছিলেন। তাঁহার যোগদেহের দিব্যকান্তি দর্শনে ভক্তের মনে আপনা হইতেই ভক্তির উদ্রেক হইত। তাঁহার কণ্ঠস্বর অতি সুমধুর ছিল, এবং তিনি মৃদু ও মিষ্ট ভাষী ছিলেন। ভক্তমহলে তিনি "রজনী ব্রহ্মচারী" নামে খ্যাত। ঢাকা উয়ারীতে তিনি "ব্রহ্মচারী যোগাশ্রম" প্রতিষ্ঠিত করেন। পরে এই আশ্রম ফরিদাবাদে স্থানান্তরিত হয়।

"গুরু ভগবান গাঙ্গুলী" প্রসঙ্গে রজনী ব্রহ্মচারী মহাশয়ের শিষ্য শ্রীকেদারেশ্বর সেনগুপ্ত মহাশয় তাঁহার সঙ্কলিত "শ্রীশ্রীলোকনাথ মাহাত্ম্য" গ্রন্থে রজনী ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সঙ্গে লোকনাথ বাবার অনেক উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন, এবং স্বীয় ব্যাখ্যা দ্বারা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে সম্ভবতঃ রজনী ব্রহ্মচারী মহাশয়ই লোকনাথ বাবার পূর্ব্বজন্মের গুরু ভগবান গাঙ্গুলী।

গুরু ভগবান গাঙ্গুলী সম্পর্কিত বিষয়ের উল্লেখ করিয়া লোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবার অন্যতম ভক্ত মথুরামোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় একদা রজনী ব্রহ্মচারী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "গুরু ভগবান সম্বন্ধে কি আপনার কিছু মনে পড়ে ?"

উত্তরে রজনী ব্রহ্মচারী মহাশয় তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "না, আমার তো কিছু মনে পড়ে না, এবং এ বিষয়ে আমি কোন দিন চিন্তাও করি নাই।"

শ্রীকেদারেশ্বর সেনগুপ্ত মহাশয়ও সম্ভবতঃ তাঁহার সন্দেহ নিরসনকল্পে এক দিন তাঁহার গুরু রজনী ব্রহ্মচারী মহাশয়কে গুরু ভগবান গাঙ্গুলী সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। উত্তরে রজনী ব্রহ্মচারী মহাশয় বলিয়াছিলেন, "এ বিষয়ে চিন্তা করিবার প্রয়োজন বোধও আমার কোন দিন হয় নাই। বিশেষতঃ গুরু ভগবান যিনিই হউন না কেন, তাহাতে কোন বাহাদুরী আছে এমন আমি মনে করি না[১]।"

এখানে রজনী ব্রহ্মচারী মহাশয়ের উপদেশটি প্রণিধানযোগ্য। গুরু ভগবান গাঙ্গুলী যে কে, এবং তাঁহার সম্বন্ধে যে লোকনাথ বাবার কি কর্ত্তব্য তাহা তিনিই জানেন, অন্যের এ বিষয়ে চিন্তা করা নিষ্প্রয়োজন।

"সিদ্ধজীবনী" প্রণেতা ব্রহ্মানন্দ ভারতী মহাশয়ও লোকনাথ বাবার সহিত তাঁহার কথোপকথনের অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া

১ "শ্রীশ্রীলোকনাথ মাহাত্ম্য" গ্রন্থের ১০৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

অবশেষে "গুরু ভগবান গাঙ্গুলী সহ পুনর্ম্মিলন"[১] অধ্যায়ে নিজকে পূর্ব্বজন্মের গুরু ভগবান গাঙ্গুলীরূপে পরিচয় দিয়াছেন, এবং এই সম্পর্কে কৃত যথাযথ অনুষ্ঠানাদিরও উল্লেখ করিয়াছেন।

ইহা নিশ্চিত যে পূর্ব্বজন্মের প্রতিশ্রুতি অনুসারে গুরু ভগবান পুনঃ মানবদেহ ধারণ করিয়াছেন। তিনি হয় লোকনাথ বাবার নিকট আসিয়াছেন, নয় আসিবেন, এবং বাবাও গুরুর প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্য নিশ্চয়ই পালন করিয়াছেন বা করিবেন। ব্রহ্মানন্দ ভারতী ও রজনী ব্রহ্মচারী মহাশয় উভয়েই ব্রহ্মচারী বাবার পরম ভক্ত, উভয়েই যুক্ত[২] এবং উভয়েই খুব সম্ভবতঃ মুক্ত।

শ্রীযামিনীকুমার মুখোপাধ্যায়

"ধর্ম্মসার-সংগ্রহ"-প্রণেতা যামিনীকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় ব্রহ্মচারী লোকনাথের প্রাচীনতম শিষ্যদের অন্যতম। তিনি ঢাকায় উকিল ছিলেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের প্রমুখাৎ লোকনাথ বাবার অসীম শক্তির কথা শুনিয়া, অধ্যাত্মজীবনে তিনি তাঁহার দর্শন ও করুণা লাভ করেন। লোকনাথ বাবার সম্বন্ধে কেহ তাঁহার মত শুনিতে চাহিলে, যিনি এক কথায় তাঁহার সকল ভক্তি ব্রহ্মচারী বাবার শ্রীচরণতলে ঢালিয়া দিতেন, এবং বলিতেন, "বাবা মূর্ত্তিমান গীতা।" তিনি বাবার সঙ্গলাভে কৃতার্থ হইয়াছেন। "ধর্ম্মসার-সংগ্রহ" গ্রন্থে মুখোপাধ্যায় মহাশয় লোকনাথ বাবার নিকট হইতে প্রশ্নোত্তরে অনেক মূল্যবান কথামৃত সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

১ বাবা লোকনাথের পুনর্ম্মিলন।
২ যুক্ত—যে যোগীর যোগাভ্যাস হইয়াছে এমন।

শ্রীরামকুমার চক্রবর্ত্তী

ব্রহ্মচারী বাবার অপর একজন অতিপ্রিয় শিষ্য ছিলেন—বারদী গ্রামের বিখ্যাত পুরোহিতবাড়ীর রামকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়। তিনি শান্তশীল শাস্ত্রজ্ঞানী সাত্ত্বিক পুরুষ ছিলেন। বারদীতে ব্রহ্মচারী বাবার আশ্রম প্রতিষ্ঠার সময় রামকুমার মধ্য বয়স অতিক্রম করিয়াছেন। অতি অল্প কালের মধ্যেই তিনি আকৃষ্ট হইয়া আশ্রমে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। ক্রমে ব্রহ্মচারী বাবার সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ও যোগাযোগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বিশেষ আগ্রহের সহিত লোকনাথ রামকুমারকে দীক্ষা দান করিয়া পরিব্রাজকরূপে[১] জীবন-যাপন করার আদেশ দেন। গুরুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া রামকুমার পরিব্রজ্যা[২] গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহত্যাগ করেন, এবং তীর্থস্থানাদি পরিভ্রমণ ও পরিদর্শনে বহির্গত হন[৩]।

ব্রহ্মচারী বাবার মন্ত্রশিষ্যদের মধ্যে রামকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ক্ষেত্রে একটু বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। তিনি অন্যান্য শিষ্যদিগকে মন্ত্রদান করিয়া পথ ধরাইয়া দিয়াছেন; আর প্রিয় রামকুমারকে মন্ত্রদান করার পর পরিব্রজ্যা গ্রহণ করাইলেন, অর্থাৎ গুরুর আদেশে রামকুমার সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

শ্রীঅভয়ানন্দ ব্রহ্মচারী

পরম দয়াল ব্রহ্মচারী বাবা সরল-প্রাণ অভয়ানন্দ ব্রহ্মচারীকেও দীক্ষা দান করিয়াছিলেন।*

১ পরিব্রাজক—চতুর্থাশ্রমী। ২ পরিব্রজ্যা—গৃহত্যাগ করিয়া তীর্থভ্রমণ ও তপশ্চরণ। ৩ রামকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পুত্র রজনীকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়—ঢাকা জজ কোর্টের উকিল ছিলেন।

* অভয়াচরণ চক্রবর্ত্তী দ্রষ্টব্য।

শ্রীমথুরামোহন চক্রবর্ত্তী

মথুরামোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ "শক্তি ঔষধালয়ের" প্রতিষ্ঠাতারূপে সকলের নিকটই সুবিদিত। পাঠ্যাবস্থায় তিনি এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে অক্রান্ত হইয়া মহাপুরুষ লোকনাথের আশ্রমে গমন করেন এবং তাঁহার কৃপালাভ করিয়া রোগমুক্ত হন। তিনি ব্রহ্মচারী বাবার পরমভক্ত ছিলেন। তাঁহার ঐহিক বাসনা পূর্ণ হইবে—এইরূপ বরও তিনি ব্রহ্মচারী বাবার নিকট হইতে লাভ করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. উপাধি লাভ করিয়া, ঢাকা জেলার রোয়াইল গ্রামের হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদপ্রাপ্ত হন। অতঃপর চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া তিনি আয়ুর্ব্বেদের প্রচারকল্পে বিশুদ্ধ ঔষধাদি নির্ম্মাণের জন্য ঢাকায় এক কারখানা স্থাপন করেন। ইহাই শক্তি ঔষধালয় নামে খ্যাত। লোকনাথ বাবার কৃপায় চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের এই প্রচেষ্টায়, তাঁহার ঐহিক জীবনের যথেষ্ট উন্নতি লাভ ঘটে।

কল্পতরু লোকনাথ

অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ বেত্তা ও দ্রষ্টা শ্রীশ্রীব্রহ্মচারী বাবা লোকনাথ এখন ভক্তমাত্রেরই অভীষ্ট ফলপ্রদ কল্পতরু। সূক্ষ্মদেহে তিনি এখন আকাশ-পথে জগতের সর্ব্বত্র বিচরণ করেন। তিনি অন্তর্যামী। তাঁহার দয়ায় ভক্তের ব্যাধিগ্রস্ত দেহ তাঁহার দর্শনমাত্রে রোগমুক্ত হয়। তাঁহার বিভূতি অনন্ত, করুণা অপার। উদয়াস্ত আশ্রমটি এখন লোকে পূর্ণ। প্রত্যেকেই কিছু চাহিতেছে, অধিকাংশই ঐহিক, কদাচিৎ পারত্রিক। করুণাময় দাতা তাঁহার অফুরন্ত ভাণ্ডার খুলিয়া দুই হাতে বিলাইতেছেন। প্রার্থীর আগমন ও মহাপুরুষ দর্শন, তাঁহার দয়া ও সঙ্গে সঙ্গে ফলপ্রাপ্তি—আশ্রমে এই ধারাবাহিকতার বিরাম নাই। মহাপুরুষ নিজেই জগৎকে তাঁহার আশ্বাস-বাণী দিয়া রাখিয়াছেন, "আমি শতাধিক বৎসর পাহাড়-পর্ব্বত পরিভ্রমণ করে বড় একটা ধন[১] কামাই করেছি। এ শরীরের উপর কত বরফ জল হ'য়ে গিয়েছে। তোরা এই ধন ব'সে ব'সে খাবি।"

তপঃপীড়িত দেহে ও একনিষ্ঠ মনে অর্জ্জিত তাঁহার এই ধন-সম্পত্তি[২] সন্তানেরই মঙ্গলের জন্য। তাঁহার এই কঠোর শ্রম কাদের জন্য? যারা ব'সে ব'সে খাবে, তাদের জন্য। কি অপার অপত্যস্নেহ, সন্তানের জন্য পিতার কি অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ! পিতৃ-বাক্যে প্রত্যয় রাখিতে এবং তাঁহার আদেশমত চলিতে পারিলে, ইষ্ট-সাধন ধ্রুব।

শ্রীশ্রীগুরুর নিকট সম্যক আত্ম-সমর্পণই ভক্তের প্রধান ও অব্যর্থ সম্বল।

১ সিদ্ধিলাভ।
২ ধন-সম্পত্তি—ব্রহ্মশক্তি সম্ভূত গুরুকৃপা।

আশ্রম-মাতার কালীঘাটের কালীমাতা দর্শন

আশ্রম-মাতার এক আত্মীয় কলিকাতার কালীঘাটের শ্রীশ্রীকালী মায়ের নামে মানত করিয়া সুফল লাভ করিয়াছে। সেই আত্মীয়ের এমন আর্থিক শক্তি নাই যে সে নিজে কালীঘাট যাইয়া এই মানত পরিশোধ করিতে পারে। গোসাঁই বাবার আশ্রমে যে সকল ভক্তের সমাগম হয়, তাহাদের কাহারও মারফৎ এই ঋণশোধ করা সম্ভবপর হইতে পারে ভাবিয়া, সে এক দিন মাকে ধরিল। মা বিষয়টি সম্পূর্ণ খুলিয়া পুত্র লোকনাথকে বলিলেন। মায়েরও ইচ্ছা ছিল এই উপলক্ষে তিনিও কালীমায়ের দর্শন লাভ করিয়া আসেন। পুত্র অন্তর্যামী। তিনি মায়ের সব কথা মন দিয়া শুনিলেন, সবই বুঝিলেন, এবং বলিলেন, "মানত আশ্রমে আমার নিকট দিলেই কালীমা পাবেন।"

মায়ের অটল বিশ্বাস পুত্রের বাক্যে। তিনি তাঁহার আত্মীয়কে গোসাঁই বাবার আদেশ জানাইলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঐ আত্মীয় মানতের টাকা ও উপকরণাদি আশ্রমে মায়ের নিকট আনিয়া উপস্থিত করিল। মা ঐ টাকা ও দ্রব্যাদি লইয়া যেমন আশ্রম-গৃহে প্রবেশ করিলেন, অমনি দেখিলেন—গোসাঁইর আসনে জলদবর্ণা, করালবদনা শ্রীশ্রীকালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। বিস্ময় ও ভক্তিতে তাঁহার হৃদয় ভরিয়া গেল! তিনি মাটিতে লুটাইয়া প্রণাম করিলেন। প্রণামান্তে উঠিয়া দেখিলেন—স্বীয় আসনে উপবিষ্ট নিজে গোসাঁই বাবা!

মায়ের কালীঘাট যাওয়ার বাসনা পূর্ণ হইল।

পুরীধামের জগন্নাথদেব দর্শন

আশ্রমে আসার অনেক পূর্ব্ব হইতেই মায়ের পুরীধামের শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব দর্শনের প্রবল বাসনা ছিল। সুযোগ বুঝিয়া এক দিন তিনি তাঁহার এই বাসনা পুত্রের নিকট প্রকাশ করিলেন।

ব্রহ্মচারী বাবার, "এইখানেই জগন্নাথ, মা", বলার সঙ্গে সঙ্গে মা গোসাঁই বাবার আসনে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরাম মূর্ত্তিত্রয়ের দর্শন লাভ করিলেন। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করার পর, তিনি উঠিয়া দেখেন—আসনে আবার যেই গোসাঁই বাবা, সেই গোসাঁই বাবা!

খুব ভয় পেয়েছিলে বুঝি, মা ?

মায়ের দূর সম্পর্কিত এক ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল। সে গ্রামান্তরে বাস করিত। পিসীমাতাকে তাহার বাড়ীতে নেওয়ার জন্য একবার সে তাহার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ তাঁহাকে জানাইল। পিসীমায়ের অনুপস্থিতিতে আশ্রমের সেবাব্রতের অসুবিধা সত্ত্বেও, গোসাঁই বাবা মাকে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের বাড়ীতে যাইয়া অল্পকাল থাকিয়া আসার অনুমতি দিলেন। বিশেষ কোন কারণে, যে দিন আশ্রমে ফিরিয়া আসার কথা, সেই দিন মা ফিরিতে পারিলেন না।

রাত্রিকাল। আকাশ বেশ পরিষ্কার। কোন দিকে কোন প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগের লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। পিসীমা ও ভাইপোতে ঘরের মধ্যে বসিয়া, প্রদীপের মিট্ মিট্ আলোতে সুখ-দুঃখের কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময় হঠাৎ ঘরখানা দুলিতে লাগিল,—যেন ভূকম্পন হইতেছে। গৃহ-কম্পনের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধা পিসীমাকে ঘরে রাখিয়া ভ্রাতুষ্পুত্র দৌড়াইয়া বাহিরে আসিল। বাহিরের অবস্থা তাহার নিকট স্বাভাবিক বলিয়া মনে হইল। তবুও প্রতিবেশীর বাড়ীতে যাইয়া ভূমিকম্পের কথা বলায়, তাহারা অবাক্ হইয়া গেল। এ দিকে পিসীমা ঘরে বসিয়াই সব অবস্থা বুঝিতে পারিলেন, এবং গোসাঁই বাবাকে মনে মনে ডাকিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরই অবস্থা আবার স্বাভাবিক হইয়া গেল। ভ্রাতুষ্পুত্র ফিরিয়া আসিল; কিন্তু ব্যাপারটি তাহার নিকট রহস্য-জনকই রহিয়া গেল।

নির্দ্দিষ্ট দিনে আশ্রমে ফিরিয়া না আসায়, গোসাঁই বাবা বিরক্ত হইয়াছেন ভাবিয়া, পরদিন প্রাতঃকালেই মা আশ্রমে ফিরিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই বাবা বলিলেন, "কি মা, ভাইপোর বাড়ীতে ভাল ছিলে তো?"

মা হাসিয়া উত্তর করিলেন, "হ্যাঁ বাবা, খুব ভালই রেখেছিলে! আমাকে কাল রেখে ত ভাইপোটির পেটের ভাত চা'ল!"

গোসাঁই বাবা মায়ের নিকট ন্যাকা সাজিয়া বলিলেন, "খুব ভয় পেয়েছিলে বুঝি, মা? কি হয়েছিল?"

মায়ে পোয়ে বেশ এক বাজি খেলা হইয়া গেল! কাহার জয় হইল?

ভজলেরামের বাঘ দেখা

আশ্রম-সেবিকা সরলপ্রাণা ভজলেরামের প্রাণে দুইটি বড় সাধ রহিয়া গিয়াছে। সে শুনিয়াছে,—"বাঘে ধরেছে" আর "পুলিশে ধরেছে।" সে বাঘও দেখে নাই, পুলিশ ত দেখেই নাই। এক দিন তাহার সেই স্বাভাবিক এক ঝলক হাসি হাসিয়া সে তাহার গোসাঁইর নিকট বাঘ ও পুলিশ দেখার বায়না ধরিয়া বসিল। বাবা তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, সেও গোসাঁই ছাড়া অন্য কিছু জানিত না।

কতক দিন পর শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নালোকিত এক মধ্যরাত্রে সত্য সত্যই আশ্রমের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে এক চিতাবাঘ আসিয়া উপস্থিত। শরীরটি তাহার কাল ফোঁটা ফোঁটা ও মসৃণ। আশ্রম ঘরের ভিতর হইতে গোসাঁই ভজলেরামকে ডাকিয়া জাগাইলেন, এবং তাহাকে বাঘ দেখিতে বলিলেন। ভজলেরাম তাহার ঘরের দরজা খুলিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে পাইল—বাঘটি গোসাঁইর ঘরমুখী হইয়া সম্মুখের পা দুইটি সোজা রাখিয়া বসা অবস্থায় আছে। ভজলেরামকে ডাকার শব্দে, আশ্রমের অন্যান্য ঘরে নিদ্রিত অভ্যাগতদেরও নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। তাহারা বেড়ার ফাঁক দিয়া বাঘটি দেখিয়া ভীত

হইল। ভজলেরামের কিন্তু ভয় বলতে কিছুই নাই; কারণ তাহার গোসাঁই তাহাকে বাঘ দেখিতে বলিয়াছেন; তিনি বাঘ কে তো আর বলেন নাই—ভজলেরামকে দেখতে বা ধরতে!

কত ক্ষণ থাকিয়া বাঘটি উঠিয়া নিকটস্থ জঙ্গলের দিকে যাওয়ার উপক্রম করিল; কিন্তু ভজলেরামের এই সুন্দর জীবটিকে চোখ ভরিয়া দেখার সাধ তখনও পূর্ণ মিটে নাই; সুতরাং সে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "গোসাঁই, গোসাঁই, বাঘকে আর কিছুকাল রাখেন, আর একটু দেখিয়া লই।"

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতেই, বাঘ জঙ্গলে ছুটিয়া গেল। ভজলেরাম ছাড়া আর সকলেই হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

ভজলেরামের পুলিশ দেখা

আশ্রমে অভ্যাগতদের মধ্যে দিনের পর দিন রোগীর সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল—আশ্রমটি প্রায় হাসপাতাল। বাজারের এত নিকটবর্ত্তী স্থানে নানা প্রকার ব্যাধিগ্রস্ত লোক সমাগমে স্থানীয় স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর, কোন কোন মহলে এইরূপ আলোচনা চলিতে লাগিল। আশ্রমে ভীড় ও হট্টগোল না করার জন্য রোগীদের প্রতি গোসাঁই বাবার মানা—তাহারা কাণেই তোলে না। তাহাদের স্থির বিশ্বাস গোসাঁই বাবার 'বাক্য' পাইলে তাহারা রোগমুক্ত হইবে। অবস্থা যখন এইরূপ, তখন লোকনাথ রাজ-কর্ম্মচারীর সাহায্যে ইহার প্রতিকার করিবেন স্থির করিলেন।

নারায়ণগঞ্জের ম্যাজিষ্ট্রেট একজন ইংরাজ। তাঁহার নিকট অজ্ঞাতসূত্রে সংবাদ পৌঁছিল যে, বারদীর লোকনাথ ব্রহ্মচারীর আশ্রমে যে ভাবে আগত পীড়িতের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে স্থানীয় স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা। সংবাদ পাইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট স্বয়ং বারদী যাইয়া ইহার তদন্ত এবং দরকার হইলে ব্যবস্থা করিবেন মনস্থ করিলেন।

ব্রহ্মানন্দ ভারতী মহাশয় তখন আশ্রমে উপস্থিত আছেন। অন্তর্য্যামী লোকনাথ এক দিন তাঁহাকে বলিলেন, "শীঘ্রই নারায়ণগঞ্জ হইতে এক জন ইংরাজ কর্ম্মচারী এখানে আসিতেছেন। তিনি আসিলে তুমি তাঁহার নিকট এই মর্ম্মে এক দরখাস্ত করিবে, "আমার গুরুদেবের আশ্রমে তাঁহার নিষেধ সত্ত্বেও রোগীরা অসম্ভব রকমে ভীড় জমাইতেছে। সরকারকে এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা করিতে আজ্ঞা হয়।"

ইহার কিয়ৎকাল পরই জনকতক লালপাগড়ী পুলিশ[১] বারদী আসিয়া আশ্রমের সম্মুখে মাঠের উপর কয়েকটি সাদা তাঁবু খাঁটাইল, এবং যথাসময়ে নারায়ণগঞ্জের জয়েণ্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ম্যাজিষ্ট্রেটগণ মফঃস্বলে আসিলে, তাঁহাদিগকে উপলক্ষ্য করিয়া দুই এক জন উকিল-মোক্তারও সঙ্গে আসেন। ব্রহ্মচারী বাবার আদেশমত ব্রহ্মানন্দ ভারতী এক মোক্তারের সাহায্যে সাহেবের নিকট গুরু-নির্দ্দিষ্ট আবেদন-পত্র পেশ করিলেন। ভারতী মহাশয়ের আবেদনপত্র ছাড়া সে যাত্রায় সাহেবের নিকট আর অন্য কোন আবেদন বা অভিযোগ উপস্থিত হয় নাই। স্বচক্ষে রোগী সম্পর্কে আশ্রমের অবস্থা দেখিয়া, সাহেব ভারতী মহাশয়ের আবেদন-পত্রের উপর হুকুম দিয়া গেলেন যে স্থানীয় চৌকিদার আশ্রমে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিবে। তাঁবু গুটান হইল এবং যাহারা আসিয়াছিল, তাহারা সকলেই চলিয়া গেল। ইহাতে আশ্রমে ভিড়ের লাঘব হউক বা না হউক, রোগীদের মধ্যে শৃঙ্খলা বোধ আসিল, এবং আশ্রমে অভ্যাগতদের পরিবেশ শান্ত হইল।

ভজলেরাম এই উপলক্ষে পুলিশ দেখিল, কিন্তু তাহার মন উঠিল না। সে গোসাঁইর নিকট যাইয়া বলিল, "গোসাঁই, পুলিশ মানু আনা।" অর্থাৎ 'পুলিশ' যে দেখছি আর দশ জনের মতই মানুষ! সে শুনিয়াছিল—'বাঘেও ধরে', 'পুলিশেও ধরে'; সুতরাং

১ সাধারণ লোকে চলিত কথায় কনেষ্টবলকে পুলিশ বলিয়া থাকে।

ভাবিয়াছিল 'পুলিশও' পূর্ব্বদৃষ্ট বাঘেরই মত এক প্রকার প্রাণী হইবে।[১]

বারদীর আশ্রমে বাবা লোকনাথের দেহ রক্ষার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ছাব্বিশ বৎসরে হাজার হাজার অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছে। এই সকল ঘটনা হইতে বিশেষ বিশেষ অল্প কয়েকটি মাত্র এই গ্রন্থে উল্লেখ করা হইল।

অন্তর্য্যামী লোকনাথ

মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের নৌকাযোগে বারদী আগমনের কথা ব্রহ্মচারী বাবা পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

অভয়াচরণ চক্রবর্ত্তী বা অভয় ব্রহ্মচারী

পূর্ব্ববঙ্গ ময়মনসিংহ জিলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার জগদলের নিকটবর্ত্তী হরিশ্চন্দ্রপট্টি নামক গ্রামে অভয়াচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের জন্মস্থান। পরিবারটি মধ্যবিত্ত ও সুশিক্ষিত। শৈশব হইতেই অভয়াচরণ শিব-ভক্ত ছিলেন। লেখা-পড়ায় অভয়াচরণ ভাল ছাত্র। যথাসময়ে এণ্ট্র্যান্স পরীক্ষা পাশ করিয়া অভয়াচরণ ময়মনসিংহ শহরের রেজিষ্টারী অফিসে কেরাণীর পদে নিযুক্ত হন। সে যুগে জীবনযাত্রার মান-মূল্য খুব কম ছিল ; সুতরাং অল্প আয়েও লোকের সংসার-যাত্রা বেশ চলিয়া যাইত। ভাইটি দুই পয়সা আয় করিতেছে দেখিয়া, অভয়াচরণের দাদা তাঁহাকে বিবাহ করাইলেন। অভয়াচরণ সরল প্রকৃতি ও ধর্ম্মপ্রাণ। সংসারের জঞ্জাল তাঁহার আদৌ ভাল লাগিল না, তাঁহার মনে হইল যেন তিনি বেড়াজালে আবদ্ধ হইতেছেন। অবশেষে এক দিন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকেও না জানাইয়া স্ত্রী-পুত্রাদি রাখিয়া তিনি সন্ন্যাসীর বেশে গৃহত্যাগ করিলেন।

১ ঘটনাটি শ্রদ্ধেয়া শ্রীসরলা নাগ মহাশয়ার নিকট হইতে সংগৃহীত। "আশ্রমের ধূলি" দ্রষ্টব্য।

অভীষ্ট বস্তুর অনুসন্ধানে অভয়াচরণ সতের বৎসর পাহাড়-পর্ব্বত পরিভ্রমণ করিলেন। বহু সাধু সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। গঞ্জিকা-সেবন তাঁহার সাধন-ভজনের সহায়ক মনে করিয়া, তিনি ইহা অভ্যাস করিয়াছিলেন।

সতের বৎসর পর তিনি পুনরায় ময়মনসিংহে ফিরিয়া আসিয়া নেত্রকোণা মহকুমায় মালনী গ্রামে একটি আশ্রম স্থাপন করিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার আশ্রমটির সংবাদ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল, এবং তিনি "অভয় ব্রহ্মচারী" নামে অভিহিত হইলেন। নানা শ্রেণীর বহু লোক তাঁহার শিষ্য ও ভক্ত হইতে লাগিল।

প্রতি শিবচতুর্দ্দশী উপলক্ষে অভয়াচরণ চন্দ্র-শেখর দর্শনে চন্দ্রনাথ তীর্থে যাইয়া থাকেন। একবার অর্থাভাব হেতু তাঁহার চন্দ্রনাথ তীর্থে যাওয়া সম্ভবপর হইল না বলিয়া, ময়মনসিংহ সহরে তাঁহার এক উকিল বন্ধুর নিকট তিনি অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বন্ধুটি লোকনাথ বাবার ভক্ত ছিলেন। তিনি অভয়াচরণকে বলিলেন, "প্রতি বৎসর শিবরাত্রিতে আপনি পাষাণ শিবের পূজা করে থাকেন, এবার জীবন্ত শিব দর্শন করে আসুন না কেন।"

তারপর বারদীর আশ্রমের ও ব্রহ্মচারী বাবার কিছু কিছু সংবাদ বলায়, অভয়াচরণের মন বারদী যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। বন্ধুটি তাঁহাকে কিঞ্চিৎ অর্থ ই সাহায্য করিয়া বিদায় দিলেন।

ময়মনসিংহ হইতে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ হইয়া বারদী যাইতে হয়। অভয়াচরণ নারায়ণগঞ্জ পর্য্যন্ত রেলগাড়ীতে আসিলেন, এবং সেখান হইতে পদব্রজে বারদী অভিমুখে রওনা হইলেন। সেই দিনই শিবচতুর্দ্দশী। জীবন্ত শিব দর্শন করার জন্য তাঁহার মন অত্যন্ত আকুলিত। পথ চলিতে বার কয়েক তাঁহার গাঁজা সেবনের প্রবল ইচ্ছা হয়। কিন্তু আজ যে শিবচতুর্দ্দশী, শিবদর্শন না করিয়া কিছুই খাওয়া উচিত নয় ভাবিয়া, তিনি সেই ইচ্ছা দমন করিলেন।

বারদীর আশ্রমে পৌঁছিয়া তাঁহার অভিলাস পূর্ণ হইল, জীবন্ত শিব দর্শন করিয়া তাঁহার হৃদয় আনন্দে ভরিয়া গেল। তিনি ভক্তি-পূর্ণ হৃদয়ে বাবা লোকনাথকে প্রণাম করিয়া নিকটেই ভূমিতে উপবেশন করিলেন।

লোকনাথ বাবা তাঁহাকে দেখিয়া প্রথমেই বলিলেন, "তুই ত গাঁজা খাস।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ," অভয়াচরণ অবনত মস্তকে সহজ ভাবে উত্তর করিলেন।

"এক চিলিম সেজে নিয়ে আয় দেখি।"

আগন্তুকের নিকট বাবা চিলিম চাহিলেন। শুনিয়া উপস্থিত ভক্তগণ সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেল, কারণ বাবা তো গঞ্জিকা-সেবী নন। অভয়াচরণের কিন্তু আরও আনন্দ হইল, জীবন্ত মহাদেব আজ শিবচতুর্দ্দশী দিন তাঁহার নিজ হস্তে সাজান চিলিম সেবন করিবেন। তাঁহার কি সৌভাগ্য! তিনি তাঁহার নিজ চিলিমটি অন্যান্য উপকরণসহ যথাস্থান হইতে বাহির করিয়া অতি সযত্নে তাহা সাজাইয়া ভক্তির সহিত ব্রহ্মচারী বাবার সম্মুখে ভূমির উপর রাখিয়া দিলেন। চিলিম হইতে তখন হাতীর শুঁড়ের ন্যায় ধূম্ররাশি উত্থিত হইয়া মৃদুমন্দ গতিতে বাঁকাইয়া বাঁকাইয়া জীবন্ত শিবের নাসা-রন্ধ্রে প্রবেশ করিল, এবং তখনই তিনি অভয়াচরণকে বলিলেন, "খা"।

অভয়াচরণ প্রসাদের অপেক্ষায় বসিয়াই আছেন। বাবার "খা" আদেশ শুনিয়া তিনি সমস্যায় পড়িলেন, তাঁহার মনে দুঃখই হইল, কারণ চিলিম তো প্রসাদীকৃত হইল না! সুতরাং তিনি বাবাকে অতি কাতরস্বরে বলিলেন, "আপনি প্রসাদ করে দিলেন না তো!"

"প্রসাদ করা হয়েছে," বাবা বলিলেন।

অভয়াচরণ আর দ্বিরুক্তি না করিয়া চিলমটি সহ একটু আড়ালে গিয়া ভক্তিভরে ইচ্ছামত প্রসাদ পাইয়া তৃপ্ত হইলেন। রাত্রিতে বাবার কথামত মা অভয়াচরণকে দুধ-মিছরি সরবৎ পান করিতে দিলেন। সেই রাত্রিতে শিবচতুর্দ্দশী উপলক্ষে ফরিদপুর জেলা হইতে আশ্রমে আগত ব্রহ্মচারী বাবার এক উকিল ভক্তের সহিত কথা-বার্ত্তায় অভয়াচরণ অনেক ক্ষণ অতিবাহিত করেন।

পর দিন পূর্ব্বাহ্নে বাবা লোকনাথ ঘরের মধ্যে আসনে উপবিষ্ট আছেন। বাহিরে ভক্ত সমাবেশ হইয়াছে। অভয়াচরণ আসিয়া কৃপাপ্রার্থী হইয়া ভক্তদের মধ্যে উপবেশন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই বাবা খেলা আরম্ভ করিয়া দিলেন।

বাবা। আমার নিকট কেন এসেছিস্? তুইও মানুষ, আমিও মানুষ; তুইও খাস্, আর বাহ্যে যাস্; আমিও খাই, আর বাহ্যে যাই!

অভয়াচরণ সাদাসিধা ধরণের লোক, ঘোরাল কথার তিনি ধার ধারেন না। বাবার উক্তিটি শুনিয়া তাঁহার অত্যন্ত দুঃখ হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে একটু ক্রোধেরও সঞ্চার হইল। তিনি কিঞ্চিৎ মাথা ঝাঁকাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "বুঝেছি, গোঁসাই, তুমি ধরা দিবে না। আচ্ছা!" ইহা বলিয়াই তিনি ব্রহ্মচারী বাবার সম্মুখে মাটির উপর তিন বার মাথা ঠুকিয়া প্রণাম করিয়া অভিমানের সহিত আশ্রম হইতে বাহির হওয়ার পথ ধরিলেন।

পূর্ব্বোক্ত উকিল ভক্তটিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি জানিতেন, পূর্ব্বদিন রাত্রে অভয়াচরণ সামান্য সরবৎ ভিন্ন অন্য কিছু গ্রহণ করেন নাই। অভয়াচরণ আশ্রম ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া, তাঁহার বড় দুঃখ হইল। তিনি আস্তে করিয়া বাবাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন, "ইনি গতকাল উপবাস করেছেন। আজ প্রসাদ না পেয়েই আশ্রম থেকে চলে যাচ্ছেন।"

উকিলবাবুর কথা কয়টি অভয়াচরণের কাণে গেল। তিনি

থামিলেন এবং বাস্তবিকই এবার ক্ষেপিয়া উঠিলেন ; পিছন ফিরিয়া তারস্বরে তর্জ্জনী সঞ্চালনে বলিতে লাগিলেন, "আমি ব্রাহ্মণের ছেলে, দু-এক দিন না খেয়ে থাকলেই বা তাতে কি আসে যায়। আর এমনই যদি খিদে পায়, তবে না হয়, তিন বাড়ী থেকে তিন মুটো চাল ভিক্ষা করে, কোন এক স্থানে রান্না করে খেলেই চলবে।" অভয়াচরণ পথ চলিলেন।

দৃশ্যটি দেখিয়া উপস্থিত ভক্তগণ হয়ত ভাবিলেন,—বাপরে! এ যে আসল কেউটে সাপের বাচ্চা!

অভয়াচরণের উক্তি শেষ হইলে, ব্রহ্মচারী বাবা উকিল ভক্তটিকে নিম্নস্বরে বলিলেন, "ইহার খাওয়া মিলবে।"

ঠিক এমন সময় একটি অল্পবয়সী মহিলা তাঁহার বিধবা মাতার সঙ্গে ব্রহ্মচারী বাবার পারণার জন্য স্বহস্তে পক্ক নানাবিধ অন্ন-ব্যঞ্জনাদি প্রস্তর থালা-বাটিতে সাজাইয়া আনিয়া ভক্তিভরে গোঁসাই বাবার সম্মুখে রাখিয়া দিলেন। অভয়াচরণ তখনও বেশী দূরে অগ্রসর হন নাই। বাবা তাঁহাকে একটু জোরে ডাকিলেন, "ওরে ব্রহ্মচারী, ফিরে আয়, তোর খাবার এসেছে।"

ব্রহ্মচারী বাবার স্নেহব্যঞ্জক আহ্বানে অভয়াচরণের ক্রোধ জল হইয়া গেল। তিনি সরাসরি আশ্রম-ঘরে প্রবেশ করিলেন। অন্ন-ব্যঞ্জনাদি সমেত থালা-বাটি তাঁহাকে দেখাইয়া দিয়া বাবা বলিলেন, "খা।"

অভয়াচরণ বাবার আদেশমত ভক্তি সহকারে কার্য্যে লাগিয়া গেলেন। তাঁহার প্রায় অর্দ্ধেক ভোজন হইয়াছে, এমন সময় ব্রহ্মচারী বাবা তাঁহাকে বলিলেন, "ওরে, এ যে কায়েতের মেয়েতে পাক করেছে রে!" ভক্তদের মধ্যে হাসির রোল উঠিল।

অভয়াচরণ স্বীয় কর্ম্মে রত থাকিয়াই উত্তর করিলেন, "আমি গোঁসাইর প্রসাদ গ্রহণ করিতেছি। চণ্ডালের মেয়ে পাক করিলেই বা দোষ কি!"

মনের কি জোর! হৃদয়ে কি বিশ্বাস! সাধু! ব্রহ্মচারী অভয়াচরণ, সাধু! তোমার মত ভক্ত অতি দুর্লভ! আর বাবা, তুমিও কতই না রসিকতা জান! অথবা রসিকতার ছলনায় এ তোমার লোকশিক্ষা!

পর দিন অভয়াচরণ পূর্ব্ববৎ বাবার সম্মুখ ভাগে মাটির উপর ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া ঢাকা হইতে আগত ভক্তদের সঙ্গে রওনা হইবেন, এমন সময় বাবা লোকনাথ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই যে সতের বৎসর পাহাড়-পর্ব্বত পরিভ্রমণ করেছিস্, যার জন্য ঘুরেছিস্, তা পেয়েছিস্?"

অভয়াচরণ উত্তর করিলেন, "না, পাই নাই।"

তখন লোকনাথ স্বীয় দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলীবেষ্টনে অভয়াচরণের ডান হাতের মণিবন্ধের উপর ভাগে ধরিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "যার জন্য ঘুরেছিস্, তা, তোর হাতে বেঁধে দিলাম, আর ঘুরতে হবে না। ঘুরলে কি হবে রে—কর্ম্মই ব্রহ্ম।"

অভয়াচরণ সর্ব্বাঙ্গে এক মহাশক্তির তরঙ্গ অনুভব করিলেন, তাঁহার মুখমণ্ডল প্রসন্ন দেখাইল।

ব্রহ্মচারী বাবার কোমল কর-স্পর্শে অভয়ানন্দ অন্তরে তাঁহার বহুকালের ঈপ্সিত বস্তুর অস্তিত্ব অনুভব করিলেন। দীক্ষাদান ও দীক্ষাগ্রহণ মণিবন্ধ-বন্ধনে সমাধা হইয়া গেল। "কর্ম্মই ব্রহ্ম"—উপদেশে বাবা লোকনাথ পলকে অভয়ানন্দকে কর্ম্মযোগী বানাইয়া দিলেন।

নূতন জীবন লাভ করিয়া অভয়ানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় স্বীয় আশ্রমে ফিরিলেন। এই সময় হইতে ভক্ত সমাগম দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। দর্শনার্থীদিগকে তিনি খুব গালিগালাজ করিতেন। এই দুর্ব্বাক্যের ভিতর দিয়াই করুণা লাভ করিয়া ভক্তগণ স্বগৃহে ফিরিত।

স্বীয় আশ্রমেই তাঁহার দেহ রক্ষার পর তাঁহার মন্ত্র-শিষ্য শ্রীমৎ ভারত ব্রহ্মচারী মহাশয় দীর্ঘকাল আশ্রম-জীবন যাপন করতঃ বহু শিষ্য সেবক ও ভক্ত রাখিয়া ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।

শালগ্রামের উপর পা-রাখা

বিক্রমপুর তেওটখালি-নিবাসী রাজমোহন চক্রবর্ত্তী ঢাকার ভাওয়াল রাজ-সরকারের মোকদ্দমা ইত্যাদি তদ্‌বির করার জন্য ঢাকা সহরে প্রধান মোক্তার ছিলেন। তিনি নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন। রাজ-সরকারের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করার পর, তিনি নিজ গৃহে ফিরিয়া ধর্ম্মালোচনা ও সাধন-ভজন আরম্ভ করিলেন। কিছু কাল পর দেখা গেল যে তাঁহার মস্তিষ্ক উগ্রভাবাপন্ন হইয়াছে। তিনি ঘোষণা করিতে লাগিলেন, "ঈশ্বর সকল প্রাণীতেই আছেন, সুতরাং আমার মধ্যেও আছেন, সুতরাং আমিই ঈশ্বর।" তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া ও আচার-ব্যবহার দেখিয়া লোকে ভাবিল, চক্রবর্ত্তী মহাশয় পাগল হইয়াছেন।

এক দিন তাঁহার এক প্রতিবেশী আসিয়া তাঁহার সহিত পূজা-অর্চ্চনা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রতিবেশীকে বুঝাইতে লাগিলেন যে, যেহেতু তিনি ঈশ্বর, সুতরাং তাঁহার নিকট দেবতার মূর্ত্তি বা শালগ্রাম বিগ্রহ ইত্যাদি হয় মাটি, নয় শীলা, তিনি এই সব মানেন না। প্রতিবেশী শালগ্রাম-ভক্ত ছিলেন। চক্রবর্ত্তীর এইরূপ সদম্ভ বাক্যে তাঁহার প্রাণে বড় আঘাত লাগিল। তিনি উত্তেজিত হইয়া চক্রবর্ত্তীকে বলিলেন, "তবে কি আপনি আপনার ঠাকুর-ঘরের শালগ্রামের উপর পা রাখিতে পারেন ?"

প্রতিবেশীর এই প্রশ্নবাক্য যেন পাগলকে নৌকা না ডুবাইয়া দিতে সতর্ক করিয়া দেওয়ার মত হইল।

"হ্যাঁ, খুব পারি," বলিয়া চক্রবর্ত্তী একলম্ফে সেখান হইতে উঠিয়া, এক দৌড়ে বাড়ীর ঠাকুর-মন্দিরে গিয়া প্রবেশ করিলেন এবং আসনস্থ শালগ্রাম চক্রের উপর তাঁহার বাঁ পাখানি রাখিলেন। "কি করেন! কি করেন!" বলিয়া বাড়ীর লোক ও ক্রমে পাড়ার লোক সেখানে একত্র হইল। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের স্ত্রী প্রমাদ গণিলেন। অন্যান্য সকলে প্রতিবেশীকে দোষারোপ করিতে লাগিল। চক্রবর্ত্তী কিয়ৎকাল পর শালগ্রামের উপর হইতে পা নামাইলেন বটে, কিন্তু ভাবের দিক দিয়া যথা পূর্ব্বং তথা পরম্-ই রহিয়া গেলেন। এ যেন বিষ্ণুবক্ষে ভৃগুপদ-রেখা।[১]

লোক-প্রমুখাৎ বারদীর ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মশক্তি ও অপার দয়ার কথা শুনিয়া উন্মত্ত স্বামীকে লইয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের স্ত্রী বারদীর আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বিশ্বাস লোকনাথ বাবা তাঁহার স্বামীকে রক্ষা করিবেন। চক্রবর্ত্তীকে দেখামাত্রই ব্রহ্মচারী বাবা তাঁহাকে বলিলেন, "প্রতিদিন আমার নিকট কত লোক আসিয়া নিজ নিজ অভীষ্ট ফল লাভ করিতেছে। আমি তো কখনও কাহারও নিকট নিজকে ঈশ্বর বলিয়া ঘোষণাও করি না, বা তাহার শালগ্রামের উপর পা রাখিয়া, তাহার মনে আঘাত ও দেই না।"

রোগীকে ঔষধে ধরিল,—রাজমোহন ব্রহ্মচারী বাবার বাক্যে সচেতন হইলেন।

১ মহর্ষি ভৃগু ব্রহ্মার মানসপুত্র। একদা তিনি ব্রহ্মা ও শিবের নিকট গমন করিয়া ইচ্ছা পূর্ব্বক তাঁহাদের অবমাননা করেন। ইহাতে তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইলে, তিনি তাঁহাদিগকে স্তব দ্বারা শান্ত করেন। পরে তিনি বিষ্ণুর নিকট গিয়া তাঁহাকে যোগ-নিদ্র অবস্থায় দেখিয়া তাঁহার বক্ষে পদাঘাত করেন। সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রা ভঙ্গের পর, মহর্ষির কোমল পদে আঘাত লাগিয়াছে, ভাবিয়া বিষ্ণু উঠিয়া তাঁহার পদ-সেবা করিতে আরম্ভ করেন। বিষ্ণু সেই পদাঘাত চিহ্ন চিরকাল বক্ষে ধারণ করেন; আর মহর্ষিও বিষ্ণুকে দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করেন।

বড় কাঁটাল, ছোট কাঁটাল

লোকনাথ বাবার শিষ্য রজনী ব্রহ্মচারী মহাশয়ের ঢাকা উয়াড়ী আশ্রমে লোকনাথ বাবার অলৌকিক শক্তি ও অসীম করুণার প্রসঙ্গাদি কতিপয় ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে আলোচিত হইতেছে। ভক্তদের মধ্যে এক জন বলিতে আরম্ভ করিলেন ঃ—

কিছু কাল পুর্ব্বের কথা। আমার এক বন্ধু ও আমি ব্রহ্মচারী বাবার নাম শুনিয়া বারদী যাইয়া তাঁহার দর্শন লাভ করিব স্থির করিলাম। নির্দ্দিষ্ট দিনে আমরা নারায়ণগঞ্জে পৌঁছিলাম। জ্যৈষ্ঠ মাস, প্রখর রোদ, পথও সাত আট মাইলের কম নয়—পদব্রজে যাইতে হইবে। দেবতা বা সাধু দর্শনে শূন্য হাতে যাইতে নাই। বাজার হইতে আমরা দুইটি কাঁটাল কিনিলাম—একটি অপরটি অপেক্ষা কিছু বড়।

আমরা লাঙ্গলবন্ধে পৌঁছিলাম, অর্দ্ধেক পথ আসিয়াছি। স্থানটি অতি মনোরম। ব্রহ্মপুত্রনদ বহিয়া চলিয়াছে—তীরে বহু দেব-দেবীর মন্দির। একটি শান-বাঁধান-ঘাটে বটগাছের নীচে বসিয়া আমরা বিশ্রাম লাভ করিতেছি। কাঁটাল কেনার সময়ই আমাদের স্থির হইয়াছিল, একটি আশ্রমে নিব, অপরটি রাস্তায় নিজেরা খাইব। আরও বেশ কিছু পথ চলিয়া যাইতে হইবে ভাবিয়া, বোঝা হিসাবে কাঁটালের বড়টি কমানোই আমার একান্ত ইচ্ছা, বিশেষ মানুষও দুই জন, বেলাও কেবল কম হয় নাই।

সঙ্গীয় বন্ধুটি এবিষয়ে ঘোর আপত্তি জানাইয়া আমাকে দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, "সাধু দর্শনে যাইতেছি, বিশেষতঃ কেনার সময় ছোটটি সাধুর জন্য, আর বড়টি নিজেদের জন্য—এইরূপ ভাবিয়া কেনা হয় নাই। এক্ষেত্রে আমার বিবেচনায়, বড়টিই সাধুর জন্য নেওয়া উচিত।"

আমি বন্ধুর মতে মত দিতে বাধ্য হইলাম। বেলা প্রায় আড়াই প্রহরের সময় আশ্রমে পৌঁছিলাম, এবং কাঁটালটি বাবার সম্মুখে রাখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। "মা, মা," বলিয়া তিনি ডাকিতেই মা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাবা তাঁহাকে কাঁটালটি ভাঙ্গিয়া আনিতে বলিলেন। আমার বড় আনন্দ হইল, ভাবিলাম, পরিশ্রম সার্থক। বাবা আমাদের বস্তুটি গ্রহণ করিলেন।

কিয়ৎকাল পর মা কাঁটালটি ভাঙ্গিয়া কোষগুলি একখানা পাথরের থালায় করিয়া আনিয়া দিলেন। আমরা স্থিরচিত্তে বসিয়া আছি। থালাটি দেখাইয়া দিয়া বাবা আমাকে বলিলেন, "খা"।

তাঁহার এই "খা" বাক্যে আমার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। গুরুতর অন্যায় করিয়াছি ভাবিয়া আমি ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া গেলাম। অনুতপ্ত হৃদয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে অপরাধ স্বীকার করিয়া আমি তাঁহার শ্রীচরণে ক্ষমা ভিক্ষা চাহিলাম। তিনি স্নেহ-পূর্ণ বাক্যে বলিলেন, "সাধুর নিকট ছোট বড় সবই সমান। বড়টি তোর খাওয়ার যখন ইচ্ছা হয়েছিল, তা খেয়ে, ছোটটি আনলেই হ'ত। যাতে স্পৃহা জন্মেছে, এমন বস্তু আশ্রমের সেবায় লাগে না।"

ব্রহ্মচারী বাবার এই আশ্বাস ও উপদেশ বাক্য সত্ত্বেও থালায় রক্ষিত কাঁটাল স্পর্শ করিতে আমার সাহস হইল না দেখিয়া অন্তর্য্যামী নিজ হস্তে কয়েকটি কোষ লইয়া আমার হাতে দিলেন। অবশিষ্ট উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করা হইল।

অকালে পাকা কাঁটাল

অনাথবন্ধু মৌলিক মহাশয় ঢাকা জগন্নাথ কলেজের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট্‌ ছিলেন। তিনি মিতভাষী ও সাত্ত্বিক-প্রকৃতি। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের মুখে ব্রহ্মচারী লোকনাথের অসীম শক্তির কথা শুনিয়া, তাঁহার একান্ত বাসনা হইল—তিনি তাঁহাকে

দর্শন করিতে যাইবেন। জগন্নাথ কলেজের নিকটেই ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ উকিল রমাকান্ত নন্দী মহাশয়ের বাসস্থান। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র কালীকান্ত পুলিশের ইন্স্‌পেক্‌টার্‌। কালীকান্ত মৌলিক মহাশয়ের সঙ্গী হইলেন। তাঁহারা উভয়ে বারদীর আশ্রমে উপস্থিত হইয়া বাবা লোকনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলাপাদি করিলেন। ব্রহ্মচারী বাবার অলৌকিক শক্তির কথা গোস্বামী মহাশয়ের মুখে শুনিয়া এবং এখন তাঁহাকে চাক্ষুস দর্শন করিয়াও মৌলিক মহাশয়ের মনে সম্পূর্ণ অবস্থা আসিল না। তিনি ইহা পরীক্ষা করিবেন—ভাবিলেন। তখন পৌষ মাস, সহজে কাঁটাল পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। তাঁহার মনে কি একটা খেয়াল চাপিল,—যদি আজ আশ্রমে আহারের সময় পাকা কাঁটালে তাঁহাদের আতিথ্য করা হয়, তবে বুঝা যাইবে মহাপুরুষের শক্তির মহিমা।

আহারের সময় উপস্থিত। তাঁহারা উঠিয়াছেন আহার করিতে যাইবেন, ঠিক এমন সময় মৌলিক মহাশয় দেখিতে পাইলেন—একটি লোক সুবৃহৎ এক কাঁটাল মাথায় করিয়া গোসাঁইকে দেওয়ার জন্য আশ্রমে প্রবেশ করিতেছে। কাঁটালটি[১] আশ্রমের বারান্দায় রাখিয়া গোসাঁই বাবাকে প্রণাম করিয়া লোকটি চলিয়া গেল। বাবা তখন ভজলেরামকে ডাকিয়া বলিলেন, “এই কাঁটালটি ভাঙ্গিয়া আহারের সময় এই ভদ্রলোক ছুটিকে দিতে মাকে বল্‌।”

মৌলিক মহাশয়ের সমস্ত সন্দেহ দূর হইল, এবং তিনি ব্রহ্মচারী বাবার এক জন বিশেষ ভক্ত হইলেন।

“এত খিচুড়ী কে খাবেরে!”

একদা বারদী-নিবাসী ভক্তপ্রবর কুঞ্জলাল নাগ[২] ও অরুণকান্ত নাগ সন্ধ্যাকালের কিছু পর বাবার আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সবিস্ময়ে দেখিলেন, তখন পর্য্যন্ত আশ্রম ঘরের দরজা খোলা,

১ পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা অঞ্চলে বার মাস ফল ধরে এমন কাঁটাল গাছ মাঝে মাঝে দৃষ্ট হয়।
২ তখন তিনি ঢাকা জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ।

এবং ব্রহ্মচারী বাবা স্বহস্তে চাল-ডাল ইত্যাদি পরিমাণ করিয়া মাকে বুঝাইয়া দিতেছেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "কুঞ্জ, অরুণ, তোরা খেয়ে আসিস্নিরে। খিচুড়ী খেয়ে যাবি।" কুঞ্জলাল বাবু ও অরুণ বাবু সম্মুখে দাঁড়াইয়া দেখিলেন—তখনকার মত প্রয়োজনের অনেক বেশী চাল-ডাল দেওয়া হইল। যথাসময়ে খিচুড়ি প্রস্তুত হইলে, কুঞ্জলাল বাবু পরিমাণ দেখিয়া ব্রহ্মচারী বাবার সম্মুখেই অরুণ বাবুকে বলিলেন, "এত খিচুড়ী কে খাবেরে, অরুণ!" তখন পর্য্যন্ত আশ্রমে অতিথি-অভ্যাগত তাঁহারা দুই জন ব্যতীত অন্য কেহ নাই।

কুঞ্জলালবাবু "এত খিচুড়ীর" রহস্য উদ্ঘাটন করিতে পারিতেছেন না, অথচ তিনি জানেন ব্রহ্মচারী বাবা অমিতব্যয়ী হইতে পারে না। তাই তরুণবাবুকে উদ্দেশ্য করিয়া তিনি এই কথা বলিলেন। তাঁহার আসল উদ্দেশ্য বাবার নিকট হইতে বিষয়টি জানিয়া লওয়া। কিন্তু বাবা নীরব রহিলেন।

তাঁহারা উভয়েই প্রসাদ পাইয়া, বাবাকে প্রণাম করিয়া বাড়ী অভিমুখে রওনা হইলেন। তখন রাত্রি প্রায় দশটা, গ্রামাঞ্চলে বিশ্রামকাল। কুঞ্জবাবুর মনে কিন্তু "এত খিচুড়ীর" সমস্যা তখনও সম্পূর্ণ বিদ্যমান, কারণ প্রসাদ মাত্র তাঁহারা দু-জনেই পাইলেন। বাবা সময় সময় হাসি-তামাসা করিয়া বলিতেন, "ভক্তের চেয়ে ভোক্তা বেশী।" কৈ আজ ত ভোক্তারও অভাব দেখা যাইতেছে। তাঁহারা বেশী দূর যান নাই, এমন সময় বাবা তাঁহাদিগকে ডাকাইলেন। তাঁহারা ফিরিয়া সম্মুখে আসিলেন, তিনি কুঞ্জবাবুর দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "এত খিচুড়ী কে খাবেরে?"

কুঞ্জবাবু বুঝিলেন—বাবা তাঁহার সঙ্গে ব্যঙ্গ করিতেছেন। ঠিক এমন সময় চল্লিশ জন অতিথির একটি দল আসিয়া আশ্রমে উপস্থিত। তাহারা বাবাকে প্রণাম করিয়া সেই রাত্রি আশ্রমে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। কুঞ্জবাবু এতক্ষণে খিচুড়ীর রহস্য

উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হইলেন—তাঁহারা তুজন উপলক্ষ মাত্র,—আসলে এই অতিথিদল।

"জাতির নিশ্চয়তা নেই।"

ঢাকা জিলার ভাওয়াল জয়দেবপুরের স্বনামধন্য রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী বাহাতুর বিভিন্ন সম্ভ্রান্ত লোক মুখে বারদীর ব্রহ্মচারীর কথা শুনিয়াছেন। তাঁহাকে দর্শন করার জন্য তাহার একান্ত আগ্রহ ও কৌতূহল। স্থির হইল তিনি তাঁহার প্রধান প্রধান আমলা-কর্ম্মচারী সহ বারদীর আশ্রমে যাইবেন। প্রশ্ন উঠিল—সাধুর পদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করা হবে কিনা। আমলা কর্ম্মচারিগণ প্রকাশ করিলেন যে, তাঁহারা পায়ের ধূলি লইয়া সাধুকে প্রণাম করিবেন। আর রাজা-বাহাতুর নিজে? এই বিষয় লইয়া অনেক বাদানুবাদ হইল। অবশেষে রাজা-বাহাতুর স্বয়ং প্রকাশ করিলেন, "সাধুর জাতির[১] যখন নিশ্চয়তা নেই, তখন ভূমিষ্ঠ হ'য়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম বা পদধূলি গ্রহণ করা চলবে না।"

যথাসময়ে রাজা-বাহাতুর নিজ লঞ্চে বারদী মেঘনা ঘাটে পৌঁছিলেন। স্থলপথে ঢাকা হইতে তাঁহার একটি হস্তী পূর্ব্বেই বারদীঘাটে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। শোভাযাত্রা করিয়া হস্তিপৃষ্ঠে রাজা-বাহাতুর আশ্রম অভিমুখে চলিলেন—সাধু দর্শনে। রাস্তার উভয় পার্শ্বে গ্রামাঞ্চলের লোকে লোকারণ্য,—তাহাদের প্রথম হস্তী দর্শন, তারপর রাজদর্শন। আশ্রমের সম্মুখে আসিয়া তিনি হস্তিপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজে আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। কে জানে, কোন্ যাতুমন্ত্রবলে সন্ন্যাসীকে দর্শন করা মাত্র রাজা-বাহাতুর ক্ষণেকের জন্য ভুলিয়া গেলেন যে তিনি রাজা ও ব্রাহ্মণ। সাধুর নিকটস্থ হওয়ামাত্র, সকলের পূর্ব্বে তিনিই

১ রাজা-বাহাতুর স্বয়ং ব্রাহ্মণ-বংশসম্ভূত।

মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় ভূমিষ্ঠ হইয়া, ব্রহ্মচারী বাবাকে প্রণাম করিলেন, এবং তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। ব্রহ্মচারী ঈষৎ হাসিয়া তাঁহাকে স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "কেন বাপ, প্রণাম করবে না বলে তো স্থির করে এসেছিলে।"

রাজা-বাহাদুর তো অবাক্! আমলা-কর্ম্মচারিগণ ততোধিক! সকলেই বুঝিলেন—সন্ন্যাসী অন্তর্য্যামী। রাজা স্বয়ং ব্রহ্মচারী বাবার এক জন প্রধান ভক্ত হইলেন। অতঃপর তিনি তাঁহার বৈষয়িক, শারীরিক, আধ্যাত্মিক বিষয়াদি লইয়া অনেক বার আশ্রমে আসিয়াছেন এবং ব্রহ্মচারী বাবার আদেশ ও উপদেশ গ্রহণ করিয়াছেন।

কেনা-বেচা

ঢাকার সুবিখ্যাত সরকারী উকিল রায় ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর তাঁহার আট দশ জন বন্ধুসহ নারায়ণগঞ্জ হইয়া নৌকাযোগে ব্রহ্মচারী বাবার দর্শন লাভ মানসে বারদীর আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। হয় ত তাঁহাদিগকে পরীক্ষা করার জন্যই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক, ব্রহ্মচারী বাবা প্রথম আলাপে তাঁহাদের প্রতি খুব কঠোর ভাব দেখাইলেন। রায় বাহাদুর বিচক্ষণ ব্যক্তি, সুতরাং মহাপুরুষের এইরূপ ব্যবহারে তিনি আপন মন ঠিকই রাখিলেন--বিরক্তি আসিতে দিলেন না। কতক ক্ষণ পরই তাঁহাদের উপর ভাব বদলাইয়া গেল, এবং ব্রহ্মচারী বাবা শান্তমুর্ত্তি হইলেন।

আহারের সময় উপস্থিত। ব্রহ্মচারী বাবা স্বয়ং তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত থাকিয়া মায়ের পরিবেশনে তাঁহাদিগকে আহার করাইতেছেন। রায় বাহাদুর বহুকাল যাবৎ উদরাময় রোগে ভুগিতেছিলেন; আহারের শেষ ভাগে, তাঁহার জন্য ব্যবস্থা হইল

বড় একবাটি ঘন দুধ ও কয়েকটি সুপক্ক সবরি কলা[১]। রায় বাহাদুরের অবস্থা তো সুকঠিন! একে ত উদরাময়, তাতে আবার বাটীভরা দুধ-কলা; উদরস্থ করাও সঙ্কট, উপেক্ষা করাও সঙ্কট, কারণ ব্রহ্মচারী বাবা নিজে সম্মুখে দাঁড়াইয়া।

অবশেষে যা করেন ব্রহ্মচারী—ভাবিয়া, তিনি উপস্থিত বাটির সবটুকুই যথাস্থানে প্রেরণ করিলেন। পরে জানা গিয়াছিল যে ব্রহ্মচারী বাবার এই ব্যবস্থায় রায় বাহাদুর দীর্ঘকাল পোষা উদরাময়ের কবল হইতে উদ্ধার পাইয়াছেন।

ভোজনান্তে তাঁহারা আঙ্গিনার বিল্ব বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগকে সেই দিনই রওনা হইতে হইবে। রায় বাহাদুর মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—তাহারা এতগুলি লোক ব্রহ্মচারী বাবার আশ্রমে আহার করিলেন; সুতরাং তাঁহাকে কিছু দেওয়া নিতান্ত সঙ্গত। বিশেষতঃ সামাজিক নিয়ম অনুসারেও, ব্রাহ্মণ বাড়ীতে খাইলে, প্রণামিস্বরূপ ব্রাহ্মণকে কিছু দেওয়ার বিধান আছে। তাঁহার বন্ধুদের মধ্যে দু-এক জনের সঙ্গে আলাপে তিনি দেখিলেন, তাঁহার এই সাব্যস্ত অসঙ্গত হয় নাই। বিদায় হওয়ার পূর্ব্বে ব্রহ্মচারী বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সময় তাঁহাকে কিছু দিয়া যাইতে হইবে স্থির হইল।

রওনা হইতেছেন, সুতরাং তাহারা সকলেই ব্রহ্মচারী বাবাকে প্রণাম করিতে আসিলেন। রায় বাহাদুর ইতঃপূর্ব্বেই তাঁহার জামার পকেটে পাঁচটি টাকা এমনভাবে রাখিয়া ছিলেন যেন হাত দিলেই পাওয়া যায়। বাবার সম্মুখীন হওয়া মাত্রই, তিনি রায় বাহাদুরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "উকিলবাবু, ইহা উদাসীর আশ্রম, গৃহী ব্রাহ্মণের বাড়ী নয়। এখানে যা কিছু দেখছ, সবই তোমাদের, আমার কিছুই নয়। তোমরা দয়া করে এসে,

১ মর্ত্তমান বা মালভোগ কলা। পূর্ব্ববঙ্গে 'সবরি কলা' বলা হয়।

নিজেদের জিনিষপত্রেই আমোদ আহ্লাদ করে গেলে। এমন কাজ করো না, যাতে কেনা-বেচা হয়।"

রায় বাহাদুর স্পষ্ট বুঝিলেন যে বাবা তাঁহার মনের ভাব জানিতে পারিয়া, তাঁহাকে টাকা দিতে নিষেধ করিতেছেন। তাঁহার মন বিস্ময় ও ভক্তিতে ভরিয়া গেল।

"যদি এই ঘরখানা ঝাড় দিতে পারতাম!"

বারদীর অরুণকান্ত নাগ মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা সরলা নাগ মহোদয়ার যখন সতর কি আঠার বৎসর বয়স, তখন এক দিন তিনি তাঁহার এক নিকট আত্মীয়ার সঙ্গে গোসাঁই বাবার আশ্রমে তাঁহাকে দর্শন করিতে যান। ভক্তিমতী আত্মীয়াটি আশ্রমের সীমানায় যাইয়া প্রথম একবার মাটি স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন; পরে আশ্রম ঘরের বারান্দার সিঁড়িতে প্রণাম ও তৎপর আশ্রম ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া গোসাঁই বাবার চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতেই বাবা বলিয়া উঠিলেন, "অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ?" ভদ্র মহিলা বাবার গালি খাইয়া হাসিয়া ফেলিলেন। সঙ্গীয়া বধূটি বাবাকে একবারই প্রণাম করিয়া চুপ করিয়া একধারে বসিয়া রহিলেন। ঘরখানার মেজেটি তখন আশ্রমের ভজলেরাম ঝাড় দিতেছিল। বধূটির একান্ত ইচ্ছা হইল, "যদি এই ঘরখানা ঝাড় দিতে পারতাম!" ঠিক এই সময় অন্তর্য্যামী বাবা ভজলেরামকে অন্য একটি কাজে পাঠাইলেন। কাজটি অসমাপ্ত দেখিয়া, সঙ্গীয়া আত্মীয়ার ইঙ্গিত অনুমোদনে, তিনি অতি সযত্নে স্বীয় অভিলাষ পূর্ণ করিতে লাগিলেন। ঝাড় দিতে দিতে ক্রমশঃ তিনি বাবার আসনের নিকট আসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। বৌমা তাঁহার আসন তুলিয়া পরিষ্কার করিতে চাহিতেছেন বুঝিতে পারিয়া, বাবা আসন হইতে উঠিয়া পার্শ্বেই দাঁড়াইলেন।

৮

এবার আসন পরিষ্কার আরম্ভ হইল। বৌমা দেখিলেন—হাতে প্রস্তুত ছোট ছোট নানা কারুকার্য্য-খচিত কাপড়—আসনের নীচে আসন, তার নীচে আসন, তার নীচে আসন ইত্যাদি। আর প্রত্যেক আসন তুলিতে গিয়াই তিনি দেখিতে পাইলেন নীচে পাতা আসনের উপর পয়সা, ডবল-পয়সা, দু-আনি, চার-আনি, আধুলি, টাকা ধূলামাখা অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। সর্ব্ব-নিম্ন আসনের পর মেজের জমি কিঞ্চিৎ বসিয়া গিয়া ছোট একটি মুখ-ছড়ান গর্ত্তের আকার ধারণ করিয়াছে; এখানেও পয়সা দু-আনি ইত্যাদি। বাবার সঞ্চিত ধনরাশি বৌমা একত্র করিলেন, এবং সব কয়টি আসনই যথাসম্ভব পরিষ্কার করিয়া পুনরায় সযত্নে পাতিয়া দিলেন। তারপর বাবার আদেশক্রমে তিনি ঐ সকল টাকা-পয়সা অঞ্জলিপুটে তুলিয়া তুলিয়া একটা মৃন্ময় ঘটে রাখিয়া দিলেন। বৌমার সুনিপুণ কাজ দেখিয়া বাবা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন।

শ্রীযুক্তা সরলা নাগ মহাশয়ার বয়স বর্ত্তমানে নব্বইর কাছা-কাছি[১]। তিনি তাঁহার পুত্র শ্রীসুপতিরঞ্জন নাগ মহাশয়ের নিকট কলিকাতার তিলজলা লেনে অবস্থান করিতেছেন। তিনি বলিলেন, "সেই বধূ অবস্থায় শ্রীশ্রীগোসাঁই বাবার আসন পরিষ্কার করা অবধি আমার হাত সব সময়ই ভরা থাকে।" তাঁহার পুত্র শ্রীসুপতিরঞ্জনও বলিলেন, "মায়ের নিকট চেয়ে টাকা পাই নাই, এমন অবস্থা আজ পর্য্যন্ত কখনও হয় নাই।"

শ্রীযুক্তা সরলা নাগ আরও বলিলেন, "টাকা পয়সাই জীবনের উদ্দেশ্য নয়, যদিও অধিকাংশ সময়ই ইহা আমাদের কার্য্য-সিদ্ধির উপায় মাত্র। গোসাঁই বাবার আসন পরিষ্কার করা ও টাকা পয়সা গুছায়ে রাখার স্মৃতিটুক আমার জীবনের এই শেষ অধ্যায়ে আমাকে বড়ই আনন্দ দেয়।"[২]

১ ইংরাজি ১৯৬০ সনে লিখিত।
২ ভক্তিমতী শ্রীযুক্তা সরলা নাগ মহাশয়ার নিকট হইতে শ্রুত।

ভবিষ্যৎ দর্শন

"উহাকে রেখে যা"

মহাপুরুষ লোকনাথের নাম পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বত্র ঘরে ঘরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কুমিল্লা জিলার চাঁদপুর মহাকুমার প্রধান সহর চাঁদপুর একটি প্রসিদ্ধ বন্দর ও ষ্টীমার জংশন। ব্রহ্মচারী বাবার সিদ্ধির কথা শুনিয়া চাঁদপুরের চারি জন উকিল পৌষ মাসে বড় দিনের ছুটি উপলক্ষে বারদীর আশ্রমে আসিলেন। তাঁহারা যাহা শুনিয়া আসিয়াছিলেন, তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী আশ্রমে দর্শন করিলেন। স্থানটিও তাঁহাদের নিকট বড় ভাল লাগিল। তিন দিন আশ্রমের অতিথি-ভক্তরূপে তাঁহারা রহিলেন। তাঁহারা আরও কতক কাল এই পরম পবিত্র তীর্থে অবস্থান করিতে পারিলে আরও সুখী হইতেন; কিন্তু উপায় নাই, কারণ পরের দিনই তাঁহাদের কাছারী খুলিবে'। বাবার পদধূলি লইয়া তাঁহারা রওনা হওয়ার অনুমতি চাহিলেন। বাবা তাঁহাদিগকে সেই দিন অপেক্ষা করিয়া যাইতে পারেন কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু যখন তিনি পরদিন কাছারী খোলার কথা শুনিলেন, তখন তাঁহাদের এক জনকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, "অগত্যা উহাকে রেখে যা।"

মহাপুরুষের "রেখে যা" আদেশ অমান্য করা অনুচিত ভাবিয়া বন্ধুত্রয় চতুর্থ ব্যক্তিকে সেই দিন আশ্রমে থাকিয়া যাওয়ার জন্য অনুরোধ করিলেন। বন্ধুটি রহিয়া গেলেন, অপর তিন জন চলিয়া গেলেন।

সেই দিনই সন্ধ্যাবেলা আশ্রমে এই উকিল মহাশয় কলেরা রোগে আক্রান্ত হন। ব্রহ্মচারী বাবার ভবিষ্যদ্দৃষ্টির মহিমা বুঝিতে পারিয়া, রোগে আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও, তাঁহার মন সুস্থ ও সরল রহিল। কারণ মহাপুরুষের অযাচিত দয়ায় তাঁহার কোন ক্ষতি

হইতে পারিবে না,—এই ছিল তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস। আশ্রমবাসীদের যথোচিত সেবা-শুশ্রূষায় ও ব্রহ্মচারী বাবার চরণামৃতে, অল্প-সময়ের মধ্যেই রোগের প্রকোপ কমিয়া আসিল এবং যথাসময়ে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়া তিনি বাবার কৃপায় স্বস্থানে ফিরিয়া গেলেন।

জেলে ডিঙ্গীর আলোকমালা

পৌষ মাসের কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী রাত্রি। সন্ধ্যা বহিয়া গিয়াছে। চতুর্দ্দিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। পূর্ব্বকথিত রায়বাহাদুর ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ কয়েক জন বন্ধু ও দশ-বার জন লোকসহ এক বার বারদীর আশ্রম হইতে স্বীয় নৌকায় ফিরিলেন। নৌকা মেঘনা নদীর ঘাটে। সঙ্গীয় লোকজনের হাতে দুইটি লণ্ঠন বাতি। আশ্রম হইতে মেঘনার পথ তাঁহাদের প্রায় সকলেরই সুবিদিত। তবুও যেন কেন রওনা হওয়ার সময় ব্রহ্মচারী বাবা রায়বাহাদুরের সঙ্গে এক জন পথ-প্রদর্শক দেওয়ার প্রস্তাব করিলেন। রাস্তাঘাট ভাল ভাবেই জানা আছে বলিয়া রায়বাহাদুর লোক নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন না—এই কথা তিনি বিনীত ভাবে ব্রহ্মচারী বাবাকে জানাইলেন। তথাপি বাবা একথা ও কথার পর আরও দুই বার সঙ্গে লোক নেওয়ার জন্য তাঁহাকে বলিলেন। রায়বাহাদুরও অতি সসম্মানে বাবার প্রস্তাবের উত্তর দিয়া অবশেষে পথ-প্রদর্শক ছাড়াই রওনা হইলেন।

মুক্ত আকাশ-তলে সেই গাঢ় অন্ধকারের মধ্যেও পা-পাতা রাস্তার শুভ্র রেখাটি নিজেদের আলোর সাহায্যে তাঁহাদিগকে মেঘনা নদীর ঘাট অভিমুখে লইয়া যাইতেছে এই তাঁহাদের বিশ্বাস। গ্রামের প্রান্তস্থিত বন-জঙ্গল অতিক্রম করিয়া তাঁহারা খোলা-মাঠে আসিয়া পড়িয়াছেন এবং ঠিক রাস্তাই ধরিয়া চলিয়াছেন! এ কি! পদতলে রাস্তা যেন কেমন কেমন ঠেকিতেছে!

সমতল পথ ক্রমশঃই অসমতল মনে হইতেছে। প্রায় প্রতি পাদ-ক্ষেপেই হল কর্ষিত ভূমির ছোট বড় মাটির ডেলা তাঁহাদের পথচলা বড়ই অসুবিধা করিয়া তুলিল। তবুও তাঁহাদের বিশ্বাস তাঁহারা ঠিক পথেই চলিয়াছেন! অবশেষে অদূরে একটা আলো তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইল, তাঁহারা ভাবিলেন ইহা নদী-ঘাটে তাহাদের নৌকারই আলো; প্রাণে একটু জল আসিল। তাঁহারা সেই আলো ধরিয়া চলিলেন। অল্প ক্ষণ পরই ঐ আলোর সঙ্গে সারি বাঁধিয়া আরও অনেকগুলি আলো দেখা গেল। তাঁহারা আরও আশান্বিত হইলেন, ভাবিলেন, নদীবক্ষে সারিবদ্ধ জেলে ডিঙ্গীর আলোকমালা দেখা যাইতেছে। এবার নিশ্চিত হইলেন যে পথ ফুরাইয়া আসিয়াছে সম্মুখেই নদী ঘাট! যায় কতক কাল। কিন্তু কৈ, পথ তো ফুরাইতেছে না! আলোকমালার দূরত্বও তো কমিতেছে না! তখন দলের লোকজনদের মধ্যে দুই এক জনের সন্দেহ হইল, তবে কি তাহারা ভুলপথে চলিয়াছে? আলোগুলি কি তবে আলেয়া[১]? তাহাদের কয়েক জন মুখ ফুটিয়া বলিল, "বাবু, আমাদের আলেয়ায় পায়নি তো?" আলেয়া কথাটিতে সকলেরই চমক ভাঙ্গিল। রায়বাহাদুর ঘড়ি খুলিয়া দেখিলেন—আধ ঘণ্টার রাস্তায় এক ঘণ্টার উপর অতিক্রান্ত হইয়াছে, তবুও নদীঘাটের পাত্তা মিলিতেছে না। তখন "কে আছ"? "কে আছ?" বলিয়া সঙ্গীয় লোকজনের সাহায্যে কিছু ডাক-হাঁক ছাড়া হইল, কিন্তু বৃথা। নিঝুম মাঠের প্রতিধ্বনির ব্যঙ্গস্বর ছাড়া তাঁহারা আর কিছুই শুনিতে পাইলেন না।

১ আলেয়া—জল বা আর্দ্র ভূমি হইতে নিশাকালে উদ্গত বাষ্প আলোক [marsh gas] এই বাষ্প অত্যন্ত দাহ্য-পদার্থ। বায়ু প্রবাহে ইহা জ্বলিয়া উঠে, এবং পথিকের পদবিক্ষেপে বা অন্য কোনও সামান্য সঞ্চারণে বায়ু বিকম্পিত হইলেই এই আলোক ক্রমশঃ দূরবর্ত্তী হইয়া থাকে। তখন সাধারণ জল বা স্থলপথচারীর মনে হয় আলেয়া-অপদেবতা তাহাকে তাহার গন্তব্যস্থলে ঘুরপাক খাওয়াইতেছে।

বর্ত্তমান অবস্থায় তাঁহাদের থামিয়া যাওয়া বিপদ, অগ্রসর হওয়াও বিপদ। পৌষ মাসের খোলা মাঠের কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় প্রায় সকলেই কাতর। তবু তাহাদের পথ চলিতে হইল। এতক্ষণ পর সম্মুখে জঙ্গলের মত যেন কি দেখা গেল। জঙ্গলই বটে। যাক্, তাহা হইলে তাহারা মাঠের কিনারায় আসিয়াছেন। আকাশের তারকার ক্ষীণ আলোকে সম্মুখে একটা বস্তি দেখা গেল। আলোর সাহায্যে তাহারা একটা বাড়ীতে আসিয়া প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া দু-চারটা ডাক দেওয়ার পরই, একটা ঘরের দরজা খুলিয়া লণ্ঠন হস্তে একজন বৃদ্ধ মুসলমান বাহির হইলেন। আগন্তুকগণ কি চান—জিজ্ঞাসা করায়, রায়বাহাদুর তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন যে তাহারা বারদীর গোসাঁইর আশ্রম হইতে আসিতেছেন, বারদীর মেঘনার ঘাটে যাইবেন।

আগন্তুকের কথা শুনিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "আল্লাহ্! কোথায় বা গোসাঁইর আশ্রম, কোথায় বা মেঘনার ঘাট, আর কোথায় বা আপনারা আসিয়াছেন! আপনারা বারদী হইতে প্রায় তিন মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত একটা গ্রামে আসিয়া পড়িয়াছেন। এই গ্রামের পরেই বাঘাই জঙ্গল[১]। আর কিছু দূর গেলেই সেরেছিলেন আর কি!"

বৃদ্ধ তাহাদিগকে সমাদর করিয়া তাঁহার কাছারী ঘরে[২] বসাইলেন। তাঁহাদের কিছুকাল বিশ্রামের পর তিনি তাঁহার এক জন লোক দিয়া তাঁহাদিগকে মেঘনার ঘাটে পাঠাইয়া দিলেন। রায়বাহাদুর এবার আর কোন আপত্তি তুলিলেন না!

রাত্রিতে নৌকায় এ বিষয় লইয়া অনেক হাসি-তামাসা হইল। পরদিন সকাল বেলায় তাঁহাদের ঢাকা রওনা হওয়ার কথা ছিল; কিন্তু রওনা না হইয়া তাঁহারা পুনরায় আশ্রমে

১ যে জঙ্গলে বাঘ থাকে।
২ বাড়ীর বাহির-আঙ্গিনায় বসিবার ঘর।

গেলেন। রায়বাহাদুরকে দেখিয়াই বাবা বলিয়া উঠিলেন, "কেমন উকিলবাবু, গতরাত্রে জেলে-ডিঙ্গীর আলোকমালার অনেক তামাসা দেখলে! লোক নেওয়ার জন্য আমি তিন বার বলেছিলাম, তুমি তিন বারই আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে।"

রায় বাহাদুর অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন।

সমাজ-শিক্ষা

বাবা লোকনাথ জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ। তাঁহার দেহখানি যোগসিদ্ধ। এই দেহ মেরু অঞ্চলের বরফে অবশ হয় নাই, চন্দ্রনাথ পাহাড়ের দাবানলে[১] দগ্ধ হয় নাই। বারদী আগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি সমাজ-গণ্ডীর বাহিরে অবস্থান করিতেছিলেন; কিন্তু বারদী আসিয়া তাঁহাকে সমাজের বিধানসমূহ মানিয়া চলিতে হইল,—লোক দেখানর জন্য নয়, লোক শিখানর জন্য[২]। উন্মুক্ত আকাশতল ছিল তাঁহার আবাসস্থল, আর এখন হইলেন তিনি গৃহবাসী; ব্যবহারে ক্ষয়প্রাপ্ত যজ্ঞোপবীত তাঁহাকে পুনঃ নিবীত আকারে[৩] গ্রহণ করিতে হইল; সমাজের উপযোগী ন্যূনকল্পবাসে বিবস্ত্রদেহ আবৃত করিতে হইল; সুদীর্ঘকাল নিরন্ন জীবন-যাপন ব্রহ্মচর্য্যের উপযোগী আহার গ্রহণে অভ্যস্ত হইল: এক কথায় তদ্গতচিত্ত উদাসী লোকহিতার্থে আবার নির্লিপ্ত সামাজিক সাজিলেন,—দশের মধ্যে একজন হইলেন।

গোসাঁইর ভুল!

আশ্রমের অনতিদূরে মুচিপাড়ায় কয়েক ঘর মুচির বাস। তখনকার দিনে ব্যবসায়গত কর্ম্মের জন্য মুচিশ্রেণী সমাজে অনাদৃত ছিল। এই সমাজে একটি যুবক ছিল—অন্ধ ও কুব্জ; আর একটি

১ শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।
২ গীতা ৩।২০, ২১। ব্রহ্মচারী বাবা বলিতেন, "আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখাই।"
৩ মালার ন্যায়।

ছিল যুবতী—কুরূপা ও জড়বুদ্ধিসম্পন্না বা হাবী। যুবক বয়সে বড়, যুবতী ছোট। ইহারা দু-জনেই বন্ধু-বান্ধবহীন, অসহায়। ভিক্ষাবৃত্তি ইহাদের উপজীবিকা। রোজই প্রসাদের লোভে ইহারা দু-জনই আশ্রমে আসে ও প্রসাদ পায়। গোসাঁই বাবা আদর করিয়া ইহাদের নাম রাখিয়াছেন, "পেতা" আর "পেতী"[১]।

মহাপুরুষ দেখিলেন, অন্ধ ভিক্ষুক পেতার এক জন পরিচালকের দরকার। আর হাবী, সরলা পেতীকে উচ্ছৃঙ্খল সমাজ একটা বীভৎস নরকে পরিণত করার সম্ভাবনা। তিনি ভাবিলেন এই উভয়ের একত্র বন্ধনে উভয়েই একটা আশ্রয় পাইবে; সুতরাং তিনি আশ্রমের ব্যয়ে মুচি-সমাজের রীতি অনুসারে ইহাদের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া দিলেন। পেতা-পেতী সংসারী হইল। গোসাঁইর এই কার্য্যটিতে সমাজের কেহ কেহ তাঁহাকে বিদ্রূপ করিল, কিন্তু অধিকাংশ লোকেই ভাবিল, ব্রহ্মচারী বাবা দূরদর্শী সমাজ হিতৈষী।

পেতা-পেতীর দিন বেশ চলিতেছে। বাঁশের লাঠির এক মাথা পেতার ও অপর মাথা পেতীর হাতে,—এই অবস্থায় পেতী পেতাকে লইয়া বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা সংগ্রহ করিতে যায়। এখন ভিক্ষা ও পুরাতন কাপড়-জামার অভাব তো হয়ই না, বরং কোন কোন বাড়ীতে পেতা "গোসাঁইর মেয়ের বর" এই সম্বর্দ্ধনাটুকও পাইয়া থাকে,—ইহাতে অন্ধ পেতা অসীম আনন্দ, আর হাবী পেতী আত্মপ্রসাদ লাভ করে।

বিবাহের কয়েক দিন পর মুচি সমাজের নেতারা দেখিল— গোসাঁই একটা মস্ত বড় ভুল করিয়া বসিয়াছেন,—তিনি তো পেতা-পেতীর বিবাহের সামাজিক ভোজ, সভ্য ভাষায় যাকে বলে

১ গোসাঁই বাবার নামকরণও পাত্রোপযোগী:– ভজলেরাম বৌম ভোলা, পেতা, পেতী, কালাচাঁদ, আদরিণী।

"বৌভাত", দেন নাই; সুতরাং তাহাদের মতে এই বিবাহই অসম্পূর্ণ। তাহারা পেতাকে বলিল, "পেতা, সামাজিক খাওয়া দে, নইলে লোকে তোকে সমাজে নিব না।"

পেতা বড় বিব্রত হইয়া পড়িল। পেতী পেতাকে লইয়া ছুটিয়া আসিল তাহাদের গোসাঁইর নিকট। পেতা গোসাঁইকে বলিল, "গোসাঁই, হমাজিকেরা বিয়ার খাওন চায়, না ঐলে আমারে হমাজে লইত না।"

মুচি সমাজের দাবী স্বীকার করিয়া লইয়া বাবা বলিলেন। "হ্যাঁ, তারা চাইতে পারে। বল্ গিয়ে যে খাওন্ মিলবে।"

গোসাঁই বাবা প্রায় কুড়ি টাকা মূলের খাদ্য-দ্রব্যাদির এক ফৰ্দ্দ ধরিয়া আশ্রমের দোকানদারের নিকট পাঠাইয়া তাহাকে নির্দ্দেশ দিলেন যে পর দিন প্রাতে সে যেন পেতা-পেতীর চালাঘরে ঐ সকল জিনিষ উপস্থিত করে। সেই দিনই রাত্রিতে তিনি এক জন স্থানীয় ভক্ত পাঠাইয়া মুচি সমাজের স্ত্রী-পুরুষ সকলকে নিমন্ত্রণ করাইলেন, এবং মুচি সমাজের মোড়লের উপর পরদিনের "হমাজিক খাওন"-এর সব ভার অর্পণ করিলেন। পরদিন মহাসমারোহে মুচি-সমাজে পেতা পেতীর বিবাহের সামাজিক ভোজ সম্পন্ন হইয়া গেল। স্থানীয় লোক অনেকেই পরিদর্শকরূপে পেতা-পেতীর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া মুচি-সমাজের আনন্দ-বর্দ্ধন করিল।

গোসাঁইর কৃপায় ক্রমে পেতীর জড়ত্ব বুদ্ধির অনেকটা অবসান ঘটিল, এবং সতী-সাধ্বী হইয়া সে অন্ধ স্বামীকে লইয়া সংসার পত্তন করিল। কালক্রমে ইহারা একটি পুত্র সন্তানও লাভ করিয়াছিল।

পুরোহিত ঠাকুরের ফর্দ্দ

বারদী নিবাসিনী জনৈকা ভদ্রমহিলা দত্তক পুত্র রাখিবেন। এই উপলক্ষে যথাবিহিত ক্রিয়াকলাপও অনুষ্ঠানের জন্য প্রচলিত

রীতি অনুসারে তিনি তাহার কুলপুরোহিত ঠাকুরকে নিজের বাড়ীতে আনাইয়া প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রাদির এক ফর্দ্দ ধরিতে বলিলেন। গ্রামাঞ্চলের সামাজিক ক্রিয়াকল্পে সময় সময় দেখা যায় যে যজমানদের আর্থিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, পুরোহিতগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে শাস্ত্র-সম্মত দ্রব্যাদির ফর্দ্দ ধরিতে গিয়া, পরিমাণের মাত্রাটা বেশ একটু চড়াইয়া বসেন। পুরোহিতের এই ফর্দ্দ প্রায়ই যজমানের পক্ষে ছুঁচো গেলার মত হইয়া দাঁড়ায়; ফলে চতুর যজমানও ফর্দ্দ ঠিকই রাখে, কিন্তু আসলে কম মূল্যের নিকৃষ্ট জিনিষাদি আনিয়া দেবতা তথা পুরোহিতকে ঠকায়। এরূপ স্থলে পুরোহিত ঠাকুর যদি সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে তাল রাখিয়া অগ্রসর হন, তবে উভয়ের পক্ষেই মঙ্গল হয়। উপস্থিত ক্ষেত্রে পুরোহিত ঠাকুর ফর্দ্দ ধরিয়া আনিয়া যজমান ভদ্র মহিলাকে দিলেন। পুরোহিতের ফর্দ্দে সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে না পারায়, ভদ্রমহিলা ঐ ফর্দ্দ সঠিক হইয়াছে কিনা তাহা দেখার জন্য তাঁহার এক জন কর্ম্মচারীকে ফর্দ্দসহ লোকনাথ বাবার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। বাবা ফর্দ্দ দেখিলেন, এবং পুরোহিতকে তলব করিয়া পাঠাইলেন। পুরোহিত আসিলে তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "পুরোহিত, তোমার ফর্দ্দ দেখলাম। বস্ত্র ধরেছ পঁচিশ-খানা, হয়তো পঁচিশখানাই পাবে, কিন্তু ছোট ছোট, অব্যবহার্য্যও অল্প মূল্যের। আমার বিবেচনায় পঁচিশখানার স্থলে বারোখানায় ও কাজ চলতে পারে। তুমি যদি রাজি হও, তবে আমি তোমার যজমানকে বারোখানা দেওয়ার কথাই বলে দি। ইহাতে তোমারও লাভ হবে, যজমানও সুখী থাকবে।"

ব্রহ্মচারী বাবার উপদেশ অমান্য করা পুরোহিত ঠাকুরের পক্ষে সম্ভবপর নয়; সুতরাং তাঁহার প্রস্তাবই পুরোহিতকে গ্রহণ করিতে হইল, তিনি তখন পঁচিশখানার স্থলে বারখানা স্ত্রী-পুরুষের ব্যবহারযোগ্য পরিধেয়-বস্ত্র দেওয়ার জন্য কর্ম্মচারীটিকে বলিয়া

দিলেন। বাবার এই ব্যবস্থায় ভদ্রমহিলা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন, আর বাস্তবতার দিক্ দিয়া পুরোহিত ঠাকুরেরও ক্ষতি হইল না।

কুলগুরুদের কীর্ত্তি-কলাপ!

পূর্ব্ববঙ্গ ফরিদপুরের অন্তর্গত কার্ত্তিকপুর একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। এই গ্রামের রজনীকান্ত সেন আগরতলা মহারাজার শরীর-রক্ষী ছিলেন। তিনি স্বভাবতঃ উদ্ধত প্রকৃতির লোক, এবং তাঁহার ঔদ্ধত্যের ছাপ সর্ব্বদা তাঁহার মুখমণ্ডলে লাগিয়াই থাকিত। একবার তাঁহার অত্যন্ত আগ্রহ হইল, তিনি তাঁহার কুলগুরুর নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিবেন। কিছু কালের ছুটি লইয়া তিনি কর্ম্মস্থল হইতে দেশে আসিলেন। বাড়ী আসার অল্প কয়েক দিন পর গুরু-গৃহে যাইয়া তিনি জানিলেন—বৃদ্ধ পিতার স্বর্গারোহণের পর গুরু-পুত্রগণ বিষয়-সম্পত্তি ও শিষ্যকুলের ভাগাভাগি লইয়া নিজেরা ব্যস্ত। গুরুপুত্রদের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নিকট তিনি তাঁহার মন্ত্র গ্রহণের অভিলাষ প্রকাশ করায়, অন্যেরা ইহাতে তাঁহাদের ঘোর আপত্তি জানাইলেন। সেন মহাশয়ের মন্ত্র লওয়ায় বাধা পড়িল। গুরু-পুত্রগণ ভাবিলেন,—তাঁহারা শিষ্যমাত্রেরই কুল-উদ্ধারকারী, আর শিষ্যগণ জমা-জমির ন্যায় তাঁহাদের স্থাবর সম্পত্তি বিশেষ—হাতছাড়া হওয়ার মোটেই সম্ভাবনা নাই!

গুরু-পুত্রদের এই ব্যবহারে উগ্রমেজাজী রজনীকান্তের মনের ভাব একটু উষ্ণ হইল। তিনি ভাবিলেন,—গুরুত্যাগ করিলেই বা ক্ষতি কি? অনেক পূর্ব্বেই তিনি মহাপুরুষ লোকনাথ ব্রহ্মচারীর নাম শুনিয়াছিলেন। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন—কুলগুরু ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচারী বাবার নিকট হইতে মন্ত্রগ্রহণ করিবেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার মনে একটি প্রশ্নের উদয় হইল, তিনি চাহিলেই ব্রহ্মচারী বাবা তাঁহাকে মন্ত্র দিবেন কেন? নাও তো দিতে পারেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মাথায় একটা খেয়াল চাপিল—

পাগল-সাধুর বেশে তিনি আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। পাগল অথচ সাধু দেখিলেই মহাপুরুষের দয়া লাভ—অর্থাৎ গুরু বর্জ্জন ও গুরু গ্রহণ করা অতি সহজ হইবে। মাথায় ও মুখমণ্ডলে পাগল সাধুর লক্ষণাদি উত্তমরূপে গজাইলে, এক দিন তিনি ভদ্রবেশেই বাড়ী হইতে বারদী যাইতেছেন বলিয়া রওনা হইলেন। অত্যল্প জিনিষের মধ্যে সঙ্গে তাঁহার একখানা ছিন্ন কম্বলও আছে।

বারদী পৌঁছাইয়া তিনি বাজারে আসিয়া একটা দোকানে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। যথাসময়ে সেখান হইতে পাগল সাধু সাজিয়া তিনি আশ্রমে আসিলেন, এবং উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে নীরবে বসিয়া গেলেন। তিনি ব্রহ্মচারী বাবার পলকহীন চক্ষুর দিকে তাকাইয়া থাকিয়া তাঁহার দৃষ্টিপথে পড়ার চেষ্টা করিতেছেন। হঠাৎ ব্রহ্মচারী বাবার চক্ষু হইতে আগুনের মত একটা তেজ বাহির হইল, এবং তিনি তীব্রকণ্ঠে পাগল-সাধুকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "সরে যা এখান থেকে। তোর ঔদ্ধত্যের ছাপ আমার হৃদয়ে এসে লাগছে।"

কি সেই চাহনি, আর কি সেই উক্তি! উদ্দেশ্য সাধু হইলেও, সাধনের উপায়ে ভুল করিয়াছেন ভাবিয়া পাগল-সাধু অত্যন্ত ভীত হইলেন, এবং কাঁপিতে কাঁপিতে দূরে সরিয়া গিয়া অপরাধীর ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। কি ব্যাপার তাহা বুঝিতে না পারিয়া উপস্থিত সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেল! রজনীকান্ত বুঝিলেন গুরু-পুত্রদের উপর ক্রোধ করিয়া যে তিনি গুরুত্যাগের সঙ্কল্প করিয়াছেন ব্রহ্মচারী বাবার ভাষায় ইহাই প্রকাশ পাইতেছে। অল্প সময়ের মধ্যেই মহাপুরুষের সেই রুদ্রমূর্ত্তি প্রশান্ত হইল! সেন মহাশয় ধীরে ধীরে শান্তমনে পুনরায় তাঁহার নিকট আসিয়া বসিলেন, এবং তাঁহার বক্তব্য অতি বিনীত ভাবে ব্যক্ত করিলেন। ব্রহ্মচারী বাবার দয়া হইল। তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "যা, যেয়ে গুরু-পুত্রদিগকে বল, যদি আপনারা আপনাদের গৃহ-বিবাদ না মিটান এবং আমাকে

মন্ত্রদান না করেন, তবে আমি বারদীর গোসাঁই থেকে মন্ত্র গ্রহণ করব।”

ব্রহ্মচারী বাবার বাক্যলাভ করিয়া সেন মহাশয় বাড়ী ফিরিলেন, এবং তাঁহার আদেশমত সব কথা গুরু-পুত্রদিগকে বলিলেন। তাঁহারা বুঝিলেন—কথাটি মারাত্মক। প্রতিটি শিষ্য গুরুর নগদ টাকার সম্পত্তি। এক হাজার শিষ্য থাকিলে, মাথা পিছু কম পক্ষে দুই টাকা হারে বার্ষিকী গুরু-প্রণামী হইলেও, গুরুর বাৎসরিক কেবল গুরুপ্রণামী বাবদ প্রাপ্ত দুই হাজার টাকা নেয় কে? ইহার উপর একটু ওজন-ভারী শিষ্য হইলে তো কথাই নাই, নগদ বার্ষিকীর সঙ্গে গুরু বরণখানাও জুটিয়া যায়। অবশ্য প্রতিদানে শিষ্যের হিতসাধন গুরুর একান্ত কর্ত্তব্য, এবং তিনি তাহা করিয়াও থাকেন—যাহার তুলনায় শিষ্যের এই আর্থিক বার্ষিক ব্যয় অতি নগণ্য।

ব্রহ্মচারী বাবার এই ঔষধেই কাজ হইল—রজনীকান্তকে আর বারদীর আশ্রমে আসিতে হইল না।

বাবার আশ্রমটি জনসাধারণের সম্পত্তি—এই কথাই তিনি মনে করিতেন। এখানে সকলেরই সমান দাবী। অর্থক্লিষ্ট প্রকৃত প্রার্থী কখনও তাঁহার নিকট হইতে বিমুখ হইয়া ফিরিয়া যায় নাই। প্রতি শীতাগমে তিনি আশ্রম হইতে গরীব-দুঃখীকে বস্ত্র ও কম্বল বিতরণ করিতেন।

ইতর প্রাণীতে লোকনাথের দয়া
গোসাঁইর পরিবার!

ব্রহ্মচারী বাবার “আসন পরিষ্কার” প্রসঙ্গে উল্লিখিত অরুণ কান্ত নাগ মহাশয় বিষয়-কর্ম্মের ফাঁকে সময় পাইলেই বাবাকে দর্শন করিতে আসেন। আশ্রমে আসিয়া, বাবা ঘরের মধ্যে থাকিলে,

তিনি সরাসরি ঘরেই প্রবেশ করেন, অনুমতির দরকার হয় না। সে দিনও তিনি আশ্রমে আসিয়া অভ্যস্তমত ঘরে প্রবেশ করিতে যাইতেছেন, ঠিক এমন সময় বাবা তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "আসিস্ না এখন, ঘরে আমার পরিবার আছেরে, অরুণ।"

নাগ মহাশয় "আমার পরিবার" কথাটির অর্থ উদ্ধার করিতে না পারিয়া বারান্দায় দরজার সম্মুখে সসম্ভ্রমে থামিয়া গেলেন। কিয়ৎকাল পর বাবা পুনরায় বলিলেন, "এখন আসতে পারিস্।" নাগ মহাশয় অতি সন্তর্পণে ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন— ব্রহ্মচারী বাবার দৃষ্টি তখন পর্য্যন্ত দ্বারের নিকট একপার্শ্বে ঘরের মেজেতে নিবদ্ধ। তাঁহার চক্ষুও সেই দিকে পড়িল, এবং তিনি দেখিতে পাইলেন—বড় জাতীয় একদল কাল পিপীলিকা শ্রেণী-বদ্ধ হইয়া দরজার পার্শ্বদেশে, তিনি যে দিক দিয়া ঘরে প্রবেশ করিবেন, সেই দিক দিয়া পূর্ব্বদিকে চলিয়া গেল! তিনি যদি প্রথম অবস্থায়ই ঘরে প্রবেশ করিতেন, তবে তাঁহার পায়ের চাপে, ইহাদের অনেকেরই মৃত্যু ঘটিত। বাবার পরিবারের অর্থ নাগ মহাশয় এতক্ষণে বুঝিলেন, এবং তাঁহার মনে হইল আশ্রমের পরিবারভুক্ত এই সকল প্রাণী সম্ভবতঃ প্রসাদ-গ্রহণান্তে আপন আলয়ে ফিরিয়া চলিয়াছে।

কাকের কর্কশ রব

বারদীতে তখন একটি মধ্য-ইংরাজি বিদ্যালয় ছিল। এই বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন বিপিন বিহারী সরকার। পণ্ডিত মহাশয় খুব সদালাপী। তিনি প্রায়ই আশ্রমে আসিয়া গোসাঁই বাবার সঙ্গে বেশ আসর জমাইতেন একদিন আশ্রমের বারান্দায় বসিয়া বাবার সঙ্গে তাঁহার আলাপ চলিতেছে। আলাপ প্রসঙ্গ বেশ জমিয়াছে, এমন সময় একটি দাঁড়কাক আশ্রমের বিল্ববৃক্ষে আসিয়া বসিল, এবং উহার সাধ্যমত সুললিত কণ্ঠে "কা কা", "ক্যা

ক'য়ে" রবে মধু বর্ষণ করিতে লাগিল। পণ্ডিত মহাশয়ের কর্ণে এই কাক-সঙ্গীত বড়ই কর্কশ বোধ হইতে লাগিল এবং আলাপের ব্যাঘাত ঘটিতেছে মনে করিয়া, তিনি সম্মুখস্থ একটি ছোট ঢিল কুড়াইয়া লইয়া কাককে লক্ষ্য করিয়া ছুড়িলেন। প্রাণ-ভয়ে কাক উড়িয়া গিয়া অদূরে একটা আমগাছে বসিল। বাবা ইহা লক্ষ্য করিলেন। উৎপাত দূর হইল, এবং পণ্ডিত মহাশয় পুনরায় কথিত প্রসঙ্গে আলাপ চালাইতে লাগিলেন। নাছোড়বান্দা কাক আবার উড়িয়া আসিয়া বেলগাছে বসিয়া পূর্ব্ববৎ সুর ভাজিতে লাগিল। পণ্ডিত মহাশয়ের মনে হইতে লাগিল—এ যেন রামায়ণ-গানে ভূতের চেঁচা-মেচি। আলাপ-প্রসঙ্গ স্থগিত রাখিয়া তিনি এবার সক্রোধে উঠিলেন, এবং বাহিরে যাইয়া দাঁড়কাককে রীতিমত আশ্রমের চতুঃসীমা হইতে দূর করিয়া দিয়া, দিগ্বিজয়ীর ভাবে বাবার সম্মুখীন হইতেই বাবা তাঁহাকে বলিলেন, "পণ্ডিত, এই আশ্রম তোমার একার জন্য নয়। কাকের স্বর তোমার নিকট যেমন বিকৃত, তোমার স্বরও আমার নিকট তেমনি!"

পণ্ডিত মহাশয় কাকের প্রতি তাঁহার নিজের আচরণে অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইলেন। বিশ্বস্রষ্টার কোন প্রাণীকে ঘৃণা করার অধিকার যে তাহার নাই—মানুষ অনেক সময় এ কথাটা ভুলিয়া যায়।

কেউটে

বর্দ্ধমান-নিবাসী গৌরগোপাল রায় পুলিশের দারোগা। তিনি সিদ্ধ পুরুষ ভোলাগিরি বাবার শিষ্য। ব্রহ্মচারী বাবা লোকনাথের নাম শুনিয়া তাঁহার একান্ত ইচ্ছা হইল তিনি মহাপুরুষের দর্শনলাভ করেন। বারদীর আশ্রমে আসিয়া তিনি বারান্দায় বাবার নিকট উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় বাহির হইতে একজন মহিলা বাবার ভোগের জন্য ঘন দুগ্ধপূর্ণ একটি প্রস্তর পাত্র আনিয়া তাঁহার সম্মুখে

রাখিলেন, এবং প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন। কিছুকাল পর বাবা ডাকিলেন, "আয়, আয়।"

ব্রহ্মচারী বাবা কাহাকে ডাকিতেছেন, রায় মহাশয় ইহার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। চার-পাঁচ বার ডাকার পর, তিনি সবিস্ময়ে দেখিলেন—নিকটবর্ত্তী জঙ্গল হইতে একটি বড় বিষধর আসিয়া রায় মহাশয়ের নিকট বাবার পার্শ্বে ফণা বিস্তার করিয়া মাথা তুলিয়া তাঁহার স্নেহের অপেক্ষা করিতেছে। ইহার গলদেশের চক্রটি কি সুন্দর! কিন্তু "মণিনা ভূষিতঃ সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ঙ্করঃ" —প্রবাদবাক্যটি স্মরণ হওয়ায়, সর্পের সৌন্দর্য্যের চেয়ে উহার হিংসার ভাবটিই রায় মহাশয়ের মনে প্রবল হইয়া উঠিল। পরক্ষণেই তিনি ভাবিলেন যে তিনি মহাপুরুষ লোকনাথ বাবার অনেক ঐশ্বর্য্যের কথা শুনিয়াছেন। হয় তো উপস্থিতটি তাঁহার একটি বিভূতিমাত্র, ভয়ের কোন কারণ নাই। তাঁহার মন স্থির হইল। তিনি দেখিলেন ব্রহ্মচারী বাবা অতি ধীর ভাবে স্বীয় দক্ষিণ হস্তে কেউটের মস্তক ধরিয়া দুধভরা বাটির নিকট আনিয়া ছাড়িয়া দিলেন, এবং বলিলেন, "খা, মা।"

সর্প ইচ্ছামত দুধ পান করিয়া আবার ফণা তুলিয়া বাবার দিকে তাকাইলে, তিনি বলিলেন, "এখন আপন স্থানে চলে যাও।" সর্প চলিয়া গেল। ইহার পর দুগ্ধভাণ্ড হইতে অঙ্গুলির সাহায্যে কিঞ্চিৎ সর তুলিয়া লইয়া তিনি আপন মুখে দিলেন, এবং দুগ্ধপাত্রটির দিকে ঈষৎ মস্তক সঞ্চালন করিয়া রায় মহাশয়কে বলিলেন, "প্রসাদ নে।"

রায় মহাশয় বাবার প্রসাদ ভাবিয়া অসন্দিগ্ধচিত্তে ও ভক্তির সহিত উহা গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ বোধ করিতে লাগিলেন।

ত্রায়স্ব মাম্[১]

একদিন একটি বৃদ্ধ গলিতাঙ্গ কুকুর ব্রহ্মচারী বাবার ঘরের পশ্চিমাংশে আসিয়া শেষ শয্যা গ্রহণ করিল। ইহাকে ভোগের

১ আমাকে উদ্ধার কর
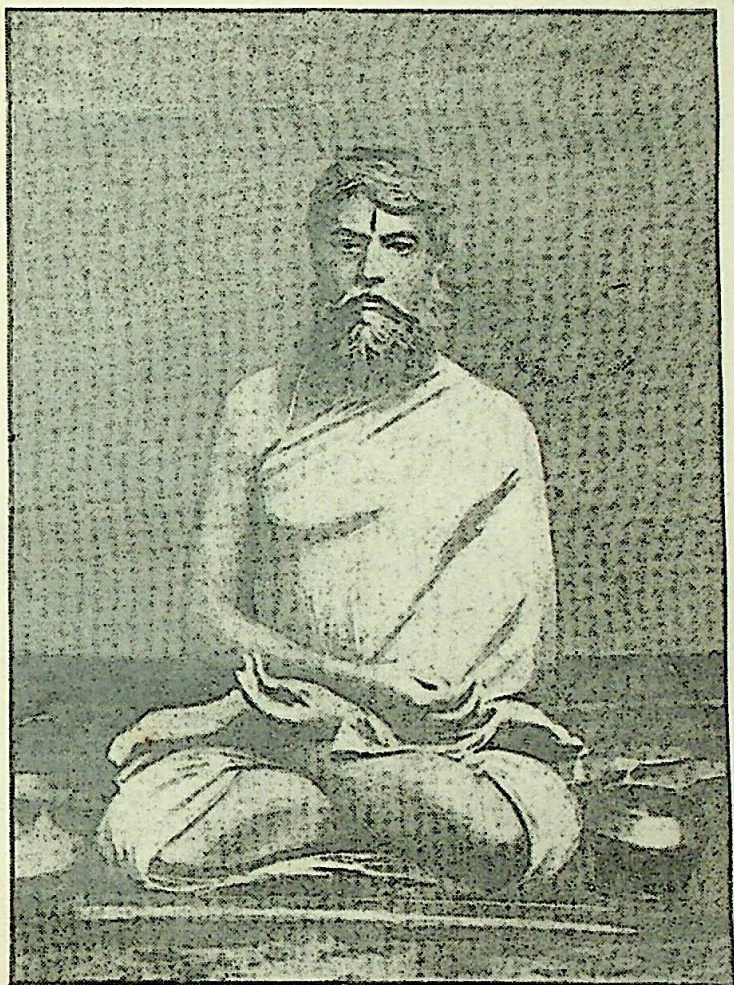
শ্রীমৎ রজনীকান্ত ব্রহ্মচারী

প্রসাদ দিতে যাইয়া মা দেখিলেন,—ইহার শেষ সময় উপস্থিত, মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে। মায়ের প্রাণ দুঃখে ভরিয়া গেল। তিনি বাবার নিকট আসিয়া বলিলেন, "বাবা, তুমি এত জীবের ব্যবস্থা করছ',—আর তোমার ঘরের পাশেই একটি কুকুর এত কষ্ট পাইতেছে! এ যে আর দেখা যায় না!

মায়ের কাতর বাক্য শুনিয়া তখনই দয়াল বাবা উঠিয়া বাহিরে কুকুরটির নিকট গেলেন, এবং স্বীয় দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি দ্বারা ইহার ভ্রূযুগলের মধ্যস্থিত স্থানটি স্পর্শ করিলেন। স্পর্শমাত্র কুকুর সকল ভব-যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিল।

শ্রীমৎ রজনী ব্রহ্মচারীর পরীক্ষায় পাশ

একবার শিষ্য রজনী ব্রহ্মচারী মহাশয় আশ্রমে গিয়াছেন। রাত্রিতে বিশ্রামের সময় তিনি ব্রহ্মচারী বাবার ঘরের দক্ষিণের বারান্দায় পশ্চিমাংশে বসিয়া জপ করিতেছেন। কোথা হইতে একটা লোম-হীন কুকুর সেখানে আসিয়া উপস্থিত। ইহার সর্ব্বশরীরে দুর্গন্ধযুক্ত ক্ষত। কুকুরটা বারান্দায় রজনী ব্রহ্মচারী মহাশয়ের অতি নিকট আসিয়া শুইয়া পড়িল, এবং থাকিয়া থাকিয়া আপন শরীর চুলকাইতে লাগিল। দুর্গন্ধে ব্রহ্মচারী মহাশয়ের জপে ব্যাঘাত ঘটিল। তিনি কুকুরটিকে কিছু না বলিয়া, নিজে উঠিয়া গিয়া বারান্দার পূর্ব্বদিকে বসিলেন। কুকুরও মহাজন-প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করিয়া পূর্ব্ববৎ ব্রহ্মচারীর আরও নিকটে গিয়া শুইয়া পড়িল। ব্রহ্মচারী ভাবিলেন,—ইহা আশ্রম, এখানে কুকুরের অধিকার তাঁহার অধিকারের চেয়ে কোন অংশে কম নয়, বরং বেশী, কারণ ব্রহ্মচারী যেখানে সেখানে আসন গ্রহণ করিতে পারেন, তাঁহাকে কেহ বাধা দিবে না। আশ্রমের

বাহিরে হইলে, কুকুরের এইরূপ ব্যবহারে "প্রহারেণ ধনঞ্জয়:"[১] হইত। সুতরাং তিনি আবার স্থান ত্যাগ করিয়া বারান্দায়ই অন্যত্র গিয়া বসিলেন। তিনি এবারও দেখিলেন, কুকুরটি প্রথম পরিচয়েই তাঁহাকে যেন আপন প্রভু-রূপে গ্রহণ করিয়া নিজে বিশ্বস্ত প্রভুভক্ত সাজিয়াছে। সুতরাং সে তাঁহার কাছ-ছাড়া থাকিতে পারে না। উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি এখন মনে মনে বাবার নিকট আপনার দুঃখ জানাইলেন, "তোমার প্রদত্ত নামটুকু পর্যন্ত আমাকে এখানে ব'সে জপ করিতে দিবেনা!"

এই তো ঠিক পন্থা, ব্রহ্মচারী। সঙ্গে সঙ্গে কুকুরেরও শুভ-বুদ্ধি উপস্থিত হইল। সে ভাবিল,—অল্প-পরিসর এই বারান্দা হইতে নির্ম্মল ও উন্মুক্ত আকাশতলের আশ্রম-আঙ্গিনা শত গুণে ভাল। বারান্দা হইতে উঠিয়া সে আঙ্গিনায় নামিয়া একটা খোলা জায়গায় আড়াই পাক ঘুরিয়া শুইয়া পড়িল।

রাত্রি প্রভাতে দরজা খুলিয়াই বাবা রজনী ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সঙ্গে রসিকতা আরম্ভ করিলেন, "কিরে, রাত্রিতে তোকে বুঝি মশায় খুব বিরক্ত করেছে?" অবশ্য মশা ছিল, তবে মশকের উৎপাতের চেয়ে কুকুরের ক্ষতশরীরের দুর্গন্ধ অসহনীয়। বাবার কথায় ব্রহ্মচারী একটু হাসিলেন। বাবা পুনরায় বলিলেন, "তুই ঠিকই করেছিস্। এরূপ ক্ষেত্রে নিজে স'রে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ।"

গর্ব্ব খর্ব্বঃ ব্রাহ্ম যুবকদ্বয়ের বীরত্ব

এই সময় ইংরাজযুগের ভারতবর্ষে নানা কারণে হিন্দুযুবকদের অনেকেই খৃষ্টান ধর্ম্মের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছিল, এবং স্বীয়ধর্ম্ম

১ শ্বশুরালয়ে প্রথম জামাতা হরিকে ঘৃতবিহীন অন্ন দেওয়ায়, দ্বিতীয় জামাতা মাধবকে আসন না দেওয়ায়, এবং তৃতীয় জামাতা পুণ্ডরীকাক্ষকে কদন্ন দেওয়ায়, তাহারা শ্বশুরবাড়ী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। চতুর্থ জামাতা ধনঞ্জয়কে শ্বশুরালয় হইতে বিতাড়িত করিতে প্রহারের প্রয়োজন হইয়াছিল।

হবির্বিনা হরির্যাতি বিনা পিঠেন মাধব। কদন্নৈঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ ॥

পরিত্যাগ করিয়া খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিল। এক দিকে সমাজ-জীবনের উপর হিন্দুধর্ম্মের কড়াকড়ি, বা যুবকদের বিবেচনায় বাড়াবাড়ি, আর অন্য দিকে খৃষ্টানদের সামাজিক উদারতা, বিশেষ করিয়া নারী-স্বাধীনতা—ধর্ম্মত্যাগ ও ধর্ম্মান্তর গ্রহণের পথ প্রশস্ত করিয়া দিতেছিল। হিন্দু ও খৃষ্টান এই উভয় ধর্ম্মের মাঝামাঝি ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুদের খৃষ্টানধর্ম্ম গ্রহণের স্রোতঃ অনেক পরিমাণে কমাইয়া দিল। ব্রাহ্মধর্ম্মের এই প্রবাহ সহর হইতে এমন কি সুদূর গ্রামে পর্য্যন্ত, ইংরাজি মতে শিক্ষিত পরিবারের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। বারদীতেও কোন কোন পরিবার ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ইহার প্রসারের চেষ্টা করিতেছিল। ব্রহ্মচারী লোকনাথ বারদীতে আসায়, স্থানীয় ব্রাহ্মরা দেখিলেন যে তাঁহাদের প্রচেষ্টায় বাধা পড়িয়া গেল। সুতরাং এই হিন্দু সাধুকে যে কোন ভাবে এখান হইতে তাড়াইয়া দিতে হইবে। দুইটি যুবক এই মহৎ কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিল। তাহারা স্থির করিল, "প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ" নীতিই এ ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট, কারণ সাধু সহজে এ স্থান ত্যাগ করিবার পাত্র নয়।

গভীর পূর্ণিমা রাত্রি। রাস্তাঘাট নির্জ্জন। চতুর্দ্দিক চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত—এই দুই বীর পুরুষ চলিয়াছে আশ্রম অভিমুখে। উদ্দেশ্য ইহাদের মহৎ ব্রাহ্মধর্ম্মের স্থানীয় কণ্টক উৎসাদন। হয় ত ইহাদের পদশব্দে দু একটি গ্রাম্য কুকুর স্বভাব বশতঃ তাড়া করিয়া আসিয়া থাকিবে, কিন্তু ইহাদের হাতে বংশদণ্ড দেখিয়া অগ্রসর হইতে আর তাহাদের সাহস হইলনা। এই দুই যুবক নীরবে কিন্তু অতি বীরদর্পে আশ্রমে প্রবেশ করিয়া হঠাৎ থ খাইয়া গেল। তাহাদের সর্ব্ব শরীর আড়ষ্ট, ন যযৌ ন তস্থৌ ভাব। তাহাদের সম্মুখে এক বাঘিনী পথ আটক করিয়া অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় যেন কাহার বা কাহাদের অপেক্ষা করিতেছে। যুবকদ্বয়কে দেখামাত্র সে উঠিয়া দাঁড়াইল। তবে কি এই বীরবরদ্বয়কে অভ্যর্থনা করার জন্য।

যাঁহাকে ইহারা শায়েস্তা করিতে আসিয়াছে মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার মূর্ত্তি এই সময় ইহাদের মনে পড়িল। আর ঠিক সেই সময়েই আশ্রম ঘরের ভিতর হইতে বাণী উত্থিত হইল, "মা, তুমি জঙ্গলে যাও, ওখানে তোমার আহার মিলবে।"

পরক্ষণেই বাঘিনী নিকটস্থ জঙ্গল অভিমুখে আস্তে আস্তে চলিয়া গেল। যুবকদ্বয় কি করিতে আসিয়াছিল, তাহারা যেন তাহা ভুলিয়া গেল। বিস্ময় ও ভক্তিতে তাহাদের হৃদয় ভরিয়া উঠিল। তাহাদের ইচ্ছা হইল তখনই তাহারা ব্রহ্মচারীবাবার পদতলে পড়িয়া নিজেদের দুষ্ট অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে। কিন্তু ইহা যে তখন সম্ভবপর নয়, কারণ মহাপুরুষ রাত্রিতে ঘরের দরজা খোলেন না।

পরদিন ভোর হইতে না হইতেই যুবকদুইটি আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং গতরাত্রির দুরভিসন্ধির নিমিত্ত নিজেদের অপরাধ স্বীকার করিয়া অতিকাতর ভাবে ব্রহ্মচারী বাবার নিকট পুনঃ পুনঃ ক্ষমা চাহিতে লাগিল। বাবা তাহাদিগকে ক্ষমা করিলেন, এবং "সাবধান হয়ে চলিস্" বলিয়া বিদায় দিলেন।

যুবকদ্বয় ভাবিল,—মহাপুরুষই বটেন।

খুড়ো, সাধু যে তল্পি গুটাচ্ছে!

মাঘ মাস। এক দিন বারদীর আশ্রমে এক যোগী আসিয়া উপস্থিত। তিনি ব্রহ্মচারী লোকনাথের চেয়েও সাধনায় অনেক বড়, ইহাই তাঁহার নিজের ধারণা। দু-চার দিন অবস্থানের পর অভ্যাগত যোগী আশ্রমের মধ্যে মহাসমারোহে "পঞ্চাগ্নিযজ্ঞের" অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়া দিলেন। আশ্রমে অভ্যাগত মাত্রই আশ্রমের অতিথি। বিশেষতঃ "যাগযজ্ঞ" সবই ধর্ম্মকার্য্য, ইহাতে বাধাপ্রদানের কোন কথাই উঠিতে পারে না। সাধুর যজ্ঞ দর্শন করার জন্য আশ্রমে বহু লোকের সমাগম হইতে লাগিল। বাবা

লোকনাথ নীরব কর্ম্মী। সুতরাং তাঁহার আশ্রমে দম্ভের অভিব্যক্তি অসঙ্গত কার্য্য। কিন্তু আগন্তুক যে অতিথি—তাঁহাকে "চলিয়া যাও" বলাও চলে না।

"পঞ্চাগ্নি যজ্ঞ" মধ্য অবস্থায় উপস্থিত, এমন সময় হঠাৎ এক দিন আকাশ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বারিবর্ষণ হইতে লাগিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বৃষ্টি পড়িতেছে, বিরাম নাই। পঞ্চাগ্নির অগ্নি ত নির্ব্বাপিত হইলই, ছাইটুক পর্য্যন্ত জলে ধুইয়া লইয়া গেল। আকাশ ও আশ্রম উভয়ই আবার পরিষ্কার হইল।

সম্ভবতঃ জনৈক খুড়ো মহাশয়ের সঙ্গে আসিয়াছিল তাহার ভাইপো—সাধু ও যজ্ঞ দর্শন করিতে। ভাইপো বলিল, খুড়ো, সাধু যে তল্পি গুটাচ্ছে।

খুড়ো। যঃ পলায়তি স জীবতি।

রসিকতা

অখণ্ডমণ্ডলাকারম্

মহাজ্ঞানী লোকনাথের ভাণ্ডারে নির্ম্মল রসিকতারও অভাব ছিলনা। ব্রহ্মানন্দ ভারতী ও অভয়াচরণ ব্রহ্মচারী মহাশয়দের সঙ্গে লোকনাথ বাবার রসিকতার বিবরণ পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে।

একবার ঢাকা শহর হইতে কয়েকটি কলেজের ছাত্র ব্রহ্মচারী বাবাকে দর্শন করার মানসে আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইত। তখন বিকাল বেলার আসর চলিতেছে। ব্রহ্মচারী বাবাকে প্রণাম করিয়া ছাত্রগণ ভক্তদের মধ্যে বসিয়া পড়িল। আরব্ধ প্রসঙ্গ শেষ হওয়ার পর তাহাদের মধ্যে একজন বলিল, "বাবা, আমরা

কলেজের ছাত্র। আপনার উপদেশ পাওয়ার জন্য ঢাকা থেকে এসেছি। ব্রহ্মসম্বন্ধে আমাদিগকে কিছু উপদেশ দিন।”

বাবা কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন,

“অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥”

ইহার অর্থ বোঝ ত ?

ছাত্র। হ্যাঁ, বাবা, কিছু কিছু বুঝি, তবুও আপনি একবার বুঝিয়ে দিন।

বাবা। (ঈষৎ হাসিমুখে)—আচ্ছা, শোন তবে, অখণ্ড মণ্ডলাকারম্—যাহা অখণ্ড মণ্ডলাকার, অর্থাৎ টাকা অখণ্ড মণ্ডলাকার। ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্—চরাচর জগতে যাহা ব্যাপ্ত রহিয়াছে, অর্থাৎ এই জগতে টাকারই প্রভুত্ব চলিতেছে। তৎপদং দর্শিতং যেন—সেই পদ যাহাদ্বারা দর্শিত হইয়াছে, অর্থাৎ যে অধ্যাপক তোমাদিগকে টাকা লাভ করার পন্থা দেখাইয়া দিতেছেন। তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ, সেই শ্রীগুরুকে, অর্থাৎ সেই অধ্যাপককে প্রণাম কর এবং তাঁহার উপদেশমত চলিতে থাক।

ছাত্র। (শ্রদ্ধার সহিত) বাবা, আপনি কৌতুক করিতেছেন।

বাবা। বর্ত্তমানে তোমরা টাকা-ব্রহ্মেরই উপাসক ; সুতরাং বর্ত্তমান কর্ত্তব্য শেষ হ'লে, পরে মন যদি অন্য ব্রহ্মের সংবাদ জানতে চায়, তখন আসবে, বলব।

ছাত্রগণ বুঝিল কৌতুকচ্ছলে বাবা তাহাদিগকে ঠিক উপদেশই দিয়াছেন—ছাত্রাণামধ্যয়নং তপঃ। সর্ব্বপ্রথম বিদ্যা অর্জ্জন, তার পর অন্য কথা! আমাদের স্কুল-কলেজ অর্থকরী বিদ্যার কেন্দ্রস্থল। প্রকৃত জ্ঞান-পিপাসুর সংখ্যা সেখানে অতি বিরল।

হাতের লেখা

বারদীর অন্যতম জমিদার যোগেন্দ্র কুমার নাগ মহাশয়ের মাতা আপন পৌত্রী ইন্দুকে লইয়া গোসাঁইবাবাকে দর্শন করিতে আশ্রমে আসিয়াছেন। প্রণামান্তে ইন্দুকে আশীর্ব্বাদ করার জন্য তিনি বাবার নিকট প্রার্থনা জানাইলেন। বাবা ইন্দুকে বলিলেন, "তোর হাতের লেখা সুন্দর নয়—আমার এরূপ মনে হচ্ছে।"

ঠাকুরমা। হ্যাঁ বাবা, ওর হাতের লেখা বড় কদর্য্য।

ঠাকুরমার এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মচারী বাবা ইন্দুকে বাংলা হস্তাক্ষরে লেখার জন্য একটি নাম দিলেন এবং বলিলেন, "এই নাম লিখতে লিখতে তোর হাতের লেখা সুন্দর হয়ে যাবে।"

ইন্দু ব্রহ্মচারী বাবার প্রদত্ত নামটি রোজই একনিষ্ঠ মনে বারংবার লিখিয়া হাতের লেখা সুন্দর করার চেষ্টা করিতে লাগিল, এবং তিন চার মাসের চেষ্টায় বাস্তবিকই তাহার হাতের লেখা সুন্দর হইয়া গেল। ইহার পরও যখনই সে কিছু লিখার জন্য প্রথম কলম ধরিত, তখনই অভ্যাসবশতঃ প্রথমেই সে গোসাঁই-প্রদত্ত নামটি আগে অন্যত্র একবার লিখিয়া লইত, যেন এই নামটি তাহার আরাধ্য দেবতার।

ইহার দুই বৎসর পরের কথা। ইন্দুর একটি বিবাহ প্রস্তাব উপস্থিত। প্রারম্ভিক দেখা-দেখি ও আলাপাদির পর, উভয় পক্ষই বিবাহ-প্রস্তাবে রাজি হইলেন, এবং যথাসময়ে বিবাহাদি শুভকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল।

সকলেই শুনিয়া সুখী ও অবাক হইল যে, ইন্দুর হস্তাক্ষর-বইতে লিখিত গোসাঁইবাবা-প্রদত্ত নামেই তাহার বর আসিয়াছে

কৃতকর্ম্মের ফল

ওঝার মন্ত্রে বিষ নামিয়াছে![১]

বারদী গ্রামের এক ব্যক্তিকে সর্পে পাদদেশে দংশন করে। ওঝা-বৈদ্য আসিয়া বিষ নামাইতে বিস্তর চেষ্টা করা সত্ত্বেও, বিষ তাহার শরীরে ছড়াইয়া পড়ে, এবং তাহার প্রাণ-সংশয় হয়। রোগীর আত্মীয়গণ ব্রহ্মচারীবাবার আশ্রয় গ্রহণ করিল, এবং তাহার আরোগ্য লাভান্তে, কোন এক ভবিষ্যৎ নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাঁহার পূজা দিবে—এইরূপ মানত করিল। ইহার পর বিষ আস্তে আস্তে নামিয়া আসিয়া—ওঝার হাতের সাহায্যে ক্ষতস্থান দিয়া বাহির হইয়া গেল। লোকটি রক্ষা পাইল, আর আত্মীয় স্বজনরা ভাবিল, ওঝার মন্ত্রে বিষ নামিয়াছে, গোসাঁইর কৃপায় নহে।

ব্রহ্মচারীর দয়ায় বিষ নামে নাই, সুতরাং তাঁহার পূজা দেওয়ার কোন কথাই এ ক্ষেত্রে উঠিতে পারেনা। মানত শোধ করার নির্দ্দিষ্ট কাল অতিক্রান্ত হইয়া গেল।

এক দিন লোকটি তাহার বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে গ্রামান্তরে গিয়াছে। কার্য্যান্তে সেখান হইতে গৃহে ফেরার পথে হঠাৎ তাহার সর্ব্বশরীরে একটা দারুণ জ্বালা-পোড়া আরম্ভ হইল। মাটিতে পড়িয়া সে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল যেন বিষের জ্বালায় তাহার অন্তিমকাল উপস্থিত। পথের ধারেই মাঠে এক কৃষক কাজ করিতেছিল। সে তাহার এই অবস্থা দেখিয়া তাহার বাড়ীতে গিয়া সংবাদ দিল। বাড়ীর লোকেরা সংবাদ পাইয়া সেখানে যাইয়া, তাহাকে যে অবস্থায় দেখিল, তাহাতে তাহাদের গোসাঁই বাবার মানতের কথাই সর্ব্বপ্রথম মনে পড়িল। তাহারা সেখান হইতে তাহাকে লইয়া

[১] ব্রহ্মচারী বাবার দেহরক্ষার পর আশ্রমের প্রথম সেবায়েত জানকী নাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট হইতে ঘটনাটি শ্রুত।

সোজা আশ্রমে উপস্থিত হইয়া গোসাঁইবাবার নিকট পূজা দিয়া মানত শোধ করিল। পূজার প্রসাদ গ্রহণান্তে রোগীর সকল যাতনা আস্তে আস্তে দূর হইল, এবং সে বিপদ-ভঞ্জন গোসাঁইবাবার কৃপায় সুস্থ হইল।

দয়া প্রদর্শন

লোকনাথ বাবার বিভূতি-প্রসঙ্গে কোন ঘটনাই কম চমকপ্রদ নহে। তাঁহার প্রাণ বড় কোমল। তিনি বলিতেন,—কেহ দুঃখকষ্টে জর্জ্জরিত হইয়া বা বিপদে পড়িয়া তাহার নিকট আসিলে, তিনি স্থির থাকিতে পারেন না। এমন কি মোকদ্দমার ব্যাপারে পর্য্যন্ত তিনি বিচারকের মনোভাব তাঁহার ভক্ত আসামীর অনুকূলে পরিচালিত করিয়া দিতেন। ব্রহ্মচারী বাবার বারদী আগমনের প্রাক্কালে ভক্ত ডেঙ্গু কর্ম্মকারের মোকদ্দমার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

আপীলে মুক্তিলাভ

বারদীর অন্যতম জমিদার কালীকান্ত নাগ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র রাধারান্ত। রাধাকান্ত সুরাপায়ী ও উদ্ধত স্বভাব। এক দিন অতিরিক্ত সুরাপানের নেশায়, তাঁহার এক অদ্ভুত খেয়াল চাপিল। তিনি ভাবিলেন,--ব্রহ্মচারী তাঁহার তন্ত্রমন্ত্রের বলে নানা প্রকার অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করিতেছে, আর চতুর্দ্দিকের লোকের পূজা অর্চ্চনা পাইতেছে। যদি রাধাকান্ত ব্রহ্মচারীর নিকট হইতে এই ক্ষমতা লইতে পারেন, তবে তিনিই বা ব্রহ্মচারী হইতে কোন্ অংশে কম হইবেন। নেশা-খোরের নেশার ঝোঁক অনেক সময় কোন একটা নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে আবদ্ধ থাকে, এবং যত ক্ষণ নেশা প্রবল থাকে, তত ক্ষণ তাহার মন ঐ বিষয় লইয়াই খেলা করিতে থাকে। তখন অসম্ভব বস্তুও তাহার নিকট সম্ভব ও সহজসাধ্য বলিয়া মনে

হয়। হিন্দু বাড়ীর উত্তর-দক্ষিণে লম্বা পুকুরকে নেশার ঝোঁকে পূর্ব্ব-পশ্চিমে লম্বা ভাবিয়া, এবং ইহার দুই পারের শান-বাঁধান ঘাট কাঁধে ধাক্কাইয়া, দুই মাতালের ইহাকে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা করার গল্পটি সকলেরই জানা আছে। রাধাকান্তও ভাবিলেন,— যদি বিষয়টি সহজে অর্জ্জন করা না যায়, তবে বল-প্রয়োগ ত হাতের পাঁচ আছেই।

সন্ধ্যা অনেক ক্ষণ হয় বহিয়া গিয়াছে, ভক্ত-সমাগম এখন আর নাই—আশ্রম নির্জ্জন ও অন্ধকার। এমন সময় মাতাল রাধাকান্ত টলিতে টলিতে আশ্রমে আসিয়া ব্রহ্মচারী বাবার ঘরের দরজা বলপূর্ব্বক খুলিয়া সরাসরি ঘরে প্রবেশ করিলেন, এবং জড়িত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "এই ব্রহ্মচারী, তোমার তন্ত্র-মন্ত্র যাহা কিছু আছে, তাহা আমাকে বল, নচেৎ—"

সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়াইয়া তাঁহাকে ধরিতে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য তিনি ব্রহ্মচারীকে দুই হস্তে শূন্যে তুলিয়া আছাড় দেওয়ার ভয় দেখাইবেন। তাঁহার এই ব্যবহারে বাবা একটু উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "দ্যাখ্, আমার ক্রোধ জাগাস্ নি বলছি।"

ব্রহ্মচারী বাবার কণ্ঠের উত্তেজিত শব্দ শুনিয়া নিকটস্থ ঘর হইতে তাঁহার হিন্দুস্থানী ভক্ত-সন্ন্যাসী মোহনগিরি এক লম্ফে বাহির হইয়া আসিল এবং আশ্রম ঘরে প্রবেশ করিয়া ক্ষীণ প্রদীপের আলোকে দেখিতে পাইল,—এক আততায়ী বাবাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত। ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় সে ঐ আততায়ীর উপর লাফাইয়া পড়িল, এবং দুই হস্তে তাহাকে শূন্যে তুলিয়া বাহিরে আসিয়া আশ্রমের দক্ষিণের মাঠে ছাড়িয়া দিয়া নিজে আশ্রমের প্রবেশ পথে দাঁড়াইয়া রহিল। মোহন গিরির হস্তে অপ্রত্যাশিত পরাজয়ে রাধাকান্তের যত ক্রোধ এবার তাহার উপর পড়িল। রাতারাতি মহাপুরুষ হওয়ার পরিবর্ত্তে, এখন তাঁহার

নেশার ঝোঁক মোহনগিরির উপর প্রতিশোধ নেওয়ার দিকে ছুটিল। তিনি বহু আস্ফালনের সহিত, অচিরে তাহাকে ইহার সমুচিত শিক্ষা দিবেন এরূপ শাসাইতে শাসাইতে বাড়ীর দিকে ছুটিলেন।

এ সময় প্রতাপশালী জমিদারগণ বেতনভোগী লাঠিয়ালের দল পোষণ করিত। রাধাকান্তেরও লাঠিয়াল ছিল। তিনি বাড়ীতে ফিরিয়া সর্দ্দার ও কয়েক জন লাঠিয়ালসহ পুনঃ সেই রাত্রিতেই আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। আশ্রমের মধ্যে সাধু মোহনগিরির সহিত লাঠিয়ালদের বেশ একখণ্ড যুদ্ধ হইয়া গেল। মোহনগিরি একা, আর তাহারা অনেক; সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত মোহনগিরি টিকিয়া থাকিতে পারিল না। মনিব ও লাঠিয়ালগণ তাহাকে প্রাণে না মারিয়া যথাসাধ্য শিক্ষা দিতে দিতে নিজেদের বাড়ীর বৈঠকখানায় আনিয়া ফেলিলেন। হস্তপদবদ্ধ মোহনগিরির উপর এখানেও কম অত্যাচার হইল না। সমুচিত শিক্ষা প্রদান করিয়া অবশেষে তাহারা তাহাকে ছাড়িয়া দিল।

মুক্ত হইয়া মোহনগিরি রাত্রিতেই আশ্রমে ফিরিয়া আসিল। পরদিন প্রাতঃকালে রাধাকান্তের এই কীর্ত্তি-কাহিনী সমস্ত বারদীতে ছড়াইয়া পড়িল। নাগ জমিদারগণের মধ্যে প্রবল দলাদলি ছিল। রাধাকান্তের বিরুদ্ধ দল এই সুযোগে লাঞ্ছিত সাধু মোহনগিরিকে দিয়া সেই দিনই নারায়ণগঞ্জ মহকুমা হাকিমের নিকট রাধাকান্তের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মোকদ্দমা রুজু করাইলেন। নির্দ্দিষ্ট তারিখে এই মোকদ্দমার প্রধান সাক্ষীরূপে বাবা লোকনাথকে নারায়ণগঞ্জে আসিতে হইল। বিচারালয় লোকে লোকারণ্য। অন্যান্য সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণান্তে সর্ব্বশেষ ব্রহ্মচারী লোকনাথের ডাক পড়িল। সাক্ষীর কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান ব্রহ্মচারী বাবাকে বিচারক জিজ্ঞাসা করিলেন, "বয়স কত?"

ব্রহ্মচারী বাবা। একশ' পঞ্চাশ কি ততোধিক।

বিরুদ্ধ পক্ষের মোক্তার সাক্ষীর এই উত্তর শুনিয়া আস্ফালনের সহিত বলিয়া উঠিলেন, "ইহা বিচারালয়, এখানে এরূপ অসম্ভব কথা বলা চলেনা।"

ব্রহ্মচারী বাবা। (ধীর ভাবে) তবে যাহা সম্ভব তাহাই লিখা হউক।

বিচারক মোক্তারের ইঙ্গিতে ও নিজের অনুমান বলে সত্তর পঁচাত্তর বৎসর বয়স লিখিয়া লইলেন। আরও অন্যান্য প্রশ্নোত্তরের পর, বিপক্ষের মোক্তারের জেরা করার সময় আসিল। পূর্ব্বের প্রশ্নোত্তরের ফলে, বিচারালয়ে উপস্থিত দর্শকমণ্ডলী সকলের মনেই এই ধারণা জন্মিয়াছিল যে ঘটনাটি সত্য এবং রাধাকান্তের দণ্ড অনিবার্য্য। কিন্তু মোকদ্দমায় দুর্ব্বল পক্ষ আর অর্থাগমের আশায় তাহার আইন-ব্যবসায়ী উভয়ই নিয়ত আশাবাদী। রাধাকান্তের মোক্তার সাক্ষী ব্রহ্মচারীর বৃদ্ধত্বের সুযোগ লইয়া মোকদ্দমার প্রবাহ তাঁহার মক্কেলের অনুকূলে চালাইয়া দেওয়ার এক ফন্দি আঁটিলেন। মোক্তারের জেরা চলিতে লাগিল।

মোক্তার। আপনি ত বলেছেন, আপনার বয়স দেড় শত কি ততোধিক, সুতরাং আপনি বৃদ্ধ। বৃদ্ধত্বহেতু আপনার দৃষ্টিশক্তি নিশ্চয়ই কমে গিয়েছে। ঘটনার রাত্রি অন্ধকার ছিল। আপনি ছিলেন ঘরের ভিতর, আর তথা-কথিত ঘটনা ঘটেছিল বাইরে; সুতরাং ইহা নিশ্চয়ই সত্য যে অন্ধকারে দূর হইতে আপনি স্বচক্ষে মারপিটের ঘটনা অবশ্যই দেখিতে পান নি। বলুন—হাঁ কি না।

মোক্তার মহাশয়ের জানা ছিল না যে উত্তর মেরুতে ভ্রমণকালে এই যোগপক্ক বৃদ্ধ জমাট-বাঁধা অন্ধকারের মধ্যেও পথ দেখিয়া চলিয়াছেন। আর দূরত্বের প্রশ্ন উঠিয়াছে—দেখা যাক।

মোক্তারের এই প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া সাক্ষী ব্রহ্মচারী তাঁহার ডান হাতের অঙ্গুলি সঞ্চালনে তাঁহাকে সাক্ষীর কাঠগড়ার নিকট আসিতে মৃদুস্বরে আহ্বান করিলেন. দর্শকমণ্ডলী সকলেই অবাক। সাক্ষীর এই ভদ্র আহ্বানে মোক্তার মহাশয় সাড়া না দিয়া পারিলেন না। ইতস্ততঃ করিতে করিতে তিনি ব্রহ্মচারীর নিকটস্থ হইলেন। তখন লোকনাথ বিচারালয়ের একটি খোলা দরজার মধ্য দিয়া বাহিরে বেশ একটু দূরে অবস্থিত একটি বটবৃক্ষ দেখাইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ যে বটগাছটি দেখ্‌ছ, ইহার গোড়া থেকে কোন প্রাণী উপর দিকে উঠছে, এমন দেখা যায় কি ?"

মোক্তার একবার ডান, একবার বাম দিকে ঘাড় কাত করিয়া অনেক ক্ষণ নিরীক্ষণ করিলেন, এবং অবশেষে বক্তব্যের শেষাংশে খুব জোর দিয়া বলিলেন, "কৈ—না।"

বিচারক-সহ বিচারকক্ষের প্রায় সকলের চক্ষুই তখন বট গাছের গোড়ার দিকে—উপর দিকে উঠিতেছে এমন প্রাণী কেহই দেখিতে পাইল না।

তখন মোক্তারের ব্যবহৃত "বৃদ্ধ" কথাটির পাল্টা শব্দ ব্যবহার করিয়া সাক্ষী বলিলেন, "তুমি ত যুবক, তবুও কিছুই দেখতে পাচ্ছনা! আর আমি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি, এক সারি লাল পিপীলিকা ভূতল থেকে "বৃক্ষের উপর দিকে চলেছে।"

সাক্ষী ব্রহ্মচারীর কথার সত্যতা প্রমাণ করার জন্য সরকার, আসামী ও ফরিয়াদি পক্ষের অনেক লোকই বটগাছের নিকট গিয়া দেখিল—ব্রহ্মচারীর কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। মোক্তার আসামীর অনুকূলে ঘটনার দূরত্ব ও সাক্ষীর বৃদ্ধত্বের প্রশ্ন তুলিয়া নিজেই হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন।

যথাসময়ে বিচারক তাঁহার রায় দিলেন—রাধাকান্তের ছয় মাস কাল সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইল।

রাধাকান্ত বিপদাপন্ন। তাঁহার আত্মীয়গণ তখন বুঝিলেন—এ অবস্থায় একমাত্র রক্ষাকর্তা ব্রহ্মচারী বাবা নিজে। রাধাকান্তও নেশার ঝোঁকে কৃত নিজ দুষ্কর্ম্মের জন্য অত্যন্ত অনুতপ্ত হইলেন। আত্মীয়গণ সকলেই আশ্রমে বাবার নিকট আসিয়া ক্ষমা ভিক্ষা চাহিয়া রাধাকান্তকে রক্ষা করার জন্য তাঁহাকে ধরিয়া পড়িলেন। পরম দয়াল লোকনাথ তখন তাঁহাদিগকে বলিলেন, "যা, আপীল কর গে, মুক্তিলাভ করবে।"

যথাসময়ে আপীল করা হইল, এবং সেই আপীলে রাধাকান্ত মুক্তি লাভ করিলেন। ব্রহ্মচারী বাবার দয়া প্রদর্শনে রাধাকান্তের চরিত্রের পরিবর্ত্তন ঘটিল, এবং তিনি ব্রহ্মচারী বাবার একান্ত ভক্ত হইলেন।

কে তুমি ![১]

নিবারণ রায় পূর্ব্ববঙ্গে ত্রিপুরা জেলায় প্রতাপশালী জমিদার। তাঁহার কোন এক চর-অঞ্চলের মহালে খাজনা বৃদ্ধির দরুন তাঁহার প্রজাগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তখনকার দিনে জমিদারদের অতুল প্রতাপ ছিল। প্রজাবিদ্রোহী মহালে তাহারা অকথ্য অত্যাচার করিত—প্রজাদিগকে ব্যাপকভাবে মারপিট করা, তাহাদের ঘর-বাড়ী জ্বালাইয়া দেওয়া প্রভৃতি কার্য্যদ্বারা অন্যান্য মহালের পর্য্যন্ত আতঙ্ক জন্মাইয়া দিত; প্রয়োজন বোধে গুলি চালাইতেও দ্বিধা বোধ করিত না। নিবারণ রায় দেখিলেন—মহাল ভয়ঙ্কর ভাবে ক্ষিপ্ত, প্রজাগণ মহাল-নায়েবকে মোটে আমলই দেয় না। কড়া-শাসনের দরকার; সুতরাং পেয়াদা-পাইক সহ তিনি স্বয়ং বিদ্রোহ দমন কল্পে মহালে উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে তাঁহার বন্দুক আছে। তাঁহার নিজের রঙ্গীন পানসি, আর সঙ্গীয় লোকজনের ভিন্ন নৌকা মহাল-কাছারীর ঘাটে বাঁধা। লাঠিয়াল

১ শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা সরলা নাগের নিকট হইতে সংগৃহীত।

সর্দ্দার মান্দু ও তাহার সহকারী কান্দু তাহাদের দল বল লইয়া দিবা-রাত্র ঘাট-পাহারা দিতেছে।

জমিদার নিবারণ রায়ের সঙ্গে উপযুক্ত সেলামীসহ সাক্ষাৎ করার জন্য কয়েক জন মাতব্বর প্রজাকে তলব পাঠান হইল। তাহারা আসিয়া মালিককে সেলাম করিল, কিন্তু সেলামী দিল না। মালিক অপমান বোধ করিলেন। বর্দ্ধিত হারে খাজনা দেওয়াতে প্রজাগণ রাজি হইল না। অগত্যা নিবারণ রায়কে তাঁহার রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিতে হইল। তাঁহার আদেশে লাঠিয়ালগণ প্রজাপীড়নে অগ্রসর হইল। প্রজারাও দাঙ্গাবাজ কম নয়। উভয়পক্ষে ঘোরতর মার-পিট হইল। কিন্তু মান্দু, কান্দু ও তাহাদের লোকজন সংখ্যায় প্রজাদের তুলনায় নগণ্য। সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত তাহারা টিকিয়া থাকিতে পারিল না—জমিদার পক্ষের পরাজয় ঘটিল। প্রজাগণ এখন উন্মত্তপ্রায়। তাহারা জমিদারের নৌকা চড়াও করিবার উপক্রম করিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া নিবারণবাবু তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া গুলি চালাইলেন। গুলির আঘাতে প্রজাদের এক জন নিহত ও জন কয়েক আহত হইল। প্রজারা ফিরিল, নিবারণবাবুও নৌকা খুলিলেন।

বিদ্রোহী মহালের মাতব্বর প্রজাগণও কম জবরদস্ত আসামী নয়। তাহারা জেলা-সহর কুমিল্লায় যাইয়া নিবারণ রায়কে আসামী করিয়া ফৌজদারী মোকদ্দমা রুজু করিল। ইহাই পূর্ব্ববঙ্গে "কুমিল্লার গুলি-মারা মোকদ্দমা" নামে অভিহিত। এই মোকদ্দমায় নিবারণ রায়ের পক্ষে ঢাকার সুবিখ্যাত উকিল আনন্দচন্দ্র রায় মহাশয় যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়া ছিলেন সত্য, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আসামী নিবারণ রায়কে খালাস করাইতে পারিলেন না। বিচারকের রায়ে নিবারণ রায়ের ফাঁসির আদেশ হইল। সূর্য্যাস্তের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে জেল হাজতে লইয়া যাওয়া হইল

অগৌণে নিবারণ রায়ের পক্ষ হইতে কলিকাতা হাইকোর্টে আপীল করা হইল।

ব্রহ্মচারী লোকনাথ বাবার নাম বহু কাল পূর্ব্ব হইতেই পূর্ব্ববঙ্গের ঘরে ঘরে প্রচারিত হইয়াছিল। জমিদার নিবারণ রায়ও লোকমুখে ব্রহ্মচারী বাবার মহিমা ও দয়ার অনেক কাহিনী শুনিয়াছিলেন। আত্মকৃত কর্ম্মের ফলস্বরূপ ফাঁসী অনিবার্য্য—ইহা তাঁহার মনে হইতে লাগিল; কিন্তু মহাপুরুষ লোকনাথ সম্বন্ধে শ্রুত ঘটনাবলী হইতে সঙ্গে সঙ্গে এই প্রতীতিও তাঁহার মনে দৃঢ় হইতে লাগিল যে ব্রহ্মচারী বাবার কৃপায় অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে। জেল-হাজতে অবস্থানকালে তিনি কাতর প্রাণে ব্রহ্মচারী বাবার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

কলিকাতার হাইকোর্টে তাঁহার আপীলের শুনানীর তারিখ উপস্থিত। সেখানে জীবন-মরণের তর্ক-বিতর্ক চলিতেছে। আর নিবারণ রায় কুমিল্লার কারাগারে আবদ্ধ। বেলা দ্বিপ্রহরের কিঞ্চিৎ অধিক। কারাকক্ষের সম্মুখস্থ অর্গল-বদ্ধ মোটা লোহার শিক-দরজার ভিতর দিয়া বাহির হইতে দেখা যাইতেছে আসামী নিবারণ রায় কেবলই পাদ-চারণ করিতেছেন, আর থাকিয়া থাকিয়া শুনা যাইতেছে দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সহিত বলিতেছেন, "বাবা, রক্ষা কর।" সশস্ত্র প্রহরী বাহিরে পাহারা দিতেছে।

হঠাৎ এ কি দৃশ্য! জটাজূটধারী কে ঐ সৌম্যমূর্ত্তি নিবারণ রায়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া। অপ্রত্যাশিত এই মূর্ত্তি দর্শনে নিবারণ স্তম্ভিত ও ভীত হইয়া গেলেন, এবং আর্ত্তকণ্ঠে হঠাৎ ঘটনা-চালিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি?"

মহাপুরুষ তাঁহার প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "আমি তোর আপীলের রায় লিখাইয়া দিয়া আসিলাম, তুই খালাস হইয়াছিস্।"

এই কথা শুনিয়া নিবারণ রায় উচ্চৈঃস্বরে "কে তুমি!" "কে তুমি!" বলিয়া পাগলের ন্যায় ছুটিয়া তাঁহাকে ধরিতে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করিয়া বলিতে লগিলেন, "ধর্, ধর্, গেল, গেল!"

মূর্ত্তি নিমেষে কোথায় মিলাইয়া গেলেন!

পলকে ঘটনাটির আরম্ভ ও শেষ! নিবারণ রায়ের "ধর্, ধর্, গেল, গেল," চীৎকারে প্রহরিগণ দ্বারের সম্মুখে ছুটিয়া আসিল, এবং দরজার তালাটি পরীক্ষা করিয়া দেখিল—ইহা ঠিকই আছে। তাহারা ভাবিল—আসামী মৃত্যুর বিভীষিকা দেখিতেছে!

আর নিবারণ রায়? তিনি সন্দেহ ও প্রত্যয়ের মাঝখানে দাঁড়াইয়া তখনও মুগ্ধ হইয়া ভাবিতেছেন—এ কি স্বপ্ন, না মায়া, না মতিভ্রম! ইহাদের কোনটাই নয়, এ মহাপুরুষের কৃপা!

সেই দিনই অপরাহ্ণে কলিকাতা হইতে কুমিল্লায় টেলিগ্রাম আসিল—নিবারণ রায় খালাস।[১]

অসম্ভবও সম্ভব

বন্ধ্যানারী দুগ্ধবতী

বারদী-নিবাসী উমাপ্রসন্ন নাগ মহাশয়ের স্ত্রী তিন মাসের একটি শিশু পুত্র রাখিয়া সূতিকা রোগে প্রাণত্যাগ করেন। শিশুটি সুদর্শন, কিন্তু মায়ের বুকের দুধের অভাবে তাহার স্বাস্থ্য দিন দিন ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। অবশেষে শিশু এমন অবস্থায় আসিল, যখন তাহাকে প্রাণে বাঁচান দায় হইয়া উঠিল। তাহাকে তাহার মাতুলালয়ে স্থানান্তরিত করা হইল। সেখানে তাহার জন্য উপযুক্ত

১ এই ঘটনা ব্রহ্মচারী বাবার দেহরক্ষার অল্প কিছুকাল পূর্ব্বে সংঘটিত হয়। বাবার দেহ-রক্ষান্তে বারদীর আশ্রমে তাঁহার তৈল চিত্র মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, নিবারণ রায় একবার আশ্রমে আসেন, এবং ঐ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া সবিস্ময়ে ও আবেগ-পূর্ণ হৃদয়ে বলেন, "এই সেই মহাপুরুষ, যিনি আমাকে কারাগারে দর্শন দান করিয়াছিলেন।"

হিন্দু ধাত্রীর অভাবে, একজন স্বাস্থ্যবতী মুসলমান ধাত্রী নিযুক্ত করা হইল। এই ধাত্রী শিশুকে তাহার সাধ্যমত লালন-পালন ও স্তন্য দান করিতে লাগিল। কিন্তু নবনিযুক্ত এই ধাত্রী-মাতার-স্তন্য দুগ্ধ বোধ হয় শিশুর সহ্য হইল না। বালক অল্পদিনের মধ্যেই উদরাময় রোগে আক্রান্ত হইয়া দিন দিন শুকাইয়া যাইতে লাগিল। শিশুর জীবন সঙ্কটাপন্ন বলিয়া মাতুলালয় হইতে তাহাকে পুনঃ বারদী আনা হইল।

উমাপ্রসন্ন নাগ মহাশয়ের এক সধবা ভগ্নী ছিলেন শ্রদ্ধেয়া সিন্ধু বাসিনী ঘোষ। ব্রহ্মচারী বাবার প্রতি তাঁহার অসাধারণ ভক্তি বিশ্বাস ছিল। তখন তাঁহার বয়স ত্রিশ বৎসর ; তিনি জন্মবন্ধ্যা। শিশুর প্রাণ সংশয় ভাবিয়া, তিনি তাহাকে লইয়া বাবার আশ্রমে গেলেন, এবং তাহাকে বাবার শ্রীচরণপ্রান্তে রাখিয়া তাহার প্রাণ ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন। ব্রহ্মচারী বাবা সিন্ধুবাসিনীকে বলিলেন, "তুমি ই তো শিশুকে তোমার বুকের দুধ দিয়া বাঁচাইতে পার।"

সিন্ধুবাসিনী এই কথা শুনিয়া অতি মৃদু ও সলজ্জ ভাবে উত্তর করিলেন, "অমি যে জন্মবন্ধ্যা, বাবা।"

বাবা একটুখানি হাসিলেন, এবং পরে বলিলেন, "আমার সাম্‌নে এসে বোস্ ত মা, আমি তোর স্তন্যপান করিব।"

সিন্ধুবাসিনী তখন বাবার সম্মুখে আসিয়া মা হইয়া উপবেশন করিলেন, আর পুত্র ব্রহ্মচারী লোকনাথ মাতৃস্তন্যে স্বীয় মুখ সংযোগ করিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে মাতৃবক্ষে অমৃতধারার সঞ্চার হইল। বাবার কৃপায় চিরবন্ধ্যা নারী দুগ্ধবতী হইলেন, ভ্রাতুষ্পুত্রের জীবন রক্ষার পন্থা খুলিয়া গেল। আর অপুত্রকার পুত্রসাধও মিটিল।

ব্রহ্মচারী বাবা প্রসন্ন হইয়া ইহাকে বাঁচাইলেন বলিয়া বালকের নাম রাখা হইল "ব্রহ্মপ্রসন্ন"। এই বালকই বর্ত্তমানে মধ্য বয়স অতিক্রম করিয়া প্রৌঢ়ত্বে উপস্থিত হইয়াছেন। কলিকাতার দক্ষিণে

গড়িয়াতে শ্রীব্রহ্মপ্রসন্ন নাগ মহাশয় সস্ত্রীক আশ্রমের শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবার সেবায় নিযুক্ত আছেন।

পেয়ে ধন হারালি

ঢাকা বিক্রমপুর কাওয়ালীপাড়া-নিবাসী ব্রজচন্দ্র বসু দৃষ্টিশক্তি হারাইয়াছেন। দৃষ্টিশক্তি পুনরায় লাভের জন্য তিনি অনেক ঔষধ-পত্র ব্যবহার করিয়াছেন এবং বহু সাধু-সন্ন্যাসীর নিকটও গিয়াছেন, কিন্তু কিছুতেই বা কোথাও কোন ফল লাভ হয় নাই। অবশেষে বারদীর ব্রহ্মচারীর অসীম শক্তি ও অপার করুণার কথা শুনিয়া তিনি তাঁহার এক আত্মীয়কে সঙ্গে লইয়া ব্রহ্মচারী বাবার আশ্রমে আসিলেন,—আশা[১] যদি এখানে কিছু হয়!

অন্ধ ব্রজবসু ব্রহ্মচারী বাবার নিকটেই উপবিষ্ট। বাবা স্বীয় পদযুগল বসু মহাশয়ের দিকে প্রসারিত করিয়া দিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "এই, আমার পা খুব শক্ত ক'রে ধ'রে রাখ ত।"

শব্দ লক্ষ্য করিয়া বসু মহাশয় বাবার চরণদ্বয় দুই হাতে তাঁহার সাধ্যানুসারে শক্ত করিয়া ধরিলেন। কিছু কাল পর বাবা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেখ্‌তে পাচ্ছিস্‌?"

উত্তর হইল, "হ্যাঁ, বাবা, অল্প অল্প দেখ্‌তে পাচ্ছি।"

এমত সময় উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে এক জন কাওয়ালীপাড়ার তখনকার জমিদারদের গল্প জুড়িয়া দিলেন,—এককালে জমিদারগণ খুব প্রতাপশালী। দয়া-দাক্ষিণ্যে ইহাদের যথেষ্ট সুনাম ছিল। কিন্তু কালক্রমে ইহাদের মধ্যে পাপাচার প্রবেশ করিল… …..। অন্ধ বসু মহাশয়ের ষোল আনা মন প্রথমটায় বাবার শক্ত করিয়া চরণ ধরার মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। তারপর গল্প যতই জমিতে লাগিল, তাঁহার মনও ততই বাবার চরণ-ধরা হইতে ক্রমশঃ গল্প-রসের

১ বিশ্বাস নহে।

ভিতর প্রবেশ করিতে লাগিল ; এবং থাকিয়া থাকিয়া প্রয়োজন মত তিনি মস্তক সঞ্চালনে ইহাতে সায় দিতে লাগিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে হস্তও ধীরে ধীরে শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল। অবস্থা বুঝিয়া, "ছেড়ে দে পা" বলিয়া বাবা স্বীয় চরণ-যুগল গুটাইয়া লইলেন। বসু মহাশয় নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া অনেক অনুতাপ ও কাতরতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রবচন বলে, সুযোগ একবার বৈ দ্বিতীয়বার আসে না।

প্রাণহীন দান[১]

ঢাকার তাঁতিবাজারের বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী জগদ্বন্ধু পোদ্দারের জ্যেষ্ঠ পুত্র কালীচরণ। লোকনাথ বাবার নাম শুনিয়া তাঁহাকে দেখার জন্য কালীচরণের বড় সাধ হইল। কালীচরণ আর্থিক হিসাবে বড় লোক, বড় লোকের হুকুম তামিল করার জন্য আরদালী চাপরাশী থাকে, এবং তাহারা সর্ব্বদা বাবুর অনুগমন করে। কালীচরণ ব্রহ্মচারী বাবার আশ্রমে যাইতেছে, সুতরাং তাহারও এক জন আরদালী দরকার। লালবনাতের লম্বা চাপকান, সাদা-কালো কোমরবন্ধ ও মাথায় আরদালী টুপি পরিধান করিয়া এক জন নিম্নতম ভৃত্য তাহার আরদালী সাজিল। দুই এক জন কর্ম্মচারীসহ কালীচরণ এক দিন প্রাতঃকালে তাহার কোষনৌকা হইতে নামিয়া বাবার আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিছু কাল তাহারা সেখানে দাঁড়াইয়া দেখিল—আগত ভক্তেরা যার যার সাধ্যমত কেহ বা কলা, কেহ বা মিছরি—আর কেহ বা দুধ ইত্যাদি আনিয়া বাবার ভোগের জন্য আশ্রম-ঘরের বারান্দায় রাখিয়া যাইতেছে। আর আশ্রম-সেবিকা ভজলেরাম ঐ সকল জিনিষ সংগ্রহ করিয়া যথাস্থানে লইয়া যাইতেছে।

১ ব্রহ্মচারী বাবার মন্ত্রশিষ্য শ্রীরজনী ব্রহ্মচারী মহাশয়ের নিকট হইতে শ্রুত।

আশ্রমের নিকটেই বারদীর দৈনিক বাজার। সঙ্গীয় এক জন লোক পাঠাইয়া কালীচরণ দুধের বাজার হইতে এক জন দুধ-বিক্রেতা আশ্রমে আনাইয়া পাঁচ সের দুধ মাপিয়া দিতে, আর ভজলেরামকে আনাইয়া সেই দুধ রাখিতে আদেশ করিল। অন্তর্য্যামী লোকনাথ তখন কালীচরণকে বলিলেন, "তুই বড় লোক। দুধ যদি একটা পাত্রসহ দিতে পারিস্, তবে গ্রহণ করা যেতে পারে।"

ব্রহ্মচারী বাবা কালীচরণকে দুইটি কথা বলিলেন,—বড়লোক আর পাত্রসহ দুধ, অর্থাৎ বড়লোকের দুধপূর্ণ পাত্র। দুধ পাঁচ সেরই দিবে ইহা ঠিক, তবে ব্রহ্মচারী বাবার চাহিদামত পাত্রটি ধাতব কি মৃন্ময় হইবে,—এত কথা চিন্তা করার কালীচরণের হয়তো শক্তিই নাই। অথবা অল্পব্যয়ে যেখানে কার্য্যসিদ্ধি হয়, সেখানে বেশী খরচ করিতে যাওয়া মূর্খতা! কালীচরণ বুদ্ধিমানের মত কার্য্য করিল! সে বাজারে আরদালী পাঠাইয়া একটি মাটির হাঁড়ি আনাইয়া, উহাতে পাঁচ সের দুধ মাপাইল, এবং প্রভুর ইঙ্গিতে আরদালী পাত্রটি আশ্রমের বারান্দায় তুলিয়া রাখিল। দুধের ভাণ্ডটি কিন্তু পাঁচ সের দুধে পূর্ণ হইল না; বুঝিবা কালীচরণের আশাও অপূর্ণ থাকিয়া যায়।

ঠিক সেই সময় আশ্রমের একটি কুকুর লাফ্ দিয়া বারান্দায় উঠিয়া আরদালী কর্তৃক রক্ষিত দুগ্ধভাণ্ডে মুখ লাগাইয়া লিক লিক্ করিয়া দুধ খাইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে কালীচরণ "দূর্ দূর্" করিয়া কুকুরকে তাড়াইতে গেল। কুকুর তাড়া খাইয়া আঙ্গিনায় নামিয়া পড়িল, এবং কালীচরণের দিকে তাকাইয়া রহিল। ইহা দেখিয়া ব্রহ্মচারী বাবা পুনঃ কালীচরণকে বলিলেন, "দুধ তুই আমাকে দিয়াছিস্। আশ্রমের প্রাণী দুধ খাচ্ছে বলে তুই উহাকে তাড়ায়ে দিচ্ছিস্। সুতরাং মনে স্বত্ব রেখে তুই এই দুধ এখানে রেখেছিস্। এই জন্যই তোর দুধ গ্রহণ করা হল না।"

ব্রহ্মচারী বাবার কথা শুনিয়া কালীচরণ হতভম্ব হইয়া গেল। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই ঘটনার পর ঐ দুধ আর অন্য কোন প্রাণীতে স্পর্শও করিল না। অবশেষে ইহা পাত্রসহ ফেলিয়া দেওয়া হইল। কালীচরণের ব্যবহার পূর্ব্বাপরই লৌকিকপূর্ণ, ইহাতে ভক্তি বা বিশ্বাসের অভাব ছিল; সুতরাং তাহার এই দুগ্ধ প্রত্যাখ্যাত হইল।

শ্রীমৎ রজনী ব্রহ্মচারী মহাশয় সেই দিন আশ্রমে ছিলেন। তিনি ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

প্রসাদ ও আশ্রমের ধুলির মহিমা

সসীম মানব ব্রহ্মচারী বাবার অসীম কৃপা বিতরণের বিষয় কিরূপে বুঝিবে। এক সময় ব্রহ্মানন্দ ভারতী মহাশয় বাবাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "আর্ত্তের দুঃখ তোমার দয়ায় দূর হইতে দেখ্‌ছি। ইহা কিরূপে হয়?"

উত্তর। আমার উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখিয়া যে আর্ত্ত এখানে আসে, তাহাকে দেখিলেই আমার দয়া হয়। এই দয়া আমার শক্তিরূপে তাহার দেহে পরিচালিত হয়, এবং ইহাতেই তাহার সব যাতনা দূর হইয়া যায়।

ব্রহ্মচারী বাবার এই উক্তিটিতে দেখা যাইতেছে,—গুরু কৃপা পাইতে হইলে চাই "পূর্ণ বিশ্বাস"; বিশ্বাস থাকিলেই ভক্তি আসে। ভক্তিই ভক্তের একমাত্র সম্বল। আর ভক্তিতেই মুক্তি— ইহা মহাজন বাক্য।

বাবা বলিয়াছেন, "জীবের দুঃখ দেখিলে আমার অন্তঃকরণ আর্দ্র হইয়া যায়।" এই আর্দ্রতাই তাঁহার দয়া। দয়াপরবশ হইয়া মহাপুরুষ যখনই যাহা ভক্তকে বলেন বা দেন বা স্বপ্নে আদেশ করেন, তখনই তাহা ভক্তের মঙ্গল সাধন করে। মহাপুরুষের এই দান—তাঁহার বাক্যই হউক, কোন প্রসাদই হউক, বা তাঁহাদের পদপরশ জন্য ধুলিকণাই হউক—সবই ভক্তের মঙ্গলাবহ।

আশ্রমের ধূলি

বারদীর অন্যতম জমিদার অরুণকান্ত নাগ মহাশয়ের কথা পূর্ব্বে পিপীলিকা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার একটি শিশুপুত্র তক্তপোষ হইতে মেজেতে পড়িয়া গিয়া বুকে শক্ত আঘাত পায়। অরুণবাবুর মায়ের ব্রহ্মচারী বাবার প্রতি অসীম ভক্তি ও অটল বিশ্বাস ছিল। শিশুটির জন্য বাবার আসনের নীচ হইতে ধূলি আনিয়া দেওয়ার জন্য মা পুত্রকে বলিলেন। অরুণবাবু আশ্রমেও যান, বাবাকে যথেষ্ট ভক্তিও করেন ; কিন্তু মনে হয় ধূলিতে তাঁহার আস্থা কম। একদিকে মায়ের আদেশ, অন্যদিকে নিজের অবিশ্বাস, এই দোটানা ভাব লইয়া তিনি আশ্রমে যাইয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। অন্তর্য্যামী মহাপুরুষ তাঁহার অবস্থা বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "যদি আমার আসনের নীচের ধূলি দিতে তোর ইচ্ছা না হয়, তবে মায়ের আদেশ পালনার্থ অন্ততঃ আশ্রমের যে কোন স্থান হইতে একটু ধূলি নিয়ে মাকে দে।"

অরুণবাবু লজ্জিত হইলেন, এবং আসনের নীচ হইতেই ধূলি লইয়া গিয়া মাকে দিলেন। ভক্তিমতী মাতা এই ধূলির কতক শিশুকে খাওয়াইলেন, আর কতক শিশুর বুকে মাখিয়া দিলেন। এই ধূলিতেই শিশুটি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়া উঠিল।

এ যে ধূলি নয়—পদরেণু।

চিকিৎসকগণ জবাব দিয়াছেন

কাশীকান্ত নাগ মহাশয় বারদীর অন্যতম জমিদার। তিনি এক উৎকট ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী, উত্থানশক্তি-রহিত। দীর্ঘ ছয় মাসকাল ডাক্তারী-কবিরাজি চিকিৎসা চলিয়াছে, কিন্তু কোন ফলই হইতেছে না ; বরং দিনের পর দিন জীবনী-শক্তি কমিয়া আসিতেছে। অবশেষে রোগীর শরীরে ঔষধ-প্রয়োগে কোন প্রতিক্রিয়াই হইতেছে না দেখিয়া, চিকিৎসগণ তাঁহাকে

জবাব দিলেন। নিরুপায় হইয়া নাগ মহাশয় লোকনাথ বাবার শরণাপন্ন হইলেন। স্বাস্থ্যের তখনকার অবস্থায় প্রত্যহ পদব্রজে আশ্রমে আসিয়া বাবার দর্শন ও প্রসাদ লাভ করা তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর বলিয়া তিনি আশ্রমের সন্নিকট ছাগল-বাঘিনী নদীতে নৌকায় অবস্থান করিতেছেন।

ঢাকায় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের নিকট লোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবার নাম ও মহিমার কথা শুনিয়া শ্রীমৎ রজনী ব্রহ্মচারী এই প্রথম বার বারদী আসিয়াছেন। তাঁহার নৌকাও ছাগল-বাঘিনীর ঘাটে ভিড়িয়াছে। নৌকা হইতে জমিতে উঠিয়া তিনি দেখিলেন,—অদূরে লাঠি ভর করিয়া এক ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া আছেন। ভদ্রলোকটি রোগাক্রান্ত ও শীর্ণকায়। রজনী ব্রহ্মচারী মহাশয়ের নিকট ভদ্রলোকটির মুখমণ্ডল পরিচিত বলিয়া মনে হইতে লাগিল। আর একটু অগ্রসর হইয়া, তিনি তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন, এবং বলিলেন, "কাশী নাকি হে।"

রজনী ব্রহ্মচারী নাগ মহাশয়ের সহাধ্যায়ী। পরস্পর পরস্পরকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। রজনী ব্রহ্মচারী তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি এত শীর্ণকায় হ'য়ে গিয়েছ যে তোমাকে দেখে চেনা দুষ্কর।"

আশ্রমের পথে আসিতে আসিতে নাগ মহাশয় নিজের পীড়ার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বলিতে লাগিলেন, "ঢাকার ডাক্তার কবিরাজগণ আমার আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা না দেখে, আমাকে বিদায় দিয়েছেন।" একটি নৌকা দেখাইয়া বলিলেন, "আজ চার-পাঁচ দিন যাবৎ ঢাকা থেকে ফিরে এসে আমি ঐ নৌকায় আছি। এখানে আসার পর প্রথম দুদিন লোকের সাহায্যে নৌকা থেকে আশ্রমে এসে, আমি বাবার প্রসাদ পাই। তৃতীয় দিন হ'তে আমি নিজেই লাঠির সাহায্যে ভর করে আশ্রমে আসা-যাওয়া করতে

পারছি, এবং বাবার প্রসাদও পাচ্ছি। এই অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই আমি অনেক ভাল বোধ করছি। বাবার প্রসাদের অলৌকিক গুণেই ইহা সম্ভবপর হয়েছে।"

যাও, মা, হাত উঠেছে

ঢাকা নগরীর দক্ষিণ সীমায় বুড়ীগঙ্গা নদী। এই নদীর কিঞ্চিৎ দক্ষিণে পাইনা-পশ্চিমদী যুক্তগ্রাম। এই গ্রামের রাধিকামোহন রায় ধনী ব্যবসায়ী ও জমিদার। যৌবনে পদার্পণ করিয়াই সঙ্গদোষে তিনি চরিত্রহীন হইয়া পড়েন। মদ্যপান ও ইহার সঙ্গে অপরাপর নিকৃষ্ট আচার ও অভ্যাস সবই তাঁহার মধ্যে বর্ত্তমান ছিল, কিছুই বাদ যায় নাই। ঘরে তাঁহার লক্ষ্মীরূপিণী সতীসাধ্বী স্ত্রী প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও স্বামীর স্বভাবের একটুও পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারেন নাই। বরং অনেক সময়ই এইরূপ ক্ষেত্রে যেমন হয়, তাহাই ঘটিয়াছে—তিনি স্বামী কর্ত্তৃক নিগৃহীতা হইয়াছেন। তবুও তাঁহার স্বামিভক্তি অচলা।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে রাধিকামোহনের শরীরের রক্তের জোর যখন কমিয়া আসিল, তখন তাঁহার কু-অভ্যাস ও কদাচারের ফল ক্রমশঃ তাহার দেহে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। তিনি বাত ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলেন এবং তাঁহার বাম অর্দ্ধাঙ্গ অবস হইয়া গেল। ডাক্তারী ও কবিরাজী মতে চূড়ান্ত চিকিৎসা হইল, কিন্তু কোন ফলই পাওয়া গেল না।

সময় সময় দেখা যায়, রাধিকামোহনের ন্যায় লোকদের মধ্যেও ধর্ম্মপিপাসা জাগিয়া উঠে, এবং তখন তাঁহারা ফাঁকে ফাঁকে সাধু সন্ন্যাসীর সঙ্গলাভ অনুসন্ধান করেন। অনেক দিন হইতেই রাধিকা মোহন মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের গেণ্ডারিয়াস্থিত আশ্রমে যাতায়াত করিতেন। অর্দ্ধাঙ্গ পঙ্গু-অবস্থায় পড়িয়া যখন ঔষধপত্রে কোনও কাজ হইল না, তখন তিনি গোস্বামী মহাশয়ের

শরণাগত হইলেন। গোস্বামী মহাশয় তাঁহাকে বারদীতে লোকনাথ বাবার নিকট যাওয়ার জন্য উপদেশ দিলেন। তাঁহার উপদেশমত একখানা বিপুলকায় কোষনৌকা ও একটি বড় ছিপ্ ভাড়া করিয়া দাস-দাসী ও কতিপয় কর্ম্মচারীসহ সস্ত্রীক রাধিকামোহন ঢাকা হইতে বারদী অভিমুখে রওনা হইলেন।

যথাসময়ে নৌকা ব্রহ্মচারী বাবার আশ্রমের নিকট ছাগল-বাঘিনীর ঘাটে আসিয়া নোঙর করিল। রাধিকামোহন বাবার প্রতি পূর্ণ ভক্তি-বিশ্বাস লইয়াই আসিয়াছেন। তিনি বড় সৌখিন পুরুষ ছিলেন; পঙ্গু অবস্থায়ও ফর্সি হুকায় তামাকু সেবনের আসক্তি টুকু তিনি বর্জ্জন করিতে পারেন নাই। তিনি ধর্ম্মালাপ করিতে ভালবাসিতেন। আশ্রমের বারান্দায় বসিয়া লম্বা রাবার নলের সাহায্যে ফর্সি টানিতে টানিতে তিনি বাবার সঙ্গে ঘোরতর তর্ক-বিতর্ক জুরিয়া দিয়া আসর বেশ জমাইয়া তুলিতেন; আর সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় অবস অঙ্গে ধূলি মাখাইতেন, এবং সময়মত প্রসাদ পাইতেন। মাসাধিক কাল এইরূপে চলার পর তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গের ব্যাধি কমিয়া গিয়া হস্তে আসিয়া ঠেকিল। তিনি এখন প্রায় রোগমুক্ত,—হাঁটাচলা করিতে পারেন, এবং তাঁহার মুখমণ্ডলও স্বাভাবিক অবস্থায় আসিয়াছে, কিন্তু হাতখানা উঠা-নামা করিতে পারেন না, এই যা। তাঁহার হাতের ব্যাধি যেন কোন্ অজ্ঞাত কারণের অপেক্ষায় রহিয়া গেল।

রাধিকামোহনের স্ত্রীও রোজই তাঁহার সঙ্গে আশ্রমে যাইয়া এক কোণে বসিয়া নীরবে বাবার ধ্যান করিতে থাকেন। স্বামীর রোগ যখন সারিয়াও সারিতেছে না, তখন এই স্বামী-ভক্তিপরায়ণা মহিলা এক দিন রাত্রিতে এক সঙ্কল্প করিলেন। তিনি স্থির করিলেন যে স্বামীর পূর্ণ রোগমুক্তির জন্য তিনি বাবার আশ্রমে ধর্ণা দিবেন। পর দিন প্রাতঃকালে স্বীয় অভিপ্রায় স্বামীর নিকট ব্যক্ত করিয়া তিনি একাকিনী আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তখনও

ভক্ত-সমাগমের ভীড় হয় নাই। তিনি ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে বাবার নিকট যাইয়া গলবস্ত্র হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। মুখমণ্ডল তাঁহার ম্লান, কিন্তু হৃদয় দৃঢ়। তিনি একনিষ্ঠ মনে স্বামীর কল্যাণার্থে বাবাকে ডাকিতেছেন। কিছু কাল পর বাবা তাঁহাকে বলিলেন, "এমন করে বসে আছ কেন, মা ?"

বাবার মুখে "মা" সম্বোধনটি শুনিয়া মুহূর্তের জন্য তাঁহার প্রাণ স্পন্দিত হইয়া উঠিল। সাধ্বী রমণী অতি কাতরভাবে উত্তর করিলেন, "বাবা, আপনার দয়ায় কর্ত্তার অসুখ প্রায় সেরে গিয়েছে, কিন্তু হাতখানা তিনি নাড়া-চাড়া করতে পারছেন না—" বলিতে বলিতে তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, তিনি ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

দয়াল মহাপুরুষও বুঝি তাঁহার এই কাতরতা আর সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি স্বীয় বাম হস্তখানা তিন বার উপর দিকে তুলিলেন, তিন বার নামাইলেন, এবং পরে তাঁহাকে বলিলেন, "যাও, মা, হাত উঠেছে।"

বাবার এই কৃপাবাক্য লাভ করিয়া তিনি কম্পিত কলেবরে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নৌকায় ফিরিতেছেন। পথটি যেন আজ অতিদীর্ঘ মনে হইতেছে। তিনি এত বেগে হাঁটিতেছেন, তবুও পথ ফুরায় না! নৌকায় ফিরিয়া তিনি দেখিলেন—!

তিনি দেখিলেন কর্ত্তা ফর্সী হুকার রাবারের নলটি স্বীয় বামহস্তের অঙ্গুলির মুঠায় ধরিয়া আরামে ধূমপান করিতেছেন। নৌকাশুদ্ধ সকলেই অবাক্! কোন্ অজানা শক্তির প্রভাবে এই অবশ হস্তে কার্য্যশক্তি ফিরিয়া আসিল! সাধ্বী স্ত্রীর প্রফুল্লমুখমণ্ডল দেখিয়া কেবল রাধিকামোহনই ইহার গূঢ় রহস্য বুঝিতে পারিলেন এবং লক্ষ্মী সহধর্ম্মিণীর আরাধনার ফল তিনি নিজে লাভ করিয়া মুগ্ধ হইলেন। এমন সতীকে তিনি এত কাল অনাদর

করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার বড় অনুশোচনা হইল। এই ঘটনায় রাধিকামোহনের চরিত্রে আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হইল। কঠিন পীড়া উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহার দেহ ও মন উভয়ই মহাপুরুষের কৃপায় সুস্থ ও সবল হইল। পীড়ার লেজটুকু আট্‌কাইয়া রাখিয়াই যেন ব্রহ্মচারী বাবা রাধিকামোহনকে তাঁহার গৃহলক্ষ্মী চিনাইয়া দিলেন। তাঁহাদের সংসার সুখের হইল।

"উঠ্"

কলিকাতা হাটখোলার প্রসিদ্ধ ধনী সীতানাথ দাস বাতব্যাধিতে কষ্ট পাইতেছিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ অবশ। কলিকাতার সুবিখ্যাত ডাক্তার-কবিরাজ সকলেই তাঁহাকে চিকিৎসা করিয়াছেন, কিন্তু সবই বৃথা চেষ্টা মাত্র। তিনি চিকিৎসক-পরিত্যক্ত হইয়া জীবনের আশা ছাড়িয়া দিয়াছেন, এমন সময় তাঁহার এক নিকট-আত্মীয়ের মুখে এক দিন বারদীর ব্রহ্মচারীর অলৌকিক শক্তি ও অপার দয়ার অনেক ঘটনার বিবরণ শুনিয়া ব্রহ্মচারীর দর্শনলাভ করার জন্য তাঁহার প্রাণমন আকুল হইয়া উঠিল। তিনি সেখানে যাওয়া স্থির করিলেন।

সীতানাথ ধনী; সুতরাং তাঁহার অর্থ ও লোকজনের অভাব নাই। যথাযথ আরামে তাঁহাকে বারদী আশ্রমে আনা হইল। একখানা বেশ বড় নৌকায় ছাগল-বাঘিনীর ঘাটে তিনি আছেন। সেবা-শুশ্রূষার জন্য তাঁহার সঙ্গে লোকজনও যথেষ্ট রহিয়াছে। তবুও তাঁহার কি এক অদম্য ইচ্ছা হইল—তিনি দাসদাসী-পরিবৃত হইয়া এখানে থাকিবেন না। ব্রহ্মচারী বাবার নাম লইয়া তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়াছেন। বাবার কৃপায়ই তাঁহার অসার দেহখণ্ড কলিকাতা হইতে বারদীতে উপস্থিত হইয়াছে; এই দেহ আশ্রমের আঙ্গিনায় ব্রহ্মচারী বাবার চোখের সামনে পড়িয়া থাকিবে, যদি তাঁহার কৃপা হয়, তবে এই দেহ উঠবে, অন্যথা এই

আঙ্গিনায়ই প্রাণপাত হইবে। সঙ্কল্প কঠোর। বিশ্বাস পূর্ণ। এ যেন ভক্তপ্রবর রামপ্রসাদের "মা হারে কি পুত্র হারে" প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান। আশ্রমের আঙ্গিনায় মুক্ত আকাশতলে একখানা তক্তপোষের উপর তাঁহার দেহখাঁচাখানা রাখা হইল; কিন্তু খাঁচার প্রাণপাখী ব্রহ্মচারী বাবার শ্রীচরণতলে নিবদ্ধ। পূর্ণ একদিন একরাত্রি চলিয়া গেল। দয়া হইল না—বাবা ফিরিয়াও তাকাইলেন না। দ্বিতীয় দিনও দিনের ভাগ কাটিয়া গেল—কোন সাড়াই নাই। এই সময়ে এমন কি দেহ রক্ষার্থে পান আহার ইত্যাদির প্রতিও সীতানাথের কোন আশক্তি ছিল না। কেবলমাত্র ব্রহ্মচারী বাবার শ্রীচরণামৃত একটু করিয়া গ্রহণ করিতেছেন। তাঁহার এই দুর্দ্দশা দেখিয়া সন্ধ্যাবেলা তাঁহার আত্মীয়-স্বজন তাঁহাকে নৌকায় ফিরাইয়া লইয়া যাওয়ার জন্য লোকজন সহ তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের প্রস্তাব শুনিয়া সীতানাথ ক্ষীণ অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, "বাবার সম্মুখে প্রাণবায়ু বাহির হয় সেও ভাল; এ অবস্থায় নৌকায় আর ফিরিব না।"

বাবা, পাত্র বড় শক্ত! বর্দ্ধমানে তুমি যেমন কালী সিদ্ধাকে ধরিয়াছিলে।

দ্বিতীয় রাত্রিও কাটিল। তৃতীয় দিনের সূর্য্যোদয় আজ। পুত্র কি আর হারে? হারতে হ'লে মা-ই হারেন! তৃতীয় দিন সকালে বাবার ঘরের দরজা খুলিয়া গেল। বাবা সোজা সীতানাথের নিকট আসিয়া, "উঠ্" বলিয়া ডান হাতে তাঁহার মস্তক স্পর্শ করিলেন। সীতানাথের মনে হইল—একটা শান্ত শীতল শক্তিপ্রবাহ মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে খেলিয়া উঠিয়াছে। অলব্ধপূর্ব্ব এই শক্তির প্রভাবে, বাবার আদেশমাত্র তিনি দুই হাতে ভর করিয়া উঠিয়া তক্তপোষের উপর বসিলেন, এর দ্বিতীয় চেষ্টায় পথের উপর ভর করিয়া দাঁড়াইলেন। তার পর আবেগভরে ভূতলে পড়িয়া বাবার শ্রীচরণপদ্মযুগল দুই হাতে ধরিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন।

হৃদয়ে তাঁহার ভাষাহীন ভক্তির উচ্ছ্বাস খেলিতেছে; তিনি বাবার সুকোমল চরণযুগল ছাড়িয়া উঠিতে পারিতেছেন না।

সীতানাথ এক মুহূর্ত্তে রোগমুক্ত হইলেন। এ যেন যাদুকরের খেলা! যাদুকরই বটেন। আর ভক্ত সীতানাথ?

"যা কর গৌরাঙ্গ মোরে, আমি তোমায় ছাড়ব না।"[১]

প্রকৃতি ও দেবতার উপর প্রভাব

দয়াগঞ্জে সূর্য দেখবে

ঢাকা হইতে ব্রহ্মচারী বাবার কয়েক জন বিশিষ্ট উচ্চশিক্ষিত ভক্ত নারায়ণগঞ্জ হইয়া ষ্টীমারে বারদীর আশ্রমে আসেন। আশ্রমে বাবার দর্শন ও কৃপালাভে চরিতার্থ হইয়া দুই দিন অবস্থানের পর তাঁহারা স্থলপথে ঢাকায় প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। বৈশাখ মাস, মাথার উপর প্রচণ্ড সূর্য্য। রৌদ্রতপ্ত ভূমিতল হইতে উত্তপ্ত বায়ু আগুনের মত বোধ হইতেছে। ভক্তগণ ইতস্ততঃ করিতেছেন, কিরূপে এই রৌদ্রে পথ চলিবেন। ভাব দেখিয়া দয়াপরবশ হইয়া বাবা তাঁহাদিগকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন, "তোমরা রওনা হতে পার, তোমাদের রৌদ্র লাগবে না। দয়াগঞ্জ যেয়ে তোমরা সূর্য্য দেখবে।"

আশ্রম হইতে ঢাকা ছয় ক্রোশ পথ পশ্চিমে। দয়াগঞ্জ ঢাকা সহরের পূর্ব্বপ্রান্তে অবস্থিত। ভক্তগণ বাবার পদধূলি গ্রহণ করিয়া, তাঁহার আদেশমত রওনা হইলেন। অল্প কিছু পথ অতিবাহিত করার পরই হাল্‌কা মেঘে আকাশ ছাইয়া গেল, এবং সূর্য্যের তেজও কম বোধ হইতে লাগিল। বৃষ্টি পড়িল না বটে, তবে তেমন রৌদ্রও লাগিল না। ছত্রবিহীন ভক্তগণ যখন দয়াগঞ্জে উপস্থিত হইলেন, তখন মেঘ কাটিয়া গিয়া, পশ্চিম আকাশে

১ বর্ত্তমানে বারদীর আশ্রমে যে ইষ্টক নির্ম্মিত অতিথিশালা আছে, তাহা ভক্ত সীতানাথ দাস মহাশয়ের আত্মসমর্পণের স্মৃতি স্বরূপ তাঁহার বংশধরগণ প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন।

হেলান সূর্য্য দৃষ্ট হইল। সমস্ত পথ ভক্তগণ বাবার শক্তি ও দয়ার কথা আলোচনা করিতে করিতে প্রায় বিনাক্লেশে ঢাকায় পৌঁছিলেন।

শ্রীশ্রীমা শীতলা দেবী

এক দিন সন্ধ্যার কিঞ্চিৎপর ব্রহ্মচারী বাবা ঘরে আসনে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় তিনি দেখিলেন রক্তবস্ত্র-পরিহিতা অল্পবয়স্কা একটি দেবীমূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মানা। দেবীর দিব্য মুখমণ্ডলে দু-চারটি বসন্ত স্ফোটকের ক্ষতচিহ্ন রহিয়াছে। তিনি বুঝিলেন—দেবী শ্রীশ্রীমা শীতলা। দেবীর ভাব দেখিয়া তাঁহার বোধ হইল—দেবী কিছু বলিতে চান। তখন তিনি মধুর বচনে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি চাই, মা?"

দেবী। আমার গন্তব্য পথ তোমার আশ্রমের উপর দিয়ে পড়েছে। আমি এই স্থান দিয়ে যেতে চাই।

বাবা ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া দেখিলেন দেবী যে পথে যাইতেছেন, সেই পথে বহু লোক-বসতি; সুতরাং সে পথে দেবীর গমনে মড়ক লাগার সম্ভাবনা। লোকের দুর্দ্দশা নিবারণের জন্য বাবা লোকনাথ তখন দেবীকে বিনয়নম্র বচনে কহিলেন, "মা, এখানে যে আমি অবস্থান করছি। জেনে শুনে কিরূপে তোমাকে এ স্থান দিয়ে যেতে দি—বল?"

দেবী। আমি কি তবে এখানে আটক থাক্‌ব?

বাবা বুঝিলেন এ স্থান দিয়া দেবীর পথ-গমন তাঁহার অনুমোদন সাপেক্ষ। তিনি বলিলেন, "না, মা, তুমি আটক থাকবে না। একটু পাশ কেটে ছাগল-বাঘিনীর নিম্নতটভূমি ধরে চলে যেতে পার, দয়া ক'রে উচু ভূমিতে উঠবে না।"

দেবী তাহাই করিলেন। ঘটনাটি অল্পকালের মধ্যেই চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। লোকে বাবার কৃপায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

আশ্রম হইতে কিছু দূরে ছাগল-বাঘিনীর ঢালু ভূমিতে মা শীতলাদেবীর পথে এক বাগদি বাড়ীতে মায়ের দয়া[১] হইল। গৃহস্বামী ছুটিয়া গোসাঁই বাবার নিকট আসিয়া ইহার প্রতিকার ভিক্ষা প্রার্থনা করিল। বাবা তাহাকে বলিলেন, "ছাগল-বাঘিনীর ঢালুভূমি দিয়ে দেবীর গমন-পথ নির্দ্দিষ্ট হয়েছে। তুই সকলকে নিয়ে কিছু কালের জন্য বাড়ী ছেড়ে অন্যত্র চলে যা।"

বাগদি বাড়ী ছাড়িয়া কিছু দিনের জন্য চলিয়া গেল বটে, কিন্তু যাহারা আক্রান্ত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কয়েক জনের প্রাণ বিনষ্ট হইল।

মন্ত্রণা মন্ত্র না

লোকনাথ বাবার প্রতি রায় বাহাদুর ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের[২] অগাধ বিশ্বাস ও অটল ভক্তি ছিল। তিনি বাবার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণপ্রার্থী হইয়া অনুমতি লাভের জন্য তাঁহাকে একাধিক পত্র লিখিলেন। প্রত্যেক পত্রেই তিনি দীক্ষাগ্রহণের পক্ষে অনেক যুক্তি দেখাইলেন। ব্রহ্মচারী বাবা রায় বাহাদুরের এই সকল যুক্তিপূর্ণ পত্রের শেষটির উত্তরে দীক্ষা সম্বন্ধে তাঁহাকে লিখিয়া পাঠাইলেন, "মন্ত্রণা মন্ত্র না।"

ব্রহ্মচারী বাবার কথাটি হেঁয়ালীর মত। রায় বাহাদুরের ন্যায় অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিকে তিনি লিখিলেন, "মন্ত্রণা মন্ত্র না।" এই উক্তিটির কি অর্থ, তাহা বাবাই জানেন। রায় বাহাদুর নিজেও ইহার কোন ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন নাই। রায় বাহাদুর ব্রহ্মচারী বাবার বিশিষ্ট ভক্ত, তিনি জ্ঞানী। বাবার নিকট হইতে তাঁহার দীক্ষা গ্রহণ করার ব্যাপারে যুক্তিতর্ক প্রদর্শনের কোন প্রয়োজন বা সার্থকতা ছিল না। দীক্ষা গ্রহণ বিষয়ে যুক্তি অপেক্ষা ভক্তিই

১ বসন্তরোগের আক্রমণকে "মায়ের দয়া" বলা হয়।
২ ঢাকার পূর্ব্বোক্ত সরকারী উকিল।

অধিকতর মূল্যবান। রায় বাহাদুরের ভক্তি যথেষ্ট ছিল। এই ভক্তিই দীক্ষা গ্রহণের পক্ষে একমাত্র যুক্তি। ভক্তির উপর অন্য যুক্তির প্রয়োজন হয় না।

'মন্ত্রণা' কথাটির এক অর্থ 'যুক্তি পরামর্শ' ধরা যায়, এই অর্থে মন্ত্রণা (য়) [যুক্তি-পরামর্শে] মন্ত্র [দীক্ষা] না [নেওয়া সম্ভবপর হয় না]। ইহা নিছক মনের টান, যুক্তি-তর্কের নহে। তবে কি এই ভাবিয়াই বাবা রায় বাহাদুরকে লিখিয়াছিলেন, 'মন্ত্রণা মন্ত্র না ?"

ব্রহ্মচারী বাবার এই সংক্ষিপ্ত পত্র-সংবাদে আশ্বাসের বাণীও ছিল,—তিনি রায় বাহাদুরকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে লিখিয়াছিলেন। হয়তো সাক্ষাৎ হইলেই সব বিষয় সুস্পষ্ট হইয়া যাইত। কিন্তু রায়বাহাদুর আর বারদী যাইতে পারেন নাই।[১]

রোগ-প্রতিকার

ব্রহ্মচারী বাবা বলিলেন, "রোগীরা আমার উপর নির্ভর ক'রে আশ্রমে আসে। আমি তাহাদিগকে দেখলেই, আমার হৃদয় আর্দ্র হয়, এবং তাহাদের কষ্টে আমার কষ্ট হয়, আমার এই কষ্টবোধই তাহাদের প্রতি আমার দয়া। দয়া আসলেই, আমার শক্তির প্রভাবে তাহাদের রোগ দূর হয়ে যায়।"

মহাপুরুষ বলিতেছেন যে তাঁহার উপর পূর্ণ নির্ভর করিয়া রোগী তাঁহার শরণাগত হইলেই, তাঁহার দয়া হয়, এবং এই দয়াতেই রোগী রোগমুক্ত হয়। দেখা মাত্রই দয়া। তিনি চাওয়ার অপেক্ষায় থাকেন না, কিন্তু চাই সম্পূর্ণ নির্ভর বা আত্ম-সমর্পণ।[২]

১ এই ঘটনাটিও অরুণবাবুর স্ত্রী শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা সরলা নাগ হইতে সংগৃহীত।

২ "মামেকং শরণং ব্রজ।"

বেদনা এখনই সেরে যেত

পূর্ব্ববঙ্গ-ফরিদপুর-চিকন্দীর উকিল ব্রজেন্দ্রকুমার বসু কঠিন পিত্তশূল রোগে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিলেন। লোকপরম্পরায় বারদীর মহাপুরুষ লোকনাথ ব্রহ্মচারীর কথা শুনিয়া রোগ হইতে মুক্তি লাভের পূর্ণ আশা ও বিশ্বাস লইয়া তিনি বারদীর আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মচারী বাবা তখন ভক্তদের লইয়া আলাপ করিতেছেন দেখিয়া, তিনিও তাহাদের সঙ্গে নীরবে এক কোণে বসিয়া গেলেন। অসহ্য শূল বেদনায় তাঁহার ভিতরটা খাইয়া যাইতেছিল। কোন রকমে বসিয়া থাকিয়া, তিনি শুধু মনে করিতে লাগিলেন, "যদি কোনও প্রকারে ব্রহ্মচারী বাবার শ্রীচরণ আমার বেদনার স্থানে একবার স্পর্শ করাতে পারতাম, তবে বেদনা এখনই সেরে যেত!"

অন্তর্য্যামী বাবা ভক্তের প্রাণের আকুল আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার জন্য, ঠিক তখনই, "ওরে, আমার পা-টা বড় ঝিঁ ঝিঁতে ধরেছেরে, কেউ একটু টিপে দে-তো", বলিয়া বাঁ পা-খানা লম্বা করিয়া দিলেন।

সুযোগ উপস্থিত দেখিয়া, সঙ্গে সঙ্গে বসু মহাশয় উঠিয়া আসিয়া অতি সযত্নে ও শ্রদ্ধার সহিত মহাপুরুষের ঝিঁ-ঝিঁ-ধরা পা-খানা ধরিয়া স্বীয় অঙ্কে তুলিলেন, এবং বেদনার স্থানে সংযোগ করিয়া মনে প্রাণে আস্তে আস্তে টিপিয়া দিতে লাগিলেন। মহাপুরুষের তৈয়ারি করা ঝিঁ ঝিঁ ধরাও সারিল, আর সঙ্গে সঙ্গে ভক্তের বহু কালের বাস্তব শূল-বেদনাও চিরতরে দূর হইয়া গেল।

বসু মহাশয় উকিল, সুতরাং ব্রহ্মচারী বাবার কৃপা কৌশল তিনি বুঝিলেন না, এরূপ মনে করিলে, তাঁহার প্রতি অবিচার করা হইবে। অভিনয়টি বড় সুন্দর হইল।

পাদুকা প্রহারের নগদ ফল

মহাপুরুষ লোকনাথ সময় সময় নৈবেদ্যরূপে প্রদত্ত ভক্তের পক্ক অন্ন-ব্যঞ্জনাদির কিঞ্চিৎ ভক্ত বিশেষের হাত হইতে মুখে লইয়া প্রসাদ করিয়া দিতেন। এক বার জনৈক ভক্ত আশ্রম-মাতার দ্বারা অন্নাদি রান্না করাইয়া নিজ হস্তে তাহা ব্রহ্মচারী বাবার মুখে তুলিয়া দেওয়ার বাসনা প্রকাশ করিলেন; কিন্তু বিশেষ কোন অজ্ঞাত কারণে তাহার বাসনা পূর্ণ হইল না। সেখানে তখন ফরিদপুর-চিকন্দীনিবাসী বয়স্ক ভক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। তিনি ইহার পূর্ব্বেও অনেক বার আশ্রমে আসিয়াছেন, এবং দু-একবার নিজ হস্তে ব্রহ্মচারী বাবার মুখে এরূপ পক্ক অন্নাদির কিঞ্চিৎ তুলিয়া দেওয়ার সৌভাগ্যও তাঁহার হইয়াছে। উপস্থিত ক্ষেত্রে তিনি স্বপ্রণোদিত হইয়া অযাচিত ভাবে অগ্রসর হইলেন, এবং যথারীতি পূত হইয়া, "দিন্ আমি মুখে তুলে দিচ্ছি," বলিয়া যেমন থালা হইতে অন্নাদি তুলিয়া লোকনাথ বাবার মুখের দিকে হাত বাড়াইলেন অমনি মহাপুরুষ তাঁহার মুখ পিছন দিকে সরাইয়া নিলেন। চক্রবর্ত্তী ইহার ইঙ্গিত বুঝিতে না পারিয়া, অন্নসহ নিজ হস্ত আরও প্রসারিত করিলেন। লোকনাথও তাঁহার মুখ আরও সরাইলেন। এইরূপে চক্রবর্ত্তীর হাতও অগ্রসর হইতেছে, আর বাবার মুখমণ্ডলও পিছন দিকে যাইতেছে। তবুও চক্রবর্ত্তীর হাত নিবৃত্ত হইতেছে না দেখিয়া, বাবা লোকনাথ পার্শ্বস্থিত স্বীয় পাদুকার একটি ডান হাতে তুলিয়া লইয়া, উহা দ্বারা গোটা কয়েক ঘা তাঁহার পৃষ্ঠদেশের বাম পার্শ্বে বসাইয়া দিলেন। প্রহার কিঞ্চিৎ উর্দ্ধ মাত্রায় হওয়ায় চক্রবর্ত্তী অধোবদনে মুখ ঢাকিয়া সেখান হইতে উঠিয়া গেলেন। উপস্থিত সকলেই অবাক্।

কিছুকাল পর বাবা মাকে ডাকিয়া উক্ত ভক্তের খরচায় দৈ-খৈ আনাইয়া চক্রবর্ত্তীর হাতেই কিঞ্চিৎ মুখে লইয়া প্রসাদ করিয়া দিলেন। ভক্তগণ আরও অবাক্ হইল।

বহু দিন হইতে শরচ্চন্দ্র পৃষ্ঠদেশে একটা তীব্র বেদনায় বড়ই কষ্ট পাইতেছিলেন। ডাক্তারী-কবিরাজী চিকিৎসায় বহু অর্থ ব্যয়েও ইহার কোন প্রতিকারই হইতেছিল না। পাদুকা প্রহার ঠিক বেদনার স্থানেই পড়িয়াছিল। বেদনাটি যেমন 'ষাঁড়-গরু', খড়মটিও তেমন সুঁদরী মুগুর[1]; তাতে আবার মাত্রাটিও কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধ; সুতরাং ষাঁড়েরই পরাজয় ঘটিল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় ইহার পর হইতে আর কখনও উক্তস্থানে বেদনার অস্তিত্ব অনুভব করেন নাই।

প্রসঙ্গটিতে পক্ক অন্নাদির অবস্থা বা ব্যবস্থা কি হইল—তাহা অজ্ঞাত। তবে দৈ-খৈ এর ব্যবস্থায় উক্ত ভক্তের মনে কোন প্রকার দুঃখ না থাকারই কথা; বরং ইহা উপলক্ষ করিয়া অপর এক ভক্ত রোগমুক্ত হইলেন—ইহা আনন্দের বিষয়।

"যা, তোর গুরু উঠবে"

১২৯৪ সনের[2] বৈশাখ মাস। শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে ঢাকা হইতে দ্বারভাঙ্গা গিয়াছেন। সেখানে যাওয়ার কিছুকাল পরই তিনি নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হন। রোগটি দেখিতে দেখিতে সাঙ্ঘাতিক অবস্থায় পরিণত হইল। সেখানকার বিশিষ্ট চিকিৎসকদের আপ্রাণ যত্ন-চেষ্টায়ও কোন ফল দেখা গেল না। তাঁহারা গোস্বামী মহাশয়ের জীবনের আশা ত্যাগ করিলেন।

ঢাকায় টেলিগ্রামে এই পীড়ার সংবাদ আসিল। গোস্বামী মহাশয়ের পরিবারস্থ সকল লোক, তাঁহার ভক্তগণ ও বন্ধু-বান্ধবেরা সকলেই হঠাৎ এই নিদারুণ সংবাদে বিশেষ চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। সংবাদ পাইয়াই তাঁহার শাশুড়ী মাতা, স্ত্রী, পুত্র

১ সুঁদরী বা সুন্দরী বৃক্ষবিশেষ।
২ ইংরাজি সন ১৮৮৭।

যোগজীবন ও কয়েক জন ভক্ত নারায়ণগঞ্জ হইয়া গোয়ালন্দ ষ্টীমারে দ্বারভাঙ্গা অভিমুখে রওনা হইলেন।

ঠিক সেই দিনই গোস্বামী মহাশয়ের প্রাণতুল্য প্রিয় শিষ্য শ্যামাচরণ বক্সী মহাশয় লোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবার উদ্দেশ্যে ঢাকা হইতে রওনা হইয়া বারদীর আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাবাকে প্রণাম করিয়া, অতি কাতরভাবে বক্সী মহাশয় দ্বারভাঙ্গায় তাঁহার গুরু গোস্বামী মহাশয়ের পীড়ার সংবাদ জানাইয়া, তাঁহার প্রাণ ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন, এবং প্রয়োজন হইলে তিনি স্বীয় অবশিষ্ট পরমায়ু পর্য্যন্ত গুরুর প্রাণ রক্ষার্থে উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত আছেন,—একথাও নিবেদন করিলেন। ব্রহ্মচারী বাবা বক্সী মহাশয়ের ঐকান্তিক গুরুভক্তি দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন, এবং কিয়ৎক্ষণ তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন, "যা, তোর গুরু উঠবে।"

ব্রহ্মচারী বাবার এই আশ্বাস-বাণীতেও শ্যামাচরণের প্রাণের ব্যাকুলতা দূর হইল না। তিনি নিজকে আরও নিশ্চিত রূপে আশ্বস্ত করার জন্য পুনরায় বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি বল্‌ছ তিনি উঠবেন?" বক্সী মহাশয়ের ব্রহ্মচারী বাবাকে "তুমি" সম্বোধনের মধ্যে তাঁহার প্রাণের সকল আবেগ ও ভক্তি বাবার শ্রীচরণতলে নিঃশেষিত হইয়া পড়িল।

বক্সীর প্রশ্নের উত্তরে বাবা জোর দিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, আমি বলছি—উঠবে।"

বক্সী মহাশয় নিশ্চিত হইলেন।

ঠিক এই সময়ে গোয়ালন্দ ষ্টীমারে ব্রহ্মচারী বাবার "উঠবে" কথাটির প্রতিক্রিয়া দৃষ্ট হইল। পদ্মাবক্ষে গোয়ালন্দগামী ষ্টীমার চলিয়াছে—সবেগে। গোস্বামী মহাশয়ের জন্য ব্যাকুল যাত্রীদের মন বুঝিবা আরও অধিকতর বেগে অগ্রসর হইতেছে। তাঁহাদের মন আকুল, মুখ-মণ্ডল বিষণ্ণ। দিনের আলো তখনও শেষ হয় নাই।

পুত্র যোগজীবন মুক্ত পশ্চিম আকাশে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন,—আর কত কথা পদ্মাবক্ষে ঢেউয়ের মত তাঁহার মনে উঠিতেছে—পড়িতেছে। হঠাৎ তাঁহার দৃষ্টিতে আকাশ-পথে একটি মূর্ত্তি ভাসিয়া উঠিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করিয়া তিনি অঙ্গুলি সঙ্কেতে বলিয়া উঠিলেন, "ঐ দেখ, ঐ দেখ, ব্রহ্মচারী মহাশয়ও যাচ্ছেন।"

তাঁহার এই কথা শুনিয়া, তাঁহার দিদিমা, মা প্রভৃতি সকলেই চমকিত হইয়া আকাশের দিকে তাকাইলেন, তাঁহারা দেখিলেন,—পশ্চিম আকাশে সূর্য্যালোক হাসিতেছে। আকাশ পথে যোগ-জীবনকে ব্রহ্মচারী বাবার এই দর্শন-দান তাঁহাদের মনে অনেকখানি আশার সঞ্চার করিয়া দিল।

আর দ্বারভাঙ্গায়? সেখানে গোস্বামী মহাশয়ের অন্তিম-কাল উপস্থিত। চিকিৎসকগণ তাঁহার প্রাণের আশা আগেই ত্যাগ করিয়াছেন। আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় ভক্তগণ বিমর্ষ। এমন সময় রোগীর শয্যার পার্শ্বে এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটিতে দেখা গেল,—থাকিয়া থাকিয়া দীর্ঘাকৃতি জটাজূটধারী মহাপুরুষদের আবির্ভাব হইতে লাগিল। ভক্তগণের মধ্যে কেহ কেহ রোগীর শয্যার চতুর্দ্দিকে ইঁহাদের দর্শন-লাভও করিলেন।

* * * *

এমন সময় যোগজীবন সকলকে লইয়া দ্বারভাঙ্গায় পৌঁছিলেন, এবং যেখানে পিতৃদেব আছেন সেখানে উপস্থিত হইলেন। জামাতার দেহখানা অসাড় অবস্থায় শয্যায় পড়িয়া রহিয়াছে দেখিয়া বৃদ্ধা শাশুড়ীমাতা শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিয়া চোখ বুজিয়া আকুল প্রাণে লোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবাকে "রক্ষা কর" "রক্ষা কর" বলিয়া মনে মনে ডাকিতে লাগিলেন।

প্রার্থনা-রত অবস্থায়ই তিনি দেখিতে পাইলেন,—ব্রহ্মচারী বাবা জামাতার নিকট উপস্থিত হইয়া "উঠ্" বলিয়া তাঁহার

হাত ধরিয়া তাঁহাকে শয্যার উপর বসাইয়া দিলেন, এবং পর মুহূর্ত্তেই অদৃশ্য হইয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার এই পরিবেশ ভাঙ্গিয়া গেল, এবং চোখ খুলিয়া তিনি দেখিলেন,—জামাতার দেহের অসাড়তা দূর হইয়া গিয়াছে, তাঁহার অবস্থা প্রায় স্বাভাবিক। সকলেই বুঝিল—সঙ্কট-মুহূর্ত্ত কাটিয়া গিয়াছে।

ঢাকায় সংবাদ আসিল—গোস্বামী মহাশয় আরোগ্য লাভ করিতেছেন।

গোস্বামী মহাশয়ের পুনর্জীবন লাভ হইল। ঢাকায় ফিরিয়া আসিয়া কিছুকাল বিশ্রামের পর তিনি ব্রহ্মচারী বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য বারদী গেলেন। উভয়ে উভয়কে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। ব্রহ্মচারী বাবা তাঁহাকে বলিলেন, "দ্বারভাঙ্গায় যেয়ে আমি তোকে প্রথম ঘরে দেখতে পাইনি।"

গোস্বামী মহাশয়। আমার গুরুদেব পরমহংসজী আমাকে নিয়ে তাঁহার নিজের নিকট রেখেছিলেন।

লোকনাথ বাবার "ঘরে দেখতে পাই নি" কথাটিতে গোস্বামী মহাশয়ের জীবাত্মা-বিমুক্ত অসাড় দেহখানি বলিয়াই মনে হয়। বাবার কথার উত্তরে কৃতজ্ঞকণ্ঠে গোস্বামী মহাশয় বলিলেন যে স্বীয় গুরু পরমহংসজীর আশ্রয়ে তখন তাঁহার সূক্ষ্মদেহ অবস্থান করিতেছিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের উক্তিটির সঙ্গে তাঁহার বৃদ্ধা শাশুড়ী মাতার লোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবার নিকট, "রক্ষা কর," "রক্ষা কর" বলিয়া কাতর প্রার্থনার সংযোগ থাকা সম্ভবপর। শ্রীশ্রীব্রজানন্দ পরমহংসজী[১] ও শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী উভয়েই গোস্বামী মহাশয়ের নিকটতম হিতকারী। অধিকন্তু ব্রহ্মচারী লোকনাথ বারদীর আশ্রমে ভক্ত শ্যামাচরণ বক্সীকে বাক্যদান করিয়াছেন, "তোর গুরু উঠবে।" এই সকল অবস্থা

১ গোস্বামী মহশেয়ের গুরুদেব।

সংযোগে গোস্বামী মহাশয়ের অসাড় দেহে, পরমহংসজীর নিকট হইতে তাঁহার সূক্ষ্ম আত্মার পুনরাগমন করাইয়া, "উঠ্" বলিয়া তাঁহাকে হাত ধরিয়া শয্যার উপর বসাইয়া দিয়া—শাশুড়ী মাতার কাতর প্রার্থনায় সাড়া দেওয়ার ঘটনাটি লোকনাথ বাবার কৃপা-বিতরণ বলিয়া মনে হয়। হয়তো পুণ্যাত্মা গোস্বামী মহাশয়ের পরম আয়ুঃ শেষ হইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু এ দেহে তাঁহার আরও কিছু কর্ম্ম বাকী রহিয়াছে[১], সুতরাং তাঁহার গুরুদেব তাঁহার সূক্ষ্ম-দেহখানি উঠাইয়া নিয়া স্বীয় রক্ষণাবেক্ষণে রাখিয়াছিলেন। আর এ দিকে ভক্তবীর শ্যামাচরণ ও তাঁহার স্বীয় অবশিষ্ট আয়ুস্কাল আপন গুরুর প্রাণ-রক্ষার্থে উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত আছেন। এইরূপ অবস্থায় পমহংসজীর নিকট হইতে খাঁচার পাখী আনিয়া পুনঃ খাঁচায় রাখিয়া দেওয়া মহাপুরুষ লোকনাথের পক্ষে স্বাভাবিক ; বিশেষতঃ তিনিও গোস্বামী মহাশয়কে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। এক আধারেই ঘটনাটি বিয়োগান্ত ও মিলনান্ত।

মহাপুরুষদের কার্য্য পলকে সাধিত হয়। আর ভক্তি বা প্রার্থনা সম্বন্ধে মহাকবি অ্যাল্‌ফ্রেড্ লর্ড টেনিসানের অমর বাক্য এখানে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়া গিয়াছেন,—পৃথিবীর লোকের স্বপ্নেরও অগোচর বিষয়সমূহ প্রার্থনায় সাধিত হয়[২]।

ধন্য বক্‌সী মহাশয়, তোমার গুরুভক্তি !

১ এই ঘটনার পরও তিনি বার বৎসর দেহ ধারণ করিয়াছিলেন। লোকনাথ বাবা এই ঘটনার তিন বৎসর পর দেহ-রক্ষা করেন।

২ লর্ড টেনিসান্ ইংলণ্ডেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার দরবারে রাজ-কবি ছিলেন। তাঁহার "The Passing of Arthur" নামক গ্রন্থে রাজা আর্থার্ তাঁহার জীবনের শেষ যুদ্ধে সাঙ্ঘাতিক রূপে আহত হইয়া, তাহার বার জন Knights এর মধ্যে জীবিত একমাত্র স্যার চার্লস্ বেডিভি-য়ার কে চিরবিদায় বাণীতে বলিতেছেন,

"Pray for my soul. More things are wrought by prayer
Than this world dreams of."

আমার আত্মার জন্য প্রার্থনা কর। এই পৃথিবীর স্বপ্নের অতীত অধিকতর বিষয়সমূহ প্রার্থনায় সাধিত হয়।

জীবন্ত শিবের ফটো

লিখিতেছি আর মনে হইতেছে—জীবন্ত শিবের আশ্রম-পরিবেশের মধ্যেই পরম শান্তিতে কাল কাটাইতেছি। কিন্তু "জীবন্ত শিবের ফটো" বিষয়টি আরম্ভ করিতেই আমাদের প্রাণে বড় আঘাত লাগিতেছে। তবে কি ব্রহ্মচারী বাবার এই মহা-মানব দেহের পরিবর্তন ঘটার দিন অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। এতদিন তো ফটো তোলার কথা কেহ ভাবে নাই। ব্রহ্মচারী বাবার ফটো তোলার কথা হঠাৎ সর্ব্বপ্রথম ভাওয়াল-রাজের মনে উদয় হইল কেন? ইহার উত্তর—বাবার ইচ্ছাই ভাওয়াল-রাজের ইচ্ছা।

রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী বাহাদুর বাবাজীর আশ্রমে আসিয়াছেন। সঙ্গে তাঁহার বহু লোকজন। তিনি দুইটি বিকল্প উদ্দেশ্য লইয়া এইবার উপস্থিত হইয়াছেন।

ভাওয়াল রাজবাড়ী[১] জয়দেবপুর গ্রামে অবস্থিত। গ্রামের উত্তর দিক দিয়া বার-মাস জোয়ার-ভাটা খেলে এমন একটি খাল বহিয়া গিয়াছে। এই খালের দক্ষিণ পারে রাজার পিতা-পিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষগণের শ্মশান-ভূমি। প্রত্যেক শ্মশান-ভূমির উপর একটি করিয়া বিরাট সুরম্য পঞ্চরত্ন মঠ, এবং প্রত্যেক মঠে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। বিশালকায় বৃক্ষাদির ছায়া স্থানটি সুশীতল করিয়া রাখিয়াছে। সঙ্গেই অতি সযত্নে রক্ষিত একটি শান-বাঁধান পুকুর। স্থানে স্থানে ফুলের বাগান শোভা পাইতেছে। স্থানটি শ্মশান বটে, কিন্তু চিত্তাকর্ষক। ইহার গভীর নিস্তব্ধতা মনে উদাস ভাব জাগাইয়া দেয়। এই শ্মশান-বাড়ীর নাম শ্মশানেশ্বর। রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের একান্ত অভিলাষ হইল,—তিনি শ্মশানে-শ্বরে একটি সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া, তাহাতে "জীবন্ত শিব" প্রতিষ্ঠিত করিবেন। ব্রহ্মচারী বাবার প্রতি রাজা বাহাদুরের প্রগাঢ়

১ বর্ত্তমানে ইহা পাকিস্থান গভর্ণমেণ্টের অফিস কাছারীতে পূর্ণ।

ভক্তি ছিল, এবং তিনি তাঁহাকে জীবন্ত শিব ভাবিয়াই ভক্তি করিতেন। বারদীর আশ্রমে আসিয়া তিনি বাবাকে তাঁহার প্রার্থনা জানাইলেন। উত্তরে বাবা তাঁহাকে বলিলেন, "আমি ত সর্ব্বত্রই আছিরে।"

"আমি ত সর্ব্বত্রই আছিরে"—বাবার আশ্বাস-বাক্যে রাজা বাহাতুরের "জীবন্ত শিব" প্রতিষ্ঠা করার আশা পূর্ণ হওয়ার আর কোন সম্ভাবনা রহিল না। তখন তিনি তাঁহার বিকল্প প্রার্থনা তাঁহাকে জানাইলেন। এবার রাজাবাহাতুর যন্ত্রপাতিসহ একজন ফটোগ্রাফার সঙ্গে আনিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা বাবার ফটো তোলাইবেন। ফটো তোলার প্রস্তাবে ব্রহ্মচারী বাবা রাজা বাহাতুরকে বলিলেন, "এই দেহ ত অনিত্য, ইহার আবার একটা নকল রেখে কি হবে রে?"

রাজা বাহাতুর। আপনার দেহ-নকল যার ঘরে থাকবে, তার গৃহ পবিত্র হবে, গৃহস্বামীর সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল হবে। আপনি অনুগ্রহ করে একটু বাইরে আসুন, আমি আমার অভিলাষ পূর্ণ করি।"

বাবা। যদি দশের মঙ্গল হয়, তবে আমি বাইরে আসতে পারি।

ব্রহ্মচারী বাবা ঘরের ভিতর হইতে বারান্দায় আসিয়া আসন করিয়া বসিলেন। ফটোগ্রাফার যন্ত্রাদি ঠিক করিয়া বোতাম টিপিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়ম অনুসারে ফটোগ্রাফার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয়বার ফটো তুলিয়া থাকে। এ ক্ষেত্রে বাবা একবার বই তু'বার ফটো নিতে দিলেন না। ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা প্রথম বারেই ভক্তের জন্য ঠিক হইয়া বসিয়াছিলেন; দ্বিতীয় বার বোতাম টিপিলে, ফটো-ভঙ্গিমায় উনিশ-বিশ ঘটিতে পারে,—হয় ত এই ভাবিয়াই তিনি রাজি হন নাই। সুতরাং জীবন্ত শিবের ফটো তোলা এই প্রথম, আর এই শেষ।

রাজা বাহাদুরের আশা পূর্ণ হইল; অর্থাৎ "দেহ-নকলে গৃহ পবিত্র হবে এবং গৃহস্বামীর সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল হবে"—প্রার্থনাটিও বাবা মঞ্জুর করিলেন।

দেহরক্ষার আভাস

ঢাকা-পশ্চিমদীর শ্রদ্ধেয়া অন্নদা দাসী বিধবা কুলমহিলা। তিনি বাবার প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণা। তাঁহার নিষ্ঠা ও ভক্তি দেখিয়া ব্রহ্মচারী বাবা তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, এবং "মা" বলিয়া ডাকিতেন। একদিন এই মহিলার সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে মহাপুরুষ যেন অন্যমনস্ক হইয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন, "দেহটি যেন একটি পাখীর খাঁচা, মা," অর্থাৎ পাখী উড়িয়া গেলেই, খাঁচা পড়িয়া থাকিবে। বাবার এই উক্তিটিতে মা অন্নদা চমকিয়া উঠিলেন! কিন্তু বাবাকে এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন করিতে তাঁহার সাহস হইল না। বাবার এই উক্তিটি ভক্ত-মহলে ছড়াইয়া পড়িল, এবং সকলেই গভীর উৎকণ্ঠা বোধ করিতে লাগিল।

নিবৃত্ত্যাত্মক মহাপুরুষ

বারদী-নিবাসী কোন এক ব্যক্তির যক্ষ্মারোগ হয়। তাহার অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক। তাহার আত্মীয়েরা আসিয়া রোগীর নিরাময়ের জন্য ব্রহ্মচারী বাবাকে ধরিয়া পড়িল। বাবা জানিলেন, ব্যাধি দুরারোগ্য। যদিও বা আরোগ্য হয়, তথাপি ইহার ফল দূরপ্রসারী হইবে না। কিন্তু রোগীর নিকট-আত্মীয়েরা কিছুতেই বাবাকে ছাড়িল না। তখন পরম দয়াল লোকনাথ রোগীর দেহ হইতে রোগটি তুলিয়া লইয়া নিজের দেহে ইহাকে আশ্রয়

১ ক। কনিষ্ঠ পুত্র পুরু পিতা যযাতির জরা গ্রহণ করিয়াছিলেন—মহাভারত।
খ। কথিত আছে মোগল সম্রাট্ বাবর প্রার্থনা দ্বারা পুত্র হুমায়ুনের দেহ হইতে রোগ স্বীয় দেহে আনয়ন করিয়াছিলেন।

দিলেন[১]। লোকটি এই দুরারোগ্য ব্যাধির কবল হইতে মুক্তি লাভ করিল বটে, কিন্তু বেশী দিন টিকিল না, অন্য এক রোগে আক্রান্ত হইয়া কিছুকাল পর প্রাণত্যাগ করিল।

এই উৎকট ব্যাধি বাবা লোকনাথের দেহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ইহার ক্রিয়া করিতে লাগিল। ফলে তাঁহার দেহখানি ক্রমে শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় প্রথম দর্শনের পরই ব্রহ্মচারী বাবা সম্বন্ধে কামিনী নাগ মহাশয়ের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন, "তিনি নিবৃত্ত্যাত্মক মহাপুরুষ; ইচ্ছা করিলেই যে কোন মুহূর্ত্তে তিনি দেহরক্ষা করিতে পারেন, অথবা যতদিন ইচ্ছা দেহ ধারণ করিতে পারেন।"

বারদী গ্রামের চতুর্দ্দিকে, নিকটবর্ত্তী ও দূরস্থিত মুসলমানদেরও গোসাঁই বাবার উপর অটুট বিশ্বাস ছিল। আপদ-বিপদে তাহারা তাহার আশ্রয়প্রার্থী হইত, এবং মানত করিয়া যাইত। বিপদ কাটিয়া যাওয়ার পর, তাহারা দুধ, মিছরি ও নানাবিধ ফল তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিয়া মানত শোধ করিত[২]।

১ লোকের হিতার্থে মহাপুরুষগণ সবই করিয়া থাকেন।
২ দেশ বিভাগের পরও গোসাঁইর আশ্রমের মাহাত্ম্য মুসলমানদের নিকটও অটুটই রহিয়াছে।

বাহ্যলীলা সম্বরণ ও দেহরক্ষা

মহাপুরুষ লোকনাথ তাঁহার বর্ত্তমান লৌকিক দেহরক্ষার দিন নির্দ্ধারণ করিয়া ফেলিলেন। বাহ্যলীলা সম্বরণের আট দিন পূর্ব্বের কথা। ভক্তগণ উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় ব্রহ্মচারী বাবা তাঁহাদিগকে প্রশ্ন করিলেন, "বল ত দেহ পতন হ'লে কিরূপ সৎকার বিধেয় ?"

ভক্তগণের মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন, "অগ্নি-সংযোগে", কেহ, "জল-সমাধিতে", আবার অন্য কেহ, "মৃত্তিকা গর্ভে।"

"উন্মুক্ত প্রান্তরে রেখে দিলেও সৎকার হয়", সকলের শেষে বাবা বলিলেন। তিনি আরও বলিলেন, "আমি নিত্যপদার্থ, আমার নাশ নেই, সুতরাং আমার শ্রাদ্ধও নেই।"

মৃত্যুর পর শবদেহ কিরূপে জীব সেবায় লাগিতে পারে, তাহা তিনি তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন,—জলে ভাসাইয়া দিলে মৎস্য, কচ্ছপাদিতে ইহা খাইয়া তৃপ্তি লাভ করে; মাটিতে পুঁতিয়া রাখিলে পিপীলিকা ও কীটাদির সেবায় লাগে; মাঠে ফেলিয়া দিলে শকুন-গৃধিনী, শৃগাল-কুকুর ইত্যাদির আহার্য্য হয়; আর দগ্ধ করিয়া ফেলিলে যখন তখন পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়।

"আমার দেহ পতন হ'লে, ইহা অগ্নি-সংযোগে সৎকার করবে," বলিয়া সে দিনের মত তিনি সকলকে বিদায় দিলেন। ভক্তগণ বুঝিলেন—বাবার দেহরক্ষা আসন্ন। দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাঁহারা নিজ নিজ গৃহে ফিরিলেন। সংবাদটি শীঘ্রই চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। পরদিন হইতে দিনের পর দিন আশ্রমে ভক্ত সমাগম বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বাবাকে শেষ দেখা দেখিবার জন্য সকলেরই প্রাণ কাঁদিতেছে, সকলেই বিষণ্ন। আশ্রমে আসিয়া আর তাহাদের বাড়ী ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা হইতেছে না।

ইহার মধ্যে এক দিন সমবেত ভক্তমণ্ডলীর নিকট বাবা বলিলেন, "আমার দেহ-রক্ষা যদি উত্তরায়ণের দিবাভাগে হয়, এবং সূর্য্য নির্ম্মল আকাশে কিরণ দিতে থাকেন, তবে তোমরা বুঝবে, আমি সূর্য্যরশ্মি অবলম্বন করে চলে গিয়েছি, আমার পুনরাবৃত্তি হবে না।" বাবার কথা কয়টি শুনিয়া ভক্তগণ অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

এই সময় একটি অভাবনীয় ঘটনা ঘটিল। বাংলা ১২৯৭ সনের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার সন্ধ্যার পর এক সৌম্যমূর্ত্তি সন্ন্যাসী বারদীর বিখ্যাত পুরোহিত-বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনিই লোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবার অতি প্রিয় শিষ্য পরিব্রাজক রামকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়।

পরদিন অতি প্রত্যুয়ে বারদী-নিবাসী বৃদ্ধ চন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া পরিব্রাজক রামকুমার ব্রহ্মচারী বাবার আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আশ্রম-গৃহের দ্বার ইতঃপূর্ব্বেই খোলা হইয়াছে। পরিব্রাজক রামকুমার সরাসরি বাবার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং কতক সময় নিভৃতে গুরুদেবের সঙ্গে কাটাইলেন। চন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয় বারান্দায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। গুরু-শিষ্যের এই মহামিলনে উভয়েই পরম প্রীতি লাভ করিলেন। কিছুক্ষণ পর চন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ডাকিয়া ভিতরে আনিয়া,—আজই পূর্ব্বাহ্নে বাবা তাঁহার মহা-প্রয়াণের কাল নির্দ্ধারণ করিয়াছেন—একথা তিনি তাঁহাদের দুজনের নিকট প্রকাশ করিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে আরও নির্দ্দেশ দিলেন যে তাঁহার পরিত্যক্ত দেহ দাহ করা হইবে, এবং প্রিয় শিষ্য রামকুমার ইহার মুখাগ্নিক্রিয়া সম্পন্ন করিবেন।

ইতিমধ্যেই ভক্ত সমাগম আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। শীর্ণকায় ব্রহ্মচারী বাবার পার্শ্বেই আসনোপবিষ্ট পরিব্রাজক শিষ্য রামকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রশান্ত ও সমুজ্জ্বল মূর্ত্তিখানি দর্শন করিয়া

সকলেই নয়ন সার্থক করিল। বিশেষ করিয়া গোণার দিনগুলিতে ব্রহ্মচারী বাবার এমন এক জন সন্ন্যাসী শিষ্যের আগমনে, অনেকের মনেই অনেক কথার উদয় হইতে লাগিল। গুরু ভগবান গাঙ্গুলী মহাশয়ের সংবাদ যাঁহাদের জানা ছিল তাঁহারা ভাবিলেন, তবে কি ইনিই গুরু ভগবান গাঙ্গুলী।

উত্তরায়ণের শুক্লপক্ষ। আজ ১৯শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার। আকাশ নির্ম্মল। প্রাতঃকালীন সূর্য্যদেবের স্নিগ্ধ কিরণ ক্রমশঃ প্রখর হইয়া ধরাতল ছাইয়া ফেলিতে লাগিল। বাবা প্রত্যুষেই আদেশ করিয়াছিলেন যে আশ্রমবাসীদের আহারাদি সকাল নয় ঘটিকার মধ্যেই শেষ করিতে হইবে। দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে ও অশ্রুপূর্ণ-লোচনে মা আজ পুত্রের শেষ বাল্য-ভোগ প্রস্তুত করিয়া দিলেন। বাবা প্রসাদ করিয়া দেওয়ার পর, উপস্থিত ভক্তগণ প্রসাদ পাইলেন। বেলা দশটার সময় তিনি অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন--আশ্রমের সকলেরই আহারাদি ক্রিয়া শেষ হইয়া গিয়াছে।

বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুমুসলমান ভক্ত-সমাগম বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পৃষ্ঠদেশ হেলান দেওয়ার জন্য কাষ্ঠফলকখানি গৈরিক বস্ত্রে আবৃত করা হইল। বেলা ১১-৪০ মিনিটের সময় বাবা মহাযোগাসনে উপবেশন করিলেন। সকলেই বুঝিল, এই তাঁহার শেষ আসন-গ্রহণ। কাহারও মুখে কোন কথা সরিতেছে না, সকলেই নীরব ও বিষণ্ণ। স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই অশ্রুভারাক্রান্ত অস্পষ্ট দৃষ্টি আসনস্থ সেই মূর্ত্তিখানিতে নিবদ্ধ। ইহা তাঁহার সমাধি অবস্থা কিনা, তাহা তাঁহার পলকহীন নয়ন-যুগল দেখিয়া কাহারও বুঝিবার শক্তি নাই। ইতঃপূর্ব্বে অনেক সময় তিনি কথা-বার্ত্তা বলিতে বলিতে হঠাৎ সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেন। তখন তাঁহার পলকহীন নয়ন দেখিয়া, কাহারও বুঝিবার শক্তি থাকিত না—তিনি দেহে আছেন কিনা। তিনি নিজেই বলিতেন

যে সমাধি অবস্থায় তাঁহার আত্মা দেহ হইতে "আলগ্"[১] হইয়া যায়; সুতরাং তাঁহার তখনকার সেই অবস্থায় ভক্তদের মধ্যে কেহ কেহ ভাবিতেছেন—আজও পূর্ব্বের ন্যায় তিনি সমাধিস্থই আছেন। আবার কেহ কেহ ভাবিতেছেন,—তিনি দেহ হইতে আলগ্ হইয়া দেহ-রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু পাছে তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হয়—এই আশঙ্কায় কেহই তাঁহার অঙ্গস্পর্শ করিতে সাহস পাইতেছেন না। অবশেষে শিষ্য রামকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অনুমতিক্রমে দেহখানি স্পর্শ করা হইল। স্পর্শে বেলা ১১-৫৫ মিনিটের সময় জানা গেল—তিনি চিরদিনের জন্য লৌকিক দেহখানি ছাড়িয়া উজ্জ্বল সূর্য্যরশ্মি অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মলোকে চলিয়া গিয়াছেন। তখন পবিত্র যোগদেহ-যষ্টিখানি ঘর হইতে বাহিরে আনিয়া বিল্ববৃক্ষের তলায় রাখা হইল।

এই সংবাদ শুনিয়া চতুর্দ্দিক হইতে আরও শত শত লোক আসিয়া পুণ্যময় দেহখানি দর্শন করিতে লাগিল। বারদীর চতুর্দ্দিকে সাত-আট মাইলের মধ্যে হাট-বাজার ও গৃহস্থের বাড়ীতে যত ঘৃত ও চন্দনকাষ্ঠ ছিল, অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাহা সংগৃহীত হইয়া গেল। আশ্রমের দক্ষিণাংশের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বকোণে চন্দন-কাষ্ঠের শেষ শয্যা রচিত হইল। শিষ্য রামকুমার শাস্ত্রমত দেহখানির শিরঃস্থলে সর্ব্বপ্রথম অগ্নি সংযোগ করিলেন। অতঃপর ভক্তগণ নাম-কীর্ত্তন করিতে করিতে ঘৃত চন্দনকাষ্ঠ সংযোগে প্রজ্জ্বলিত চিতায় মহাসমারোহে দাহ-ক্রিয়া সমাধা করিলেন।

সুদীর্ঘ ইতিহাসপূর্ণ একশত ষাট বৎসরের লৌকিক মূর্ত্তিখানি বৈশ্বানর দেখিতে দেখিতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে পঞ্চভূতে মিশাইয়া দিলেন।

গুরু লোকনাথের দেহরক্ষার পর রামকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয় চার-পাঁচ দিন আশ্রমে অবস্থান করেন। এই সময় তিনি ফল-মূল

১ আলগ্—পৃথক।

আহার ও হস্ত-উপাধানে ভূমিতলে শয়ন করিতেন। ইহার পর তিনি কাশীধাম চলিয়া যান, এবং অল্প কিছুকাল পরই সেখানে মণিকর্ণিকার ঘাটে যোগাসনে দেহত্যাগ করেন। লোকনাথ বাবার গুরু ভগবান গাঙ্গুলী মহাশয়ও বহু পূর্ব্বে মণিকর্ণিকার ঘাটেই যোগাসনে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মচারী বাবার ভক্তদের মধ্যে অনেকেই মনে করেন যে, পরিব্রাজক রাজকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বারদীতে এই অপ্রত্যাশিত আগমন, বাবার পরিত্যক্ত দেহের মুখাগ্নিকরণ ও বারদী ত্যাগ, এবং ইহার কিছু কাল পরই মণিকর্ণিকার ঘাটে দেহত্যাগ[১]—পর পর এই ঘটনাগুলিতে যেন একটা সাক্ষাৎ সম্বন্ধ রহিয়াছে। তাঁহাদের মতে দেহরক্ষার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে ব্রহ্মচারী বাবাই স্বীয় যোগবলে প্রিয় শিষ্য রামকুমার চক্রবর্ত্তী তথা পূর্ব্বজন্মের ভগবান গাঙ্গুলী মহাশয়কে সুদূর তীর্থাদি স্থান হইতে বারদীতে আনাইয়া,—এবং যথাবিহিত অনুষ্ঠানাদি করিয়া,—ব্রহ্মশক্তি লাভের অব্যবহিত পর গুরু ভগবান গাঙ্গুলী মহাশয়ের নিকট তিনি যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন, তাহা হইতে মুক্ত হইলেন। লোকনাথ যেমন গুরু ভগবানের শেষ কৃত্যাদি সমাধা করিয়াছিলেন, রামকুমারও তেমন গুরু লোকনাথের শেষ কৃত্যাদি সম্পন্ন করিলেন। এই সকল ঘটনা-সূত্র হইতে ইহাই মনে হয় যে মুখ্যতঃ পরম আরাধ্যা মাতৃদেবী কমলার অপত্য-স্নেহের অতৃপ্ত বাসনা পূরণ ও সংসারত্যাগী গুরু ভগবান গাঙ্গুলীর আত্মার উদ্ধার সাধনের জন্যই সুদূর চীনদেশ হইতে গুরুকল্প হিতলাল মিশ্র ঠাকুরের আদেশে মুক্তপুরুষ লোকনাথ নিম্নভূমি বারদীতে আগমন করেন।

১ এই বিবরণটি ত্রিপুরা জিলার বিখ্যাত বিদ্যাকুট গ্রামের অতি বৃদ্ধ পণ্ডিত অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট হইতে ব্রহ্মচারী বাবার পরমভক্ত ৺নিশিকান্ত বসু মহাশয় স্বয়ং সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। রামকুমার চক্রবর্ত্তী অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জ্যেষ্ঠতাত-ভগ্নীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। অমর ভট্টাচার্য্য শেষ জীবনে বারদীতে তাঁহার ভগ্নীর নিকট থাকিতেন। অমর ভট্টাচার্য্য ও রামকুমার প্রায় সমবয়সী ছিলেন।

দাহ-কৃত্যাদির পর ভক্তগণের মধ্যে অনেকের নিকটই আশ্রম-ঘর তথা সমগ্র আশ্রমখানি শূন্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল। মায়ামুগ্ধ জীবের পক্ষে এরূপ মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। ছাব্বিশ বৎসরের এই আসনখানা বাবার লৌকিক দেহ স্পর্শ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে বটে, কিন্তু ভক্তমাত্রেরই হৃদয়-আসনে তিনি আসীন আছেন ও থাকিবেন, এবং ইহাই আমাদের একমাত্র সম্বল। বাবা নিজেই ভাওয়াল-রাজকে আশ্বাস দিয়াছিলেন, "আমি ত সর্ব্বত্রই আছিরে।" এই আশ্বাস-বাণীই আমাদের রক্ষা-কবচ।

শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের ব্রহ্মচারী বাবার দেহরক্ষার সংবাদ প্রাপ্তি[১]

ডেপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর সুরেশচন্দ্র সিংহ মহাশয় তখন যুবক, কলিকাতায় বিদ্যাভ্যাস করিতেছেন। জীবনের প্রারম্ভ হইতেই ধর্ম্মালোচনা করিতে তাঁহার বড় ভাল লাগিত। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও বাবা লোকনাথকে তিনি অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। গোস্বামী মহাশয়ের পুত্র যোগজীবনের সহিত তাঁহার আন্তরিক বন্ধুত্ব ছিল।

গোস্বামী মহাশয় তখন শ্রীবৃন্দাবন ধামে বাস করিতেছিলেন, সঙ্গে পুত্র যোগজীবন। বাবা লোকনাথ ১২৯৭ সনে ১৯শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার বারদীতে যে সময়ে দেহ-রক্ষা করেন, ঠিক সেই সময় শ্রীবৃন্দাবন ধামে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ধ্যানস্থ ছিলেন; সূক্ষ্ম দেহে ব্রহ্মচারী বাবা সেখানে উপস্থিত হইয়া স্বীয় দেহ-রক্ষার সংবাদ তাঁহাকে দিয়া যান। ধ্যান ভঙ্গ হইলে, তিনি

১ এই ঘটনাটির মর্ম্ম "ধর্ম্মসার সংগ্রহ"-প্রণেতা শ্রীযামিনীকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট লিখিত ডেপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর সুরেশচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের পত্র হইতে গৃহীত।

এই সংবাদ যোগজীবনকে জানান। গোস্বামী মহাশয়ের ধ্যানে প্রাপ্ত এই সংবাদ আবার যোগজীবন তখনই কলিকাতায় তাঁহার বন্ধু সুরেশচন্দ্রকে ডাকযোগে প্রেরণ করেন। যোগজীবনের পত্র যে দিন কলিকাতায় সুরেশচন্দ্রের হস্তগত হইল, ঠিক সেই দিনই ঢাকা হইতেও ব্রহ্মচারী বাবার ইহলীলা সম্বরণের পূর্ণ বিবরণ সহ আর একখানা পত্রও তাঁহার নিকট আসিল। উভয় পত্রের তারিখ ও সময় মিলাইয়া সুরেশচন্দ্র দেখিলেন,—বারদীর আশ্রমে ব্রহ্মচারী বাবার দেহ-রক্ষা এবং শ্রীবৃন্দাবনধামে ধ্যানযোগে গোস্বামী মহাশয়ের এই সংবাদ প্রাপ্তি—ঠিক একই সময়ের অগ্র-পশ্চাৎ ঘটনা।

ব্রহ্মচারী বাবা গোস্বামী মহাশয়কে কতই না স্নেহ করিতেন। লৌকিক দেহের শেষ সংবাদটি পর্য্যন্ত তিনি স্বয়ং তাঁহার নিকট প্রকটিত হইয়া তাঁহাকে দিয়া গেলেন।

লৌকিক দেহধারী, কাঙ্গালের নাথ শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবার একশত ষাট বৎসর ব্যাপী জীবনের একাংশ বিবরণ এখানেই সমাপ্ত হইল। ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়া জগতের মঙ্গলের জন্য আরব্ধ তাঁহার সূক্ষ্ম আত্মার নির্লিপ্ত অবিরাম কর্ম্মস্রোতের অতি সামান্য অংশবিশেষ এই গ্রন্থের অপরাংশ। এখানে শুধু আরম্ভ মাত্র।

এই শক্তি অসীম, অনন্ত ও সর্ব্বব্যাপী। জগতের সর্ব্বত্র সকল প্রাণী এই শক্তির কৃপালাভে পূর্ণ ও সম অধিকারী।

কি চাই ?—পূর্ণ বিশ্বাস ও অচলা ভক্তি

এক কথায়—আত্ম-সমর্পণ[১]।

১ যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥ গীতা ৯।২৭

অনুবাদ —হে কৌন্তেয়, তুমি যাহা কিছু কর—ভোজন কর, হোম কর, দান কর বা তপস্যা কর, সবই আমাতে অর্পণ করিবে।

ভক্তি উপাসনার মূল উপাদান। শুদ্ধচিত্ত ভক্তের শ্রদ্ধাপ্রদত্ত পদার্থ ভগবান প্রীতিপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া থাকেন।

তৃতীয় খণ্ড

দেহ-রক্ষা অন্তে

সমাধি-মন্দির

বারদীর লোকনাথ আশ্রম স্থানীয় নাগ জমিদারগণের প্রদত্ত ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত। অনেক সময় ব্রহ্মচারী বাবা উপহাস করিয়া বলিতেন, তিনি নাগ জমিদারদের প্রজা।

বাবার দেহ-রক্ষার পর আশ্রমে তাঁহার সমাধি-ক্ষেত্রের উপর কোন স্মৃতি-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইতেছে না জানিয়া, তাঁহার ভক্ত ভাওয়ালের রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর একটি সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেওয়ার প্রস্তাব করিয়া, তাঁহার একজন বিশিষ্ট কর্ম্মচারীকে বারদীতে নাগ জমিদারদের নিকট পাঠাইলেন। দুঃখের বিষয় ভাওয়াল-রাজের এই প্রস্তাব উপেক্ষিত হইল; জমিদারগণ কর্ম্মচারীটিকে বলিয়া দিলেন যে তাঁহারাই ইহা করিবেন।

আরও বেশ কিছু কাল কাটিয়া গেল; কিন্তু সমাধি-মন্দির নির্ম্মিত হওয়া ত দূরের কথা, মন্দির যে হওয়া উচিত, এ কথাটিও স্থানীয় লোকে ভুলিয়া গেল। অবশেষে ব্রহ্মচারী বাবার পুণ্যশীল ভক্ত ঢাকার শক্তি-ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠাতা মথুরামোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় স্থানীয় জমিদারদের অনুমতি লইয়া এই কার্য্যে ব্রতী হইলেন, এবং তাঁহার ঐকান্তিক উদ্যমে একটি অতি সুন্দর সমাধি-মন্দির নির্ম্মিত হইল।

পূর্ব্ববর্ণিত কলিকাতা হাটখোলার বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী সীতানাথ দাস মহাশয়ের বংশধরগণ এই আশ্রমে ইষ্টক-নির্ম্মিত

একটি অতিথিশালা নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়া অতিথি-অভ্যাগতদের অবস্থানের পক্ষে বড়ই সুবিধা করিয়া দিয়াছেন।

ঢাকায় ব্রহ্মচারী বাবার আশ্রম প্রতিষ্ঠা

ব্রহ্মচারী বাবার দেহ-রক্ষার অল্প কিছুকাল পরই ঢাকা নগরীতে দুইটি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকা উয়ারীতে শিষ্য রজনী ব্রহ্মচারী মহাশয় "ব্রহ্মচারী যোগাশ্রম" প্রতিষ্ঠিত করিয়া শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবার পূজা-অর্চ্চনা করিতেন। এই আশ্রমে বহু ভক্ত সমাগম ও ব্রহ্মচারী বাবার অলৌকিক জীবনী আলোচনা ও নাম-গান ইত্যাদি হইত। "শক্তি-আশ্রম" নাম দিয়া দ্বিতীয় আশ্রম আরম্ভ হয় মথুরামোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের দয়াগঞ্জ স্বামীবাগের শক্তি-ঔষধালয়ের কারখানায়। এখানে অদ্যাবধি দৈনিক পূজা-অর্চ্চনা ও ভোগ-আরতি ইত্যাদি হইয়া আসিতেছে।

ফটো উদ্ধার

ঢাকায় "ব্রহ্মচারী যোগাশ্রম" ও "শক্তি-আশ্রম" প্রতিষ্ঠিত হইল বটে, কিন্তু কোথাও ব্রহ্মচারী বাবার কোনও প্রতিকৃতি ছিল না। বারদীর আশ্রমেও তখন ব্রহ্মচারী বাবার আসন-পিঠ মাত্র। তাঁহার প্রতিকৃতির অভাব সর্ব্বত্রই ভক্তগণ প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে লাগিলেন।

ভাওয়ালের রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর ব্রহ্মচারী বাবার দেহরক্ষার কতক কাল পূর্ব্বে বারদী আশ্রমে যাইয়া তাঁহার ফটো তোলাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তখন তিনি ব্রহ্মচারী বাবার প্রশ্নের উত্তরে তাঁহার নিকট বলিয়াছিলেন যে জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য তিনি এই ফটো দিতেছেন। লোকনাথ বাবার দেহ-রক্ষার পর তিন-চার মাস কাটিয়া গেল। রাজা বাহাদুর যে ফটো

নিয়াছেন, ভক্তদের মধ্যে তাহা বেশীর ভাগ লোকই জানিতেন না। আর যাঁহারা জানিতেন, তাঁহারাও হয় ত রাজা বাহাদুরের নিকট যাইয়া সে বিষয় খোঁজ করা দুঃসাধ্য মনে করিতেন। কিন্তু ভক্তগণ যে ব্রহ্মচারী বাবার মূর্ত্তি-দর্শন প্রার্থী—ইহার কি ব্যবস্থা হইবে?

ফটো তুলিয়া রাজা বাহাদুর ঢাকায় ফিরিয়াছিলেন। সেখানে ক্ষুদ্র আকারে ইহার কয়েকখানা কপি করাইয়া তিনি জয়দেবপুর গেলেন। জয়দেবপুরে তাঁহার বিশিষ্ট প্রতিবেশী ও কর্ম্মচারীদের মধ্যে ঐ সকল কপি বিতরণ করিয়া দিলেন; আর "নিগেটিভ্" খানা তাঁহার নিজের নিকটই রহিয়া গেল।

ব্রহ্মচারী বাবার দেহ-রক্ষার পরবর্ত্তী আশ্বিন মাসে পূজার ছুটির সময় ফরিদপুর চিকন্দীর উকিল ভক্ত গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় ঢাকায় রজনী ব্রহ্মচারীর যোগাশ্রমে আসিলেন। তিনি খুব আশা করিয়া আসিয়াছিলেন যে যোগাশ্রমে ব্রহ্মচারী বাবার প্রতিকৃতি দর্শন করিবেন, কারণ তাঁহার প্রধান প্রধান ভক্তের মধ্যে রজনী ব্রহ্মচারী অন্যতম—ইহা তিনি জানিতেন। কিন্তু সেখানেও কোন ফটো দেখিতে না পাওয়ায়, তাঁহার প্রাণে বড় আঘাত লাগিল। তিনি রজনী ব্রহ্মচারীকে বলিলেন, "সর্ব্বসাধারণের মঙ্গল ও দর্শন-লাভ হবে ব'লে গোসাঁই ফটো দেওয়ার জন্য বাইরে এসেছিলেন। সাধারণ লোক তো দূরের কথা, আপনার মত বিশিষ্ট ভক্তের আশ্রমেও আজ পর্য্যন্ত আসন-পিঠ শূন্য দেখছি।"

রজনী ব্রহ্মচারীর সঙ্গে উকিল মহাশয়ের এ বিষয়ে অনেক আলাপ হইল। অবশেষে স্থির হইল যে উকিল মহাশয় জয়-দেবপুর যাইয়া রাজা বাহাদুরের সঙ্গে এ বিষয় আলাপ করিবেন, এবং ফটো বাহির করিতে চেষ্টা করিবেন।

চক্রবর্ত্তী জয়দেবপুর আসিয়া শুনিলেন রাজা বাহাদুর বাড়ীতে নাই। এক ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁহার আলাপ হইল। তিনি তাঁহাকে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া গেলেন। সেখানে ঐ ভদ্রলোকের

সঙ্গে এ বিষয় ও বিষয় আলাপ চলিতেছে, এমন সময় চক্রবর্ত্তী মহাশয় হঠাৎ টেবিলের উপর ধূলি-মাখা অবস্থায় একখানা ছবি দেখিয়া, ইহা হাতে লইলেন, রুমাল দিয়া পরিষ্কার করিয়া আনন্দোৎফুল্ল কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "এইতো পেয়েছি!"

তারপর তাঁহার জয়দেবপুর আগমনের উদ্দেশ্য তিনি তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিলেন, এবং ঐ ছবিখানা তিনি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিলেন। ভদ্রলোক সন্তুষ্টচিত্তে উহা তাঁহাকে দিয়া দিলেন। ব্রহ্মচারী বাবার ফটোর এক কপি হস্তগত হইল। ইহার পর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অনুরোধে ভদ্রলোক তাঁহাকে রাজা বাহাদুরের ম্যানেজারের নিকট লইয়া গেলেন, এবং সেখানেও ব্রহ্মচারী বাবার ফটো সম্বন্ধে আলাপ হইল। বিদায়ের পূর্ব্বে তিনি রজনী ব্রহ্মচারী মহাশয়ের ঠিকানা ম্যানেজারের নিকট রাখিয়া গেলেন। ঢাকায় ফিরিয়া এই ফটো প্রচার সম্বন্ধে রজনী ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার অনেক আলোচনা হইল। স্থির হইল— আপাততঃ এই ছবি রজনী ব্রহ্মচারীর নিকট থাকিবে, এবং তিনি ইহার প্রচারকল্পে চেষ্টা করিবেন। চক্রবর্ত্তী চিকন্দী ফিরিয়া গেলেন। তাঁহার ঢাকা আসা সার্থক হইল; ফটোর ক্ষীণবর্ত্তিকা উদ্ধার করা হইল। এই ক্ষীণবর্ত্তিকা হইতে শত শত, হাজার হাজার চিত্রমূর্ত্তি পাওয়ার পথ খুলিয়া গেল। ভক্তদের মধ্যে যাহারা এই ফটোর সংবাদ জানিলেন, তাঁহারা সকলেই আশান্বিত হইলেন— ছবিমূর্ত্তির অন্ততঃ এক কপি তাঁহারা প্রত্যেকেই পাইবেন। কিন্তু সৎকর্ম্মে শতেক বাঁধা।

পৌষ মাসে খ্রীষ্টপর্ব্ব বড়দিন উপলক্ষে তখন অফিস-কাছারি সপ্তাহকালেরও অধিক ছুটি থাকিত। চিকন্দী ফিরিয়া গিরিশ চক্রবর্ত্তী ব্রহ্মচারী বাবার ফটোখানা ঢাকা রাখিয়া আসায় যেন নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। তিনি রজনী ব্রজচারীকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে আগামী বড়দিনের ছুটিতে তিনি স্বয়ং কলিকাতা

যাইতেছেন। তাঁহার ইচ্ছা তিনি সেখান হইতে উহার তৈলচিত্র করাইয়া আনেন। ছবিখানা তাঁহাকে পাঠাইয়া দিতে তিনি ব্রহ্মচারী মহাশয়কে অনুরোধ করিলেন। পত্র পাইয়া রজনী ব্রহ্মচারী ঐ ছবিখানা চক্রবর্ত্তীকে ফেরৎ পাঠাইয়া দিলেন[১]। ঢাকায় আশার আলো নির্ব্বাপিত হইল।

এদিকে রাজা বাহাদুর যথাসময়ে বাড়ীতে ফিরিলেন, এবং ব্রহ্মচারী বাবার ফটো পাওয়ার আশায় উকিল গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর জয়দেবপুরে আগমন-বার্ত্তা শুনিলেন। যথাসম্ভব সত্বর "নিগেটিভ্" খানা হইতে কয়েক কপি সিল্ভার ফটো করান হইল, এবং ইহার এক কপি উয়ারী ব্রহ্মচারী-যোগাশ্রমে ডাকযোগে প্রেরিত হইল। রজনী ব্রহ্মচারী এই ফটোখানা পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইলেন, এবং রাজা বাহাদুরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইলেন। তিনি এই ছবিখানি ভাল একখানা ফ্রেমে বাঁধাইয়া স্বীয় আসনের উপরিভাগে রাখিয়া দিলেন। নাম প্রচারের পথ প্রশস্ত হইল।

তৈলচিত্র

ভাওয়াল-রাজ হইতে "ব্রহ্মচারী যোগাশ্রমে" প্রাপ্ত বাবা লোকনাথের ফটোখানা সিলভার কপি; সুতরাং ইহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে না। ব্রহ্মচারী যোগাশ্রমে লোকনাথের প্রতিকৃতি স্থায়িভাবে রাখা এবং ইহার বহুল প্রচার করা—ভক্তদের সকলেরই একান্ত বাসনা। কয়েক মাস অতীত হইতে না হইতেই ছবিখানি নিস্প্রভ হইয়া যাইতেছে দেখিয়া রজনী ব্রহ্মচারী মহাশয় বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার নিজের এমন অর্থবল নাই, যাহাতে তিনি ইহার সুব্যবস্থা করিতে পারেন। তিনি স্থির করিলেন,—যাহার কাজ তিনিই করিবেন, তিনি শুধু তাঁহাকে

১ এই চিত্র সম্বন্ধে আর কোন সংবাদ জানা যায় নাই।

ডাকিতে পারেন। তাঁহার দৈনন্দিন আহ্নিকের সময় তিনি অতি কাতর প্রাণে ইহার সুব্যবস্থার জন্য প্রার্থনা করিতেন। বাবা লোকনাথ রজনী ব্রহ্মচারীকে সন্তানবৎ স্নেহ করিতেন। ফটোরক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার মনের আকুলতা মহাপুরুষের নিকট পৌঁছিল, এবং তিনি ইহার উপায় স্থির করিয়া দিলেন।

একদিন সন্ধ্যার পর ব্রহ্মচারী যোগাশ্রমের সদর দরজায় একখানা বড় সুসজ্জিত ঘোড়ার গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। গাড়ীর ভিতর হইতে কয়েকজন সম্ভ্রান্ত মহিলা ফুল-ফল হাতে করিয়া অবতরণ করিলেন। তাঁহারা আশ্রম-কক্ষের ভিতরে প্রবেশ করিলেন, এবং ফুল-ফল ইত্যাদি আসন পীঠের সম্মুখে রাখিয়া রজনী ব্রহ্মচারী মহাশয়কে ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। প্রণামান্তে উঠিয়া তাঁহাদের একজন, "আমি রাধাবল্লভের মা" বলিয়া আত্ম-পরিচয় জানাইলেন।

রজনী ব্রহ্মচারী মহাশয় রাধাবল্লভকে চিনিতেন। রাধাবল্লভ ঢাকার সুবিখ্যাত ক্রোড়পতি জমিদার রূপবাবুর[১] পুত্র। রাধা বল্লভের মাতা বলিলেন যে, কিছুকাল পূর্ব্বে তিনি বারদী আশ্রমে যাইয়া গোসাঁই বাবার দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। তিনি গোসাঁই বাবার মুখে রজনী ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়াছেন। তিনি বিপন্না। তাঁহার পুত্রবধূ প্রসব-বেদনায় কষ্ট পাইতেছে, এবং তাঁহার পৌত্র তিন সপ্তাহ যাবৎ অম্বলে ভুগিতেছে, সিভিল্ সার্জ্জনের দ্বারা চিকিৎসা চলিতেছে, কিন্তু ফল পাওয়া যাইতেছে না। তিনি সাশ্রুনয়নে কৃতাঞ্জলিপুটে ব্রহ্মচারী মহাশয়কে বলিতে লাগিলেন, "বাবা, দয়া করে ইহাদের ব্যবস্থা করুন, আমি বড়ই বিপন্ন।" ব্রহ্মচারী মহাশয় তাঁহার আন্তরিক ভক্তি দেখিয়া প্রীত হইলেন, এবং তাঁহাকে যথোচিত উপদেশ দিলেন। অল্পকাল মধ্যেই রাধাবল্লভের মাতার দুর্ব্বিপাক কাটিয়া গেল। ইহাতে

১ ঢাকা ফরাসগঞ্জের ৺রূপলাল দাস।

রজনী ব্রহ্মচারী মহাশয়ের প্রতি তাঁহার ভক্তি বিশ্বাস অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল।

ইহার অল্প কয়েকদিন পর এই মহিলা পুনরায় ব্রহ্মচারী মহাশয়ের নিকট আসিলেন, এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বলিলেন, "বাবা, আমি ব্রহ্মচারী লোকনাথ গোসাঁই বাবার দুখানা তৈল-চিত্র করাতে চাই, একখানা আপনার আশ্রমের, এবং অপরখানা আমার নিজের জন্য। আপনি দয়া করে অনুমতি দিন, এবং ইহার ব্যবস্থা করুন।"

দিনের পর দিন সিল্‌ভার ফটো নষ্ট হইয়া যাইতেছে দেখিয়া ব্রহ্মচারী মহাশয় ইহার সুব্যবস্থার জন্য প্রার্থনা করিতেছিলেন। তিনি বুঝিলেন—বাবা লোকনাথের ইচ্ছায়ই এই সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। দু-খানা তৈলচিত্র করাইতে কি খরচ পড়িবে, তাহা রাধাবল্লভের মাতা ব্রহ্মচারী মহাশয়ের নিকট জানিতে চাহিলেন। ব্রহ্মচারী মহাশয়ের শিষ্য "শ্রীশ্রীলোকনাথ-মাহাত্ম্য" প্রণেতা শ্রীকেদারেশ্বর সেনগুপ্ত মহাশয়ের তখন ছাত্রজীবন। তিনি কলিকাতায় আসিয়া কলেজে পড়া-শুনা করিতেছিলেন। কোন্ কোন্ মাপের তৈলচিত্র করাইতে কি কি, খরচ পড়িবে, তাহা সুবিধামত সময়ে জানিয়া তাঁহাকে জানাইবার জন্য গুরু রজনী ব্রহ্মচারী মহাশয় শিষ্য সেনগুপ্তকে লিখিলেন। কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের জনৈক ছাত্রের সঙ্গে সেনগুপ্ত মহাশয়ের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। তাঁহার সাহায্যে মধ্যম ও প্রমাণ আকার ছবির খরচ ইত্যাদি জানিয়া, তিনি গুরু রজনী ব্রহ্মচারী মহাশয়কে জানাইলেন। যথা-সময়ে রজনী ব্রহ্মচারী মহাশয় এই সংবাদ রাধাবল্লভের মাতাকে প্রেরণ করিলেন। পুত্রের সহিত পরামর্শ করিয়া, রাধাবল্লভের মাতা ব্রহ্মচারী মহাশয়কে জানাইলেন যে তিনি মধ্যম আকারের দুখানা তৈলচিত্রের মোট মূল্য বাবদ একশত পঁচিশ টাকা দিতে প্রস্তুত আছেন। কলিকাতায় সেনগুপ্ত

মহাশয়কে এই সংবাদ দেওয়া হইল। তিনি গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক তৈলচিত্রে সুদক্ষ যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের দ্বারা পূর্ব্ববর্ণিত সিলভার কপি দৃষ্টে দুখানা ছবি অঙ্কিত করাইয়া, ১২৯৮ সনের গ্রীষ্মের ছুটিতে ছবিসহ ঢাকায় আসিলেন। লোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবার দেহ-রক্ষার ঠিক এক বৎসর পর সেই ১৯শে জ্যৈষ্ঠ লীলা সম্বরণ উৎসব উপলক্ষে, একখানা তৈলচিত্র উয়ারীর "ব্রহ্মচারী যোগাশ্রমে" মহাসমারোহে সর্ব্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হইল। রাধা-বল্লভের মাতা সেই উৎসবে যোগদান করিয়া প্রসাদ পাইলেন; এবং অপর মূর্ত্তিখানি ভক্তি সহকারে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া গিয়া তাঁহার পূজার ঘরে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ হইল বটে—কিন্তু।

আদি সিলভার ফটো কপির স্থানে স্থানে নিষ্প্রভ ও অস্পষ্ট হইয়া যাওয়ার নিমিত্ত এই তৈলচিত্র ততটা জাগ্রত হইল না।

কলেজ খোলার সঙ্গে সঙ্গে সেনগুপ্ত মহাশয় কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। ইহার কতক কাল পরই লোকনাথ বাবার প্রমাণ আকারের তৈলচিত্র করানের জন্য গুরু রজনী ব্রহ্মচারী মহাশয় তাঁহাকে আদেশ করিলেন। সেনগুপ্ত অসুবিধায় পড়িলেন, কারণ আদি ফটোর দোষে পূর্ব্বের তৈলচিত্র সন্তোষজনক হয় নাই; অন্য ভাল ফটো পাওয়ারও কোন সম্ভাবনা নাই; আর এ দিকে গুরুর আদেশ—চিত্র করাইতে হইবে।

কি করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া, তিনি সহৃদয় যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া প্রমাণ আকারে ছবির কথা উল্লেখ করিলেন। চক্রবর্ত্তী এ কথা শুনিয়া বলিলেন, "ফটোর দোষে পূর্ব্বে পেইণ্টিং আপনাদের পছন্দসই হয় নি। প্রমাণ আকারের ছবি আঁকতে হলে, হয় আমাকে ভাল একখানা ফটো এনে দিতে হবে, নয় তো এমন একজন লোক উপস্থিত করতে হবে যিনি মহাপুরুষ লোকনাথকে লীলা সম্বরণের পূর্ব্বে দেখেছেন।"

ভিতরকার এক অব্যক্ত প্রেরণার বলে, সেনগুপ্ত লোক উপস্থিত করানর প্রস্তাবেই স্বীকৃত হইলেন। চিত্রকর পূর্ব্বের ফটো লইয়াই প্রথম অঙ্কন আরম্ভ করিলেন।

যথাসম্ভব সত্বর চিত্রকরের চাহিদামত ঢাকা হইতে একজন লোক পাঠাইয়া দেওয়ার জন্য সেনগুপ্ত মহাশয় তাঁহার গুরুদেবকে লিখিলেন। তাঁহার নিশ্চিত বিশ্বাস যে যথাসময়ে লোক আসিয়া উপস্থিত হইবেই। দিনের পর দিন চলিতে লাগিল। প্রথম অঙ্কনও প্রায় শেষ হইয়া আসিল; কিন্তু লোক ত আসিতেছে না। একমাস কাটিয়া গেল, প্রথম অঙ্কন শেষ হইল। প্রথম অঙ্কনের ত্রুটি সংশোধন করিয়া দ্বিতীয় অঙ্কন আরম্ভ করিতে হয়। দ্বিতীয় অঙ্কন শেষ হইয়া গেলে, আর পরিবর্ত্তন সম্ভবপর হয় না। তবুও লোক আসিল না, গুরুদেবও নীরব। চিত্রকর লোকের জন্য সেনগুপ্ত মহাশয়কে পুনঃ পুনঃ তাগিদ দিতে লাগিলেন। সেনগুপ্ত মহাশয়ের মানসিক অবস্থা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। লোক আনাইয়া দিবেন স্থির হইল, এবং চিত্রাঙ্কনও বেশ অগ্রসর হইয়াছে, অথচ লোক আনা হইতেছে না। চিত্রকর হয়তো ভাবিতেছেন,—সেনগুপ্তই বা কেমন, আর তাঁহার গুরুই বা কেমন! এইরূপ সাত-পাঁচ কথা তাঁহার মনে উদয় হইতে লাগিল।......আজই শেষ দিন, আগামী কল্য দ্বিতীয় অঙ্কন আরম্ভ হইবে,—একরাত্র মাত্র সম্বল। এমন সময় হঠাৎ তাহার মনে হইল—যাঁহার কাজ তিনিই করাবেন, আমি ভাববার কে? আমি শুধু তাঁকে ডাকতে পারি। এই সঙ্কট হইতে মুক্ত করার জন্য তিনি মহাপুরুষ লোকনাথকে আকুল প্রাণে ডাকিতে লাগিলেন। সেই রাত্রে তাঁহার ঘুম হইল না।

রাত্রি প্রভাত হইল। আজই সকালবেলা লোকসহ চিত্রকরের সঙ্গে দেখা না করিলে আর মুখ থাকিবে না। আটটা বাজিয়া গেল। মহাপুরুষ লোকনাথের নাম করিতে করিতে, সেনগুপ্ত

মহাশয় তাঁহার বাস-ভবন সিমলা হইতে সিক্‌দার বাগানে চিত্রকর মহাশয়ের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চিত্রকরকে আজ ডাকিতে তাঁহার সাহস হইতেছে না, কারণ দরজা খোলার পর, প্রথম প্রশ্নই হইবে, "লোক এনেছেন?" ইহার উত্তরে তিনি কি বলিবেন!

তবু তাঁহাকে দরজার কড়া নাড়িতে হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে দরজাও খুলিয়া গেল, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়—লোক আনার প্রসঙ্গ উঠিল না! চিত্রকর প্রসন্নতার হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আপনি আর একটু পূর্ব্বে এলেন না কেন, তবেই তো সাক্ষাৎ হ'ত।"

সেনগুপ্ত অপ্রতিভের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন,—তিনি চিত্রকরের কথার কোন অর্থই বুঝিতে পারিলেন না। চিত্রকরও তাঁহার মনের ভাব ধরিতে পারিলেন না। উভয়ে বসিবার ঘরে প্রবেশ করিয়া আসন গ্রহণ কলিলেন, এবং চক্রবর্ত্তী বলিতে লাগিলেন।—

"আপনি আসার খানিক পূর্ব্বে আমার নিকট এক সৌম্যমূর্ত্তি ব্রহ্মচারী এসেছিলেন। তিনি আমাকে বল্লেন, 'আপনি বারদীর ব্রহ্মচারীর তৈলচিত্র অঙ্কন করেছেন। তাঁহার জীবিতাবস্থায় আমি তাঁকে দেখেছি। চলুন আমি সেই ছবি দেখব। এর পর তাঁকে নিয়ে আমি আমার চিত্রাঙ্কন-কক্ষে প্রবেশ ক'রে, তাঁকে ঐ ছবিখানি দেখাইলাম। ইহা দেখে তিনি আমাকে কাগজ-কলম নিয়ে লিখতে বল্লেন। ছবির ত্রুটিগুলি তিনি একটার পর একটা ক'রে বলে যেতে লাগলেন, আর আমি লিখে নিলাম। ছবি সম্বন্ধে সব কিছু শেষ হওয়ার পর তিনি এই কক্ষে এলেন, আর আমিও তাঁহার জন্য কি ফল আনতে উপরে গেলাম, উপর থেকে ফিরে এসে দেখি, তিনি ঘরে নেই। রাস্তায় নেমে এ দিক ও দিক অনেক অনুসন্ধান করলাম, কিন্তু বৃথা। ভাবলাম্ আপনি এলেও তাঁর কথাই জিজ্ঞেস করবেন।"

চিত্রার্পিতের ন্যায় সেনগুপ্ত মহাশয় চিত্রকরের কথাগুলি শুনিতেছিলেন। বিস্ময় ও ভক্তিতে তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। নয়নে তাঁহার আনন্দাশ্রু, শরীর তাঁহার রোমাঞ্চিত!

চিত্রকর তাঁহাকে লইয়া চিত্রাঙ্কন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন, এবং ব্রহ্মচারী বাবার ছবিখানি দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন, "এই দেখুন, এরই মধ্যে আগন্তুক ব্রহ্মচারীর নির্দ্দেশ মত আমি চিত্রের অনেক সংশোধন করে ফেলেছি।"

যথাসময়ে ছবিখানির অঙ্কন সমাপ্ত হইল। মূর্ত্তিখানির অঙ্কন নিখুঁত। দৃষ্টিমাত্রই মনে হয়—ইহা হইতে এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে। মূর্ত্তির সংশোধিত রূপ দেখিয়া সেনগুপ্ত শান্তি অনুভব করিলেন। চিত্রকরের সাহায্যে ছবিখানি ফ্রেমবদ্ধ করার পর রেইলওয়ে পার্শেলে ইহা ঢাকা চলিয়া গেল।

এই তৈলচিত্রখানি রজনী ব্রহ্মচারী মহাশয় তাঁহার আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, পূর্ব্বের মধ্যম আকারের ছবিখানি বারদীর আশ্রমে পাঠাইয়া দিলেন।

লোকনাথ বাবার তৈলচিত্র অঙ্কন ব্যাপারে সেনগুপ্ত ও চিত্রকর চক্রবর্ত্তীর মধ্যে বন্ধুত্ব জন্মিয়া গেল। একদিন চিত্রকর মহাশয় সেন গুপ্তের সিমলার বাসভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে সেনগুপ্ত মহাশয়ের গুরুদেব রজনী ব্রহ্মচারী মহাশয়ের একখানা ফটো দেখিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ইনিও দেখছি একজন ব্রহ্মচারী।"

তখন তাঁহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া সেনগুপ্ত বলিলেন, "আপনি যে ছবি এঁকেছেন এঁরই আশ্রমের জন্য।" চক্রবর্ত্তী নিজকে কৃতার্থ মনে করিলেন।

সেনগুপ্ত পারিশ্রমিকের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। ইহাতে চিত্রকর বলিলেন, 'আমি যে ছবি এঁকেছি তা' এক মহাপুরুষের। তাঁহার পরিচয় আমার বাড়ীতেই আমি যথেষ্ট পেয়েছি। যিনি

ইহা করিয়েছেন, তিনিও একজন ব্রহ্মচারী। এরূপ স্থলে, আঁকার সুযোগ পেয়ে আমি নিজকে ধন্য মনে করছি। এখানে পারিশ্রমিক বাবদ আমি কিছু নেবনা। তবে আমার খরচাদি বাবদ আপনি যা' দেবেন, তা-ই সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করব।"

পরে সেনগুপ্ত মহাশয় আর্ট স্কুলের তাঁহার সেই বন্ধুটির নিকট হইতে জানিয়া লইলেন সে ঐরূপ চিত্রাঙ্কনে চিত্রকর ন্যূনকল্পে তিন শত হইতে স্থল বিশেষে পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত লইয়া থাকেন। ইহার পর এক দিন চিত্রকরের বাড়ী যাইয়া, তিনি বিনয় ও সঙ্কোচের সহিত তাঁহার সম্মুখে মাত্র একশত টাকা রাখিলেন। চিত্রকর ইহা গ্রহণ করিয়া হাসিমুখে বলিলেন, "আপনি যা' দিয়েছেন, ব্রহ্মচারীর কার্য্যে ইহা আমার আশার অতিরিক্ত।"

ব্রহ্মচারী-যোগাশ্রমের তৈলচিত্র হইতে ঢাকার এক ফটোগ্রাফার ফটো তুলিয়া লইয়া যায়, এবং লিথোর সাহায্যে কপি করিয়া নাম মাত্র মূল্যে প্রচারার্থ বিক্রয় করিতে থাকে। ভাওয়ালের রাজার নিকট যে নিগেটিভ্ খানা ছিল, তাহাও তিনি পরবর্ত্তী কালে অন্য এক ফটোগ্রাফারকে দিয়া দেন। সেই ফটোগ্রাফারও প্রচারার্থে অনুরূপ ছবি করিয়া বিক্রয় আরম্ভ করে[১]। এইরূপে মহাপুরুষ শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবার ফটো মূর্ত্তি ভক্তদের ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল ; এবং এই সকল ফটো হইতে আবার বিভিন্ন আকারের তৈলচিত্রাদি অঙ্কনের সুযোগও উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মচারী বাবার কৃপায়ই তাঁহার এই সকল প্রতিকৃতিতে ভক্তগণ আজ তাঁহার তপোদীপ্তদেহের দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন। ভাওয়াল-রাজের কথাও এখানে মনে জাগিতেছে।

১ দেখা যাইতেছে বর্ত্তমানে প্রচলিত ব্রহ্মচারী বাবার ছবি মূর্ত্তির উৎপত্তিস্থল দুইটি : আদি নিগেটিভ্ হইতে গৃহীত লিথো, এবং নিষ্প্রভ ও অস্পষ্ট সিলভার কপি দৃষ্টে প্রাথমিক অঙ্কিত ও পরে ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক সংশোধিত তৈলচিত্র হইতে গৃহীত ফটো-লিথো। এই উভয় চিত্র-মূর্ত্তির মধ্যে পার্থক্যই দৃষ্ট হয় না। উভয় চিত্রেই নিখুঁতভাবে ঠিক শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবার মূর্ত্তি বিরাজিত।

দেহরক্ষা-অন্তে ঘরে ঘরে ভক্তগণ ফটো বা তৈলচিত্র মূর্ত্তিতে প্রাণসঞ্চার করিয়া ব্রহ্মচারী বাবাকে আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন ও করিতেছেন, এবং প্রাণ ভরিয়া তাঁহার নাম-কীর্ত্তন করিতেছেন।

লোকনাথ ব্রহ্মচারী — জয় বাবা মঙ্গলকারী।
লোকনাথ ব্রহ্মচারী — জয় ব্রহ্ম মঙ্গলকারী।
লোকনাথ ব্রহ্মচারী — জয় শিব মঙ্গলকারী।
লোকনাথ ব্রহ্মচারী — জয় গুরু মঙ্গলকারী।
লোকনাথ ব্রহ্মচারী — জয় ত্রাতা মঙ্গলকারী।
লোকনাথ ব্রহ্মচারী — জয় প্রভু মঙ্গলকারী।
লোকনাথ ব্রহ্মচারী — কর্ম্মযোগী মঙ্গলকারী।
লোকনাথ ব্রহ্মচারী — বিপদবারণ মঙ্গলকারী।
লোকনাথ ব্রহ্মচারী — ভক্তবাঞ্ছা পূরণকারী
লোকনাথ ব্রহ্মচারী — পতিত-পাবন তাপহারী।[1]

১ তৈল চিত্রাঙ্কনের সংশোধন প্রসঙ্গে শান্তমূর্ত্তি ব্রহ্মচারীর আবির্ভাব একটি দুজ্ঞেয় বিষয়। আগন্তুক ব্রহ্মচারী বলিয়াছেন যে তিনি বারদীর ব্রহ্মচারীকে তাঁহার জীবিতাবস্থায় দেখিয়াছেন; সুতরাং আগন্তুক ব্রহ্মচারী লোকনাথ বাবা নিজে নহেন। রজনী ব্রহ্মচারী মহাশয়ও এই আগন্তুক ব্রহ্মচারী নহেন, কারণ সেনগুপ্ত মহাশয়ের বাসায় চিত্রকর তাঁহার ছবি-মূর্ত্তি দেখিয়াছেন, অথচ আগন্তুক ঐ ব্রহ্মচারী বলিয়া কোন মত প্রকাশ করেন নাই।

শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবার বাণী

১

"আমি শতাধিক বৎসর পাহাড়-পর্ব্বত পরিভ্রমণ করে বড় রকমের একটা ধন কামাই করেছি। তোরা তা ব'সে ব'সে খাবি।"

ঈশ্বরতুল্য ব্রহ্মবেত্তা পরম গুরু লোকনাথ বাবার কঠোর কর্ম্ম-যোগলব্ধ ফল ভক্তদের অক্ষয় পৈতৃক সম্পত্তি। ভক্তমাত্রেরই ইহাতে সমান অধিকার রহিয়াছে। অটল বিশ্বাস, অচলা ভক্তি ও পূর্ণ নির্ভর যাঁহার সম্বল, তিনিই এ সম্পত্তির [গুরুকৃপার] চির উত্তরাধিকারী।

২

"শিশুদিগকে এখানে রেখে তুমি শিকার করতে যাও। আমি এদেরকে রক্ষা করব।"

এই কথাটি ব্রহ্মচারী বাবা চন্দ্রনাথ পাহাড়ে হিংস্র ব্যাঘিনীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন। মহাপুরুষের দয়ার নিকট হিংস্রাহিংস্র ভেদ নাই। তিনি সমদর্শী।

৩

"ঘরে আমার পরিবার আছেরে।"

পিপীলিকা সম্পর্কে এই কথাটি অরুণ নাগ মহাশয়কে বলা হইয়াছিল। পিপীলিকার আহার জোগানও ব্রহ্মচারী বাবার নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম-তালিকাভুক্ত ছিল। দিবা-রাত্র সদাব্রতের ত কথাই নাই। জীব-সেবাই শিব-সেবা।

৪

"বাড়ীর গরুতে ভিটার ঘাস খায় না।"

অনেক সময় দেখা যায়—স্থানীয় লোকে অজ্ঞানতাবশতঃ মহাপুরুষদের মূল্য বুঝিতে পারে না। ইহাতে মহাপুরুষদের ভাব-বৈষম্য হয় না।

৫

"আমি ধরা না দিলে, আমাকে ধরতে পারে, কার বাপের সাধ্য।"

ব্রহ্মপুরুষের স্থান কত উচ্চে, আর সংসারের আবিলতায় আমরা কত নীচে! তবু ভক্তের সামান্য দুঃখ দেখিলেই তাঁহার দয়ার উদ্রেক হয়। তাঁহার কৃপাদান যাচ্ঞার অপেক্ষা রাখে না, তিনি নিজেই ধরা দেন। ভক্তের পক্ষে কত বড় আশ্বাস-বাক্য।

৬

"আমার এ উপদেশের স্থল নয়, আদেশের স্থল।"

উপদেশ ও আদেশ—কথা দুইটির অর্থ বিচার করা দরকার। উপদেশ—সর্ব্বসাধারণের জন্য; যিনি ভাল বুঝিলেন, তিনি গ্রহণ করিলেন এবং নিজের জীবনে প্রয়োগ করিলেন। আর যাহার ভাল লাগিল না, সে এড়াইয়া গেল। উপদেশ গ্রহণ করা বা না করা, ব্যক্তিবিশেষের মনোবৃত্তির উপর নির্ভর করে।

আর আদেশ?—কাহাকেও কিছু করিতে বা না করিতে জোর দিয়া বলা। যিনি শ্রীগুরুর চরণপদ্মে মন-প্রাণ সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করিতে পারেন, তিনি তাঁহার আদেশ লাভ করিয়া থাকেন, এবং সেই আদেশই তাঁহার পক্ষে মঙ্গলাবহ।

কোন এক ভক্তকে শ্রীশ্রীব্রহ্মচারী বাবা তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত একখানি পত্রে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, "......উপদেশ দেওয়া এক প্রকার কথা বিক্রী, সেটা আমার কাছে মিঠা লাগে না, কাজ চাই, কাজটা আমার নিকট বড়ই পেয়ারা।......" এই গ্রন্থে শ্রীশ্রীবাবার হাতে লেখা চিঠির ফটো-চিত্র দ্রষ্টব্য।

৭

"আমার যাহা ইচ্ছা, আমি তাহাই করিতে পারি, তোদের বিশ্বাস নাই, কাজেই ফলও হয় না।"

এইরূপ উক্তি শুধু ব্রহ্মশক্তির পক্ষেই সম্ভবপর। শ্রীগুরুতে ষোল আনি বিশ্বাস থাকা চাই, তবেই শুধু ফলোদয় হয়, অন্যথা নিষ্ফল।

৮

"দেহ-রক্ষার্থে যেমন পান-আহার এবং মলমূত্র ত্যাগ একান্ত প্রয়োজন, সেইরূপ আমাকে পাওয়ার জন্য একান্ত প্রয়োজন-বোধ যদি কাহারও হয়, তবেই শুধু সে আমাকে ধরতে পারে।"

তোমাকে ছাড়া আমার চলবেই না—এইরূপ দাবী যাঁহার, শুধু তাঁহার নিকটই তিনি ঘেঁসিয়া থাকেন। বাধা-বিঘ্ন, আপদ-বিপদ আসে আসুক,—ভক্তের লক্ষ্য ধ্রুব।

৯

"জীবন্মুক্ত হইতে হইলে, সংসার-বন্ধন পরিত্যাগ করিতে হইবে।"

সংসারে থাকিয়া ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া কর্ম্ম করিতে গেলেই বন্ধনে পড়িতে হয়। জীবন অর্থাৎ স্থূলদেহ হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে—"মা ফলেষু কদাচন"—হইতে হইবে। সংসারীর পক্ষে সংসার-বন্ধন ত্যাগ সুকঠিন হইতে পারে, কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষাবঞ্চিত হইলে অসম্ভব নয়।

১০

"যাহারা আমাকে লক্ষ্য করিয়া আসিয়া আমার আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহাদের দুঃখ দেখিলেই আমার হৃদয় আর্দ্র হয়। এই আর্দ্রতাই আমার দয়া। এই দয়ায় আমার শক্তি তাহাদের উপর প্রবাহিত হয়, এবং ইহাতেই তাহাদের দুঃখ দূর হইয়া যায়।"

করুণার প্রতিমূর্ত্তি বাবা লোকনাথ সব সময় আশ্রয় দান করিতে প্রস্তুত। তুমিই আমার একমাত্র লক্ষ্য, তুমিই আমার ধ্রুবতারা, আমি অন্য আর কিছুই জানি না—এইরূপ প্রতীতি লইয়া ভক্তকে অগ্রসর হইতে হইবে; তবেই তাহার সুখ, তবেই তাহার শান্তি।

১১

"গুরুপ্রদত্ত মন্ত্রের শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করা শিষ্যের কর্ম্ম নহে। গুরু যাহা দিয়াছেন, শিষ্য নির্ব্বিচারে তাহাই জপ করিয়া যাইবে।"

শিষ্য যাঁহাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে, তাহার মনে রাখা উচিত যে তাহার গুরু সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী ও সর্ব্বশক্তিমান; সুতরাং গুরুর কার্য্যে বা বাক্যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও ভক্তি রাখিয়া, তাঁহার নির্দ্দেশমত তাহাকে চলিতে হইবে। গুরু-প্রদত্ত মন্ত্রশক্তিই শিষ্যকে চালাইয়া লইয়া যাইবে—ইহা নিশ্চিত।[১]

১২

"আমি কাহাকেও বকি, কাহাকেও মারি, আবার কাহাকেও বা কোলে নেই, কিন্তু কাহারও উপর আমার ক্রোধ নাই।"

কি অপূর্ব্ব পিতৃস্নেহ! সন্তানগুলি প্রায় সবই বেয়াড়া, তাই ঢিল দেওয়া চলে না, তাহাদিগকে রীতিমত শাসনে রাখিতে হয়; সুতরাং কাহারও অদৃষ্টে গালি, কাহারও দণ্ড, আবার কাহারও বা সান্ত্বনা,—যার যতখানি রোগ, তার ততখানি ভোগ, অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা, সবই কিন্তু সন্তানের মঙ্গলের নিমিত্ত; তিনি ক্রোধী হইয়া ঝাল ঝাড়েন—এইরূপ বুঝিলে চলিবে না।

১ অধুনা প্রায়ই দৃষ্ট হয়—প্রাণের তৃষ্ণা মিটাইতে গিয়া, ভক্তগণ স্বীয় বিচার-বুদ্ধির বলে গুরু গ্রহণ করিয়া থাকে; এবং পুনঃ ঐ বিচার-বুদ্ধির বলেই গুরুত্যাগী হইয়া অন্য গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করে। এখানে একটি প্রশ্ন দাঁড়ায়—গুরুর গভীরতা বেশী, না শিষ্যের গভীরতা বেশী?

যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে শিষ্যের গভীরতা বেশী, তবে তাহার পক্ষে গুরু বলিয়া কোন প্রাণীর নিকট যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা থাকে না, আর গুরুর গভীরতা বেশী ধরিয়া লইলে, ছাত্রের পক্ষে শিক্ষকের পরীক্ষা গ্রহণের অক্ষমতার ন্যায়, গুরুপ্রদত্ত মন্ত্রের গুণাগুণ বিচারেও শিষ্য অক্ষম।

মানুষ স্বীয় কর্ম্ম অনুসারে ফল-লাভ করিয়া থাকে। বাবা বলিতেন—কর্ম্মই ব্রহ্ম।

১৩

'বাক্যবাণ ও বিচ্ছেদবাণ সহ্য করিতে পারিলে, মৃত্যুকেও হটাইয়া দেওয়া যায়।"

বিচ্ছেদবাণ বলিতে এখানে প্রিয়জন-বিয়োগ ও বিত্তনাশ বুঝিতে হইবে। রূঢ়বাক্য স্বভাবতঃই বেদনাদায়ক। রূঢ়বাক্য, বন্ধুবিচ্ছেদ ও বিত্তনাশ যিনি অম্লানবদনে সহ্য করিতে পারেন, মৃত্যু-যাতনা বা ভয় তাঁহার নিকট পরাজিত। সহ্য করিবার ক্ষমতা বা সহিষ্ণুতার কথাই এখানে বলা হইয়াছে।

১৪

"অন্ধকার ঘরে তুই থাকিলে, তোকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, 'কে তুমি?' তুই উত্তর করিস, 'আমি।'

আর আমি যদি অন্ধকার ঘরে থাকি, এবং আমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করে 'কে তুমি', আমি উত্তর করি, 'আমি।'

ভাল, নামে নামে মিত্রতা হয়, আর এই 'আমি'তে 'আমি'তে মিত্রতা হয় না কেন?"

অজ্ঞানতাবশতঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বার্থান্ধ হইয়া মানুষ পরস্পর পরস্পরকে বুঝিতে চেষ্টা করে না,—তাহাতেই যত গোলযোগের সৃষ্টি হয়। পরস্পর আদান-প্রদানে বিবাদের সম্ভাবনা থাকে না।

শিষ্য প্রথমটায় তাহার পছন্দসই আপন গুরু বাছিয়া লইল। কিছুকাল পর তাহার রুচি বদলাইয়া যাওয়ায়, পূর্ব্বগুরু বর্জ্জন করিয়া, সে অন্য গুরু গ্রহণ করিল, ইত্যাদি;—এ যেন অকৃতকার্য্য ছাত্রের বৎসরান্তে এক একবার বিদ্যালয় বদলাইয়া অন্য বিদ্যালয়ে সেই একই শ্রেণীতে ভর্ত্তি হওয়ার মত মনে হয়।

গুরুশিষ্যে এরূপ কেন যে হয়, তাহা বলা বড় শক্ত ব্যাপার। শিষ্য কিছু চায়—একথা সত্য; কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহার হয় ত ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়া থাকে; কারণ সাধনক্ষেত্রে ধৈর্য্যের পরীক্ষা।

এরূপও দেখা যায়, সময় পূর্ণ হইলে গুরু নিজেই আসিয়া ভক্তের নিকট উপস্থিত হন, এবং তাঁহাকে শিষ্য করিয়া চলিয়া যান। শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এবং ৺নিশিকান্ত বসু মহাশয় সম্পর্কে দ্রষ্টব্য।

১৫

"প্রতিদিন রাত্রিতে শয়ন করার সময় দৈনিক কর্ম্মের হিসাব নিকাশ করিস্।"

কাজের হিসাব-নিকাশ, অর্থাৎ আমাদ্বারা কয়টা ভাল কাজ, আর কয়টা খারাপ কাজ করা হইয়াছে—ইহাই বিচার করিয়া দেখার অভ্যাস করিলে, খারাপ কাজে আর মন বসিবে না। এই আত্মপরীক্ষার ফলে, ক্রমে সৎকর্ম্ম বৃদ্ধি পাইতে থাকে, আর অসৎ কর্ম্ম কমিয়া যায় এবং অবশেষে মানব পূর্ণ আত্ম-শুদ্ধি লাভ করে।

১৬

"ভব রোগী পেলাম না।"

খুব অল্প লোকেই আধ্যাত্মিক ক্ষুধা লইয়া মহাপুরুষদের নিকট উপস্থিত হয়। প্রায় সকলেই আসে পার্থিব অভাব অনটন, জরা-ব্যাধি ইত্যাদির হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য। পার্থিব বন্ধনের বেড়াজালের মধ্যে আটক থাকিয়া অধিকাংশ লোকই আপাত শান্তির অনুসন্ধান করে। আসল মুক্তিকামী কদাচিৎ দৃষ্ট হয়।

১৭

"আমার মূর্ত্তিতে যদি দশের উপকার হয়, তবে আমি বাহির হইতে প্রস্তুত আছি।"

ফটো তোলার ব্যাপারে ভাওয়াল-রাজকে ব্রহ্মচারী বাবা এই উক্তিটি করিয়াছিলেন। ফটো না থাকিলে আজ মহাপুরুষের

দীক্ষা সদ্গুরুর নিকট হইতে গ্রহণ করিতে পারিলেই ভাল হয়; কারণ ইহাই সাধনার স্বাভাবিক পন্থা। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ চেনা বা পাওয়া সুদুর্লভ। উপাসক ভগবৎ চিন্তায় নিজকে নিযুক্ত করিয়া একান্ত আগ্রহের সহিত অপেক্ষায় থাকিবেন। সময় পূর্ণ হইলে, ভগবানের ইচ্ছায়ই তিনি সদ্গুরুর সন্ধান পাইবেন, অথবা সদ্গুরু নিজেই তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগীতায় শঙ্কর বলিতেছেন:—

গুরবঃ বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ।
দুর্লভঃ অয়ং গুরুঃ দেবি শিষ্যসন্তাপহারকাঃ।

সুতরাং শিষ্যবিত্তাপহারক গুরু গ্রহণ করার চেয়ে শিষ্য-সন্তাপহারক গুরুর অপেক্ষায় থাকা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

দর্শন-লাভ জনসাধারণের ভাগ্যে ঘটিত না। ব্রহ্মচারী বাবার এই বাণীতে একটি ইঙ্গিত রহিয়াছে,—তিনি বলিতেছেন যে তাঁহার দেহ-রক্ষার পরও তাঁহার সূক্ষ্ম আত্মা জগতের কল্যাণের জন্য নির্লিপ্ত ভাবে কাজ করিয়া যাইবেন। ভক্তগণ তাহার প্রতিকৃতিতে প্রাণ সঞ্চার করিয়া, তাহাকে চিরকাল 'বাবা লোকনাথ' বলিয়া ডাকিবে। বাবা মঙ্গলময়, সুতরাং যেখানে তাহার মূর্ত্তি বিরাজমান, সেখানে অমঙ্গল ঘটিতে পারে না।

১৮

"দেহটি যেন একটি পাখীর খাঁচা।"

দেহ-রক্ষার কিছুকাল পূর্ব্বের এই উক্তিটি। দেহখানি পাখীর খাঁচাই ত বটে। জীবাত্মা উড়িয়া গেলে, শূন্য খাঁচা পড়িয়া থাকে; সুতরাং এই খাঁচার জন্য "নৈনং শোচিতুমর্হসি" অর্থাৎ তোমার শোক করা কর্ত্তব্য নহে।[১]

বিচ্ছেদ ও ধৈর্য্যের কথা এখানে বলা হইয়াছে। বিচ্ছেদে ধৈর্য্য ধরিতে হইবে।

১৯

"আমার নাশ নাই[২], আমি নিত্য পদার্থ[৩], সুতরাং আমার শ্রাদ্ধও নাই।"

ইহাও দেহ-রক্ষার কিঞ্চিৎ কাল পূর্ব্বের কথা। ব্রহ্মচারী বাবা যে কে—তাহা তিনি নিজেই এখানে স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন।

এইরূপ বহু অভয়বাণীতে তিনি ঘটনাবিশেষে ভক্তদিগকে সময়োচিত আদেশ, সান্ত্বনা ও আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন। মহাপুরুষদিগের জীবনী ও আদেশ-উপদেশ ইত্যাদি পাঠে বা আলোচনায় ভক্ত-জীবনে রেখাপাত হয়; এবং মানুষ ক্রমশঃ পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়।

১ গীতা ২।২৬।
২ অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি—গীতা ২।১৭।
৩ অজো নিত্যঃ—গীতা ২।২০।

ব্রহ্মচারী বাবা আছেন

বাবা লোকনাথ বলিয়াছেন,—তিনি নিত্য পদার্থে এবং সর্ব্বত্র বিরাজমান। তিনি ব্রহ্মসম্ভূত সূক্ষ্ম আত্মায় নির্লিপ্তভাবে জগদ্ব্যাপিয়া রহিয়াছেন—ইহা আমাদের পক্ষে পরম সান্ত্বনা, ইহাই আমাদের শ্রেষ্ঠ বল ও অক্ষয় সম্পদ। ভক্তের আকুল ডাকে এখনও তিনি উপস্থিত হন এবং তাঁহাকে দর্শন দান করেন।

"গোসাঁই, আমি মহাপাপী"

বারদীর শশীকুমার নাগ ডাক্তার ছিলেন। ডাক্তারী পাশ করার পর ব্যবসায় করার জন্য তিনি বারদীতে ডিসপেন্‌সারী খুলিয়া বসার সময় পরম দয়াল লোকনাথ তাঁহাকে বেশ কিছু অর্থসাহায্য করেন।

দেহ-রক্ষার পূর্ব্বে ব্রহ্মচারী বাবা আশ্রমবাসী সেবক-সেবিকাদের ভবিষ্যতের জন্য কিছু কিছু অর্থদান করিয়া যান। আশ্রম-সেবিকা ভজলেরাম গোঁসাইর নিকট হইতে চারি শত টাকা পায়, এই সংবাদ অনেকেই জানিত। সে আশ্রমেই একটা কুঁড়ে ঘরে থাকিত।

ব্রহ্মচারী বাবার লীলা সম্বরণের কিছু কাল পর, ভজলেরাম জ্বরে আক্রান্ত হইয়া দীর্ঘকাল ভুগিতে থাকে। তাহার কাতর অবস্থায়, তাহাকে দেখিবার অছিলায় এক দিন শশী ডাক্তার আশ্রমে যাইয়া তাহার ঘরে প্রবেশ করেন, এবং ঐ টাকা তাঁহাকে দেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে থাকেন। ভজলেরাম তাঁহাকে টাকা দিতে অস্বীকার করায় তিনি তাহার ঘরের মেঝেতে অনেক স্থলে খুঁড়িয়া টাকার সন্ধান করেন, কিন্তু বৃথা চেষ্টা, টাকা পাওয়া গেল না। তখন ভজলেরামকে অনেক কটূক্তি করিয়া তিনি স্থান ত্যাগ করিলেন। অসহায়া ভজলেরাম তাহার গোসাঁইর নিকট মনে মনে এ বিষয়ে নালিশ করিল।

এই ঘটনার কিছু দিন পর, এক দিন কোন এক রোগীকে ঔষধ দেওয়ার জন্য ডিস্‌পেন্‌সারীর আলমারীর তালা খুলিয়া, শশী ডাক্তার দরজা-পাট খোলার চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু পাট-দুখানা এমন ভাবেই আট্‌কাইয়া গিয়াছে যে কিছুতেই খুলিতেছে না। তিনি এদিক-ওদিক, উপর-নীচ অনেক রকম চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সবই বৃথা। শারীরিক শক্তির পরাজয়ে, তাঁহার মেজাজ চড়িয়া গেল, এবং ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি ডান হাতের এক ঘুসিতে এক পাটের একখানা কাঁচ ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। কাঁচ ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে, আলমারীর পাটও খুলিয়া গেল; কিন্তু শশীকুমারের কব্জীখানা সাংঘাতিকরূপে জখম হইল। এই আঘাতের ফলে, তাঁহার ডান হাতখানা একেবারে অবশ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া গেল।

ঢাকায় উয়াড়ীর ব্রহ্মচারী যোগাশ্রমে লোকনাথ বাবার প্রমাণ আকারের প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কিছুকাল পর, একদা এই শশীকুমার নাগ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাহির হইতেই খোলা দরজার ভিতর দিয়া তিনি দেখিলেন,—ব্রহ্মচারী বাবা জীবন্ত অবস্থায় তাঁহার সেই গোমুখী আসনে উপবিষ্ট আছেন।

তাঁহার সেই অন্তরাত্মভেদী নয়নযুগল দেখিয়া, শশীকুমারের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিল। তিনি উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "গোসাঁই, আমি মহাপাপী, আমি দস্যু, আমাকে ক্ষমা কর, ক্ষমা কর।"

উপস্থিত ভক্তগণ উঠিয়া গিয়া, তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়া বসাইলেন, এবং আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন। কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া তিনি তাঁহার অবশ ডান হাতখানা দেখাইয়া—টাকার জন্য ভজলেরামের ঘরের মেঝে এই ডান হাতই খুড়িয়াছিল বলিয়া—অত্যন্ত অনুতপ্ত হৃদয়ে তাঁহার কৃতকর্ম্মের ফল-ভোগের কথা সকলকে বলিলেন

প্রয়াগধামে কুম্ভমেলায়

বারদীর সাধক দুর্গাচরণ কর্ম্মকার মহাশয় লোকনাথ বাবার পরম ভক্ত ছিলেন। "লোকনাথ" নাম করিতেই তাঁহার পুলক হইত। তিনি একবার ব্রহ্মচারী বাবার একখানা বাঁধান ফটো সঙ্গে লইয়া প্রয়াগধামে কুম্ভমেলায়[১] যান। সেখানে সাধু সন্ন্যাসী দর্শনকালে তাঁহার হাতে লোকনাথ বাবার এই ফটো এক মহাপুরুষের নয়ন গোচর হয়। তিনি ইহা চাহিয়া স্বীয় হস্তে লইয়া অনেকক্ষণ একমনে নিরীক্ষণ করেন এবং পরে কতকটা আশ্চর্য্যান্বিত ভাবে কর্ম্মকার মহাশয়কে হিন্দি ভাষায় জিজ্ঞাসা করেন, "এই মূর্ত্তি তুমি কোথায় পেলে ?"

ভক্ত দুর্গাচরণ যথাসম্ভব অল্পকথায় ব্রহ্মচারী বাবার ইতিবৃত্ত তাঁহাকে জানাইলেন। মহাপুরুষ শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন, এবং স্মিতমুখে বলিলেন, "তোমরা বড় ভাগ্যবান্। এরূপ দৃষ্টি যাঁহার তিনি কিরূপে এত দিন নিম্নভূমিতে লোকসমাজে রহিলেন,—ভাবিয়া পাইনা।"

মহাপুরুষের এই বিস্ময়-উক্তির উত্তর দেওয়ার শক্তি আমাদের নাই। আমরা শুধু এই জানি,—বাবার নাম "লোকনাথ"—লোকের নাথ ; সুতরাং কাঙ্গালের নাথ লোকনাথ গুরুর মুক্তি সাধন উপলক্ষ্য করিয়া মহাপুরুষ হিতলালের নির্দ্দেশে নিম্নভূমির পতিত "লোক-সমাজের" উদ্ধারের জন্যই আসিয়াছিলেন, আছেন এবং থাকিবেন।

১ দ্বাদশ বৎসর অন্তর অন্তর কুম্ভযোগ উপলক্ষে প্রয়াগ ও হরিদ্বারে সাধু-সন্ন্যাসী মহাপুরুষদের মহাসম্মেলন বিশেষ। কুম্ভযোগে এই দুই তীর্থে গঙ্গাস্নান পুণ্যপ্রদ।

ভক্ত-সমাবেশ

ভক্তের জীবনে ভগবানের মহিমা বিকাশ; সুতরাং ভগবানের নাম ও মহিমা জানিতে হইলে, ভক্তের জীবনীর অংশবিশেষ কিছু কিছু আলোচনা করা দরকার। বাহুল্য ভয়ে যৎসামান্য এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইল।

প্রভাতচন্দ্র গুহ

বরিশাল-নিবাসী শ্রদ্ধেয় প্রভাত চন্দ্র গুহ মহাশয় দীর্ঘকাল বারদী হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি লোকনাথ বাবার পরম ভক্ত ছিলেন। বহু ভক্তের প্রাণে তিনি ব্রহ্মচারী বাবার প্রতি প্রেরণা ও ভক্তি জাগাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার রচিত "শ্রীশ্রীলোক-নাথ বন্দনা" ভক্তমাত্রেরই প্রিয় বস্তু।

রমণীমোহন দাস

ঢাকা নারিন্দার উকিল রমণীমোহন দাস মহাশয়ের নয় বৎসর বয়স্ক একটি পুত্র কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া মরণোন্মুখ হয়। দৈবক্রমে ভক্ত প্রভাতচন্দ্র গুহ মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয়, এবং তাঁহার অনুরোধে তিনি ঐ রুগ্ন পুত্রকে শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবার "নামে রাখিয়া" দেন। পিতা রমণীমোহন ব্রহ্মচারী বাবার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হইয়া পুত্রের ডাক্তার-কবিরাজী চিকিৎসা সব ছাড়াইয়া দিলেন; বালকটিও ব্রহ্মচারী বাবার একনিষ্ঠ ভক্ত হইয়া উঠিল। ইহাতেই ক্রমে সে আরোগ্য লাভ করিল।[১]

কত কাল পর দেখা গেল,—মাঝে মাঝে বালকটি হঠাৎ অচৈতন্য হইয়া পড়ে, এবং ঐ অবস্থায়ই কথা বলিতে থাকে। তখন রমণী

১ নামে রাখা—চিকিৎসাদি পরিত্যাগ করাইয়া দেবতা বা মহাপুরুষের দয়াপ্রার্থী হইয়া রোগীকে তাঁহারই পদতলে সমর্পণ করা।

বাবু ও অন্যান্যের প্রশ্নের উত্তরে বালকের মুখ হইতে প্রকাশ পাইত যে গুরু ভগবান গাঙ্গুলী, বাবা লোকনাথ নিজে, অথবা মহাপুরুষ বেণীমাধব তাহার উপর ভর করিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। বালকের ঐরূপ অবস্থায় উপস্থিত অনেকেই অনেক প্রশ্ন করিত এবং যথাযথ উত্তর পাইত।

দুঃখের বিষয় রমণীমোহন ও তাহার পুত্রটী অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন।

নিশিকান্ত বসু[১]

বারদী-নিবাসী নিশিকান্ত বসু মহাশয় বাল্যকালে যখন আসাম-ধুবড়ীতে ছিলেন, তখন লোকনাথ বাবার এক মহিলা ভক্ত মহাপুরুষের জীবনীর বিস্ময়কর ঘটনাদি গল্পচ্ছলে বলিয়া তাঁহাকে শুনাইতেন। বালক নিশিকান্তের এই সকল কথা শুনিতে খুব ভাল লাগিত। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার এই ভাব ব্রহ্মচারী বাবার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিতে পরিণত হইল।

বসু মহাশয় যখন যুবক তখন লোকনাথ বাবার ভক্ত পূর্ব্বোক্ত মথুরামোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সঙ্গে কলিকাতায় তাঁহার পরিচয় ও আলাপ হয়। মথুরবাবুর নিকট ব্রহ্মচারী বাবার দয়া ও উপদেশাদির কথা শুনিয়া, তাঁহার প্রতি বসু মহাশয়ের ভক্তি-বিশ্বাস আরও দৃঢ়তর হয়, এবং তিনি তাঁহার উদ্দেশ্যে পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেন। এই সময় হইতেই জীবনের প্রতিটি বিষয়ে তিনি তাঁহার পরম আরাধ্য দেবতার অনুগ্রহ লাভ করিতেছেন বলিয়া প্রতিনিয়ত তাঁহার অনুভূতি হইত। এই সময় হইতে মঙ্গলময় মহাপুরুষের দয়ায় তাঁহার জীবনের বিশেষ অগ্রগতি হইতে থাকে। ডাক্তারী পাশ করিয়া তিনি আমেরিকায় গমন করেন।

১ বসু মহাশয় বিগত ২৪শে জুলাই, ১৯৬৩ তারিখে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

জগতের হিতের জন্য মহাপুরুষগণ সর্ব্বব্যাপী অবস্থায় আছেন। ডাক্তার বোস্ তখন আমেরিকার সিকাগোতে ডাক্তার লিণ্ডলারের স্যানিটেরিয়ামে[১] চিকিৎসক। সরল প্রকৃতি ও অমায়িক ব্যবহারে ডাক্তার বোস্ অল্প সময়ের মধ্যেই সেখানে খুব জনপ্রিয় ও সকলের আস্থাভাজন হইয়া উঠেন। এই স্যানিটেরিয়ামে তাঁহার জীবনের একটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

একদা ত্রিংশবর্ষীয়া এক সম্ভ্রান্ত ইংরাজ মহিলা পেটে টিউমার হওয়ায় বিভিন্ন স্থানে নিষ্ফল চিকিৎসার পর, ডাক্তার লিণ্ডলারের স্যানিটেরিয়ামে আসেন এবং ডাক্তার বোসের চিকিৎসাধীনে থাকেন। এখানেও বেশ কিছু কাল চিকিৎসায় রোগের কোন উপশম না হওয়ায়, মহিলাটি উদ্বিগ্ন হইয়া একদিন ডাক্তার বোসের উপদেশ-প্রার্থী হইয়া তাঁহার সম্মুখে উপবিষ্ট আছেন। ডাক্তার বোস্ একান্ত মনে গুরুকে স্মরণ করিয়া অস্ত্রোপচারের কথা ভাবিতেছেন, এমন সময় মহিলাটির সমগ্র দৃষ্টি হঠাৎ সচকিত হইয়া ডাক্তার বোসের মাথার উপর দিয়া ঠিক তাঁহার পিছনে একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে নিবদ্ধ হইল, এবং সেখানে তিনি একটি দিব্য মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। মুখমণ্ডলে তাঁহার শ্রদ্ধা-মিশ্রিত বিস্ময়। মহিলাটির তৎকালীন অবস্থা দেখিয়া ডাক্তার বোসের মনে হইল তিনি কোন দৈবশক্তির প্রভাবে কথা বলিতেছেন। তিনি ডাক্তার বোস্‌কে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল—

"Dr. Bose, I see somebody behind you and above your head. He has all his hair put up together on his head. His face is in one direction and his eyes in another. He has whiskers and moustache. A piece of cloth is wrapped round his body. Through his right arm pit, it has gone round

১ স্বাস্থ্য-নিবাস।

his front and has covered the left shoulder. I see him down to the waist. Do you know who he is? He must be your Master, I think."[১]

"ডাক্তার বোস্ তোমার পিছনে, তোমার মাথার উপর—আমি একজন লোক দেখিতে পাইতেছি। তাঁহার চুলগুলি সব তাঁহার শিরোভাগে গুটিবদ্ধ আছে। তাঁহার মুখমণ্ডল এক দিকে, আর তাঁহার দৃষ্টি অন্য দিকে। তাঁহার দাড়ি-গোঁফ আছে। একখণ্ড বস্ত্র তাঁহার পৃষ্ঠদেশ আবৃত করিয়া, ডান বগলের মধ্য দিয়া আসিয়া, সম্মুখ ভাগ আবৃত করিয়া বাম স্কন্ধের উপর চলিয়া গিয়াছে। আমি তাঁহার কোমর পর্য্যন্ত দেখিতেছি। তুমি কি জান—ইনি কে? ইনি নিশ্চয়ই তোমার গুরু হইবেন—আমার বিশ্বাস।"

মূর্ত্তি অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

মহিলাটির মুখে বিবরণ শুনিয়া ডাক্তার বোস্ বুঝিলেন সেখানে লোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবার আবির্ভাব হইয়াছে। তখন তিনি ভাল একখণ্ড কাগজে "লোকনাথ" নামটি ইংরাজিতে লিখিয়া তাঁহার হাতে দিয়া বলিলেন, "তুমি যা বলেছ তা ঠিক। তুমি যাঁকে দেখলে, তাঁর এই নাম। এই নাম তুমি সর্ব্বদা মনে রাখতে চেষ্টা করো—মঙ্গল হবে।" তারপর তিনি তাঁহাকে অস্ত্রোপচার করাইতে উপদেশ দিলেন। দৈবমূর্ত্তির আবির্ভাবে ও ডাক্তার বসুর উপদেশে তাঁহার প্রতীতি জন্মিল। অন্যত্র যাইয়া অস্ত্রোপচারের ফলে তিনি শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করিলেন।

আমেরিকায় অবস্থান কালে ডাক্তার বসুর নিকট লোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবার কোন ফটো বা প্রতিকৃতি ছিলনা।[২]

১ মহিলাটির এই বর্ণনাটি ডাক্তার বসু তখনই তাঁহারা ডাইরিতে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। উদ্ধৃত অংশ ডাইরি হইতে গৃহীত।

২ কিঞ্চিৎ অধিক চারি বৎসর কাল আমেরিকায় অবস্থানের পর ডাঃ বসু মহাশয় কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।

লোকনাথ ব্রহ্মচারী—ভক্ত-বাঞ্ছাপূরণকারী। অবসরপ্রাপ্ত জীবনে শ্রীবসু মহাশয়ের দীক্ষা গ্রহণের জন্য একান্ত আগ্রহ জন্মিল। শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবার নামের সংযোগ থাকে এমন মন্ত্র পাওয়ার জন্য তিনি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ধানবাদে শ্রীরামচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট হইতে তাঁহার দীক্ষা গ্রহণ করা স্থির হইল। নির্দ্দিষ্ট দিনে ও নির্দ্দিষ্ট সময়ে শাস্ত্রী ও বসু মহাশয় অনুষ্ঠান-উপকরণাদি সহ নিজ নিজ আসনে আসীন আছেন। শাস্ত্রী মহাশয় স্বীয় শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত নিঃশব্দে দীক্ষামন্ত্রাদি স্মরণ করিতে লাগিলেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের এই নীরব বীজমন্ত্রাদি স্মরণ একাগ্রচিত্ত বসু মহাশয়ের প্রাণে সাড়া দিতে লাগিল, এবং তাঁহার অভীপ্সিত ইষ্টমন্ত্র তাঁহার হৃদয়ে বসিয়া গেলেন। সমঘাটে বাঁধা থাকিলে যে কোন বাদ্যযন্ত্রে মৃদু আঘাতেও উপস্থিত অন্যগুলিতে ঝঙ্কার উৎপন্ন হয়। আধ্যাত্মিক ঘাটে বাঁধা প্রাণে ইহা আরও বিস্ময়কর। শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পেয়েছেন।"

নিশিকান্ত হৃষ্টচিত্তে উত্তর করিলেন, "পেয়েছি।"

তখন শাস্ত্রী মহাশয় অত্যন্ত আনন্দের সহিত এক রহস্যের উদ্‌ঘাটন করিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন :

"আমি আপনাকে 'রাম' নাম দিব ঠিক করিয়াছিলাম। কিন্তু গতরাত্রে দুই ঘটিকার সময় দৈববাণী হইল, 'রাম নাম দিও না। ইহা তাহার উপযুক্ত হইবে না।'

"তখন আমি প্রশ্ন করিলাম, 'কি মন্ত্র দিব ?"

"উত্তর পাইলাম, '—মন্ত্র দিও।'

"আমি আবার প্রশ্ন করিলাম, 'এ মন্ত্র কিরূপে দিব ?'

"উত্তর হইল, 'তাহাকে তোমার মুখে মন্ত্র বলিয়া দিতে হইবে না। এই মন্ত্র সে তোমার শ্বাসক্রিয়া হইতে গ্রহণ করিবে।"

শ্রীবসু মহাশয় শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবার নাম সংযুক্ত মন্ত্রই লাভ করিয়াছিলেন।

ক্ষেত্র প্রস্তুত হইলে বীজ বাতাসে উড়িয়া আসে।

শ্রীবসু মহাশয় কলিকাতায় স্বীয় বাসভবনে শ্রীশ্রীব্রহ্মচারী বাবার তৈলচিত্রাসন পাট প্রতিষ্ঠা করিয়া "শ্রীশ্রীলোকনাথ" নাম প্রচার করিতেন।

অসীম কৃপা

শ্রীশ্রীব্রহ্মচারী বাবার কৃপা সম্বন্ধে আমার নিজের জীবনের দু-একটি কথা লিপিবদ্ধ করিতে প্রবল ইচ্ছা হইতেছে। গ্রন্থারম্ভে নিবেদন করিয়াছি যে তাঁহার দয়ায় আমার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত্ত অগ্রসর হইতেছে।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দের কথা। তখন ঢাকায় আমার ছাত্রজীবন। বারদীর শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবার নাম শুনিয়াছি—এই মাত্র। আমার এক নিকট আত্মীয় ঢাকায় আসিয়া ব্রহ্মচারী বাবার একখানি ফটো আমার নিকট রাখেন, এবং ইহা ভাল করিয়া বাঁধাইয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতে বলিয়া যান। কি জানি কেন ফটো মূর্ত্তিখানি আমার বড় ভাল লাগিল, এবং সাধ্যানুসারে ইহা ভালরূপে ফ্রেমবদ্ধ করিয়া আমার নিকট রাখিলাম। ইহার পর আমার সেই আত্মীয়ও আর ইহা চান নাই, আমিও তাঁহাকে ফিরাইয়া দেই নাই। তখন স্কুল-কলেজের পরীক্ষা পাশটাই বড় বলিয়া মনে হইত, এবং এই জন্য রাত্রিতে শোয়ার সময় ও সকালে শয্যাত্যাগের পূর্ব্বে ঐ পাশ বিষয়টির জন্য তাঁহাকে বড় ডাকিতাম। ক্রমে আর একটি অভ্যাসও গড়িয়া উঠিল,—যখনই ছাত্রাবাসের বাহিরে যাইতাম, তখনই ঐ ফটো মূর্ত্তির দিকে তাকাইয়া জোড় হস্তে প্রণাম করিয়া বাহির হইতাম।

আমি যখন বরিশাল জিলাস্কুলে শিক্ষকতা করি, তখন ঢাকা গেণ্ডারিয়ার বিখ্যাত শ্রদ্ধেয় বীরেশ্বর সেন মহাশয়ের তিন পুত্র শ্রীমান অতুলচন্দ্র সেন, শ্রীমান সুধীরচন্দ্র সেন ও শ্রীমান অরুণ কুমার সেন শৈশব হইতে আরম্ভ করিয়া, তাহাদের পাঠ্যবস্থায়ও

দীর্ঘ দশ বৎসর কাল আমার সহিত অবস্থান করে। লিখিতে বড়ই আনন্দ বোধ হইতেছে যে, বরিশালে তাহাদের পাঠ অবসানে তাহারা আধ্যাত্মিক প্রেরণা লইয়া ঢাকায় চলিয়া যায়। প্রায় ত্রিশ বৎসর পর দেশ বিভাগের ফলে কলিকাতা আসিয়া পুনরায় তাহাদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটিয়াছে। দেখিয়া সুখী হইলাম—তাহারা আদর্শ ঠিক রাখিয়া জীবনপথে অগ্রসর হইতেছে।

ব্রহ্মচারী বাবার অজস্র করুণার দু-একটি ঘটনার উল্লেখ করিতে যাইয়া, ভয় হয় বুঝিবা আত্ম-প্রসঙ্গ বেশী লিখিয়া ফেলিতেছি।

আমাদের বাড়ীর সকলেরই অনেক দিন হইতে বড় আকাঙ্ক্ষা—ব্রহ্মচারী বাবার একখানি প্রমাণ আকারের প্রতিকৃতি যদি আসন-পাটে বসান যাইত!

আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নেপাল ঢাকায় পাটুয়াটুলিতে ঘড়ির ব্যবসায় করিত। এক দিন অপরাহ্নে দোকানে বসিয়া সে কাজ করিতেছে, এমন সময় অর্দ্ধবয়সী এক ভদ্রলোক তাহার দোকানে উঠিয়া, কাগজের আবরণ হইতে একখানা প্রমাণ আকারের চিত্র-মূর্ত্তি খুলিয়া তাহাকে দেখাইলেন, এবং বলিলেন, "আপনি নাকি এই ছবি রাখবেন?"

নেপাল ছবিতে লোকনাথ বাবার মূর্ত্তি দেখিয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত আগন্তুকের হাত হইতে ছবিখানি লইয়া প্রণাম করিল। তারপর তাঁহাকে সে নম্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনাকে কোথায় কে বল্লেন যে আমি এই ছবিখানি রাখব?"

আগন্তুক। "লোকনাথ বস্ত্রালয়ের" [অল্প কিছু দূর পূর্ব্বে অবস্থিত] নিকট রাস্তার উপর একটি বৃদ্ধলোক আমাকে বল্লেন, 'হাউস্ অব্ টাইমে[১] এই ছবি রাখবে', তাই এসেছি।

১ আমাদের দোকানটির নাম

নেপাল বিষয়টি বুঝিল এবং অব্যক্ত আনন্দ অনুভব করিল।

আপন চাহিদার পূর্ণ মূল্য আট টাকা পাইয়া ভদ্রলোক সন্তুষ্ট চিত্তে ছবিখানি রাখিয়া চলিয়া গেলেন। নেপাল মনে করিল—ভদ্রলোক তাঁহার পারিশ্রমিক বাবদ কিছুই নিলেন না। আগন্তুকও সম্ভবতঃ ভাবিলেন -লোকটি বেশ, দামদস্তুর করে না। উভয়েই ভাবিল উভয়েরই জিত হইয়াছে। অন্ততঃ এক পক্ষের জিত হইয়াছে বৈ কি।

মূর্ত্তিখানি পুরু কাগজের উপর রঙ্-চিত্র। সকলেই আমরা নিশ্চিত বুঝিলাম—পরম দয়াল শ্রীশ্রীবাবা লোকনাথ স্বেচ্ছায় পদার্পণ করিয়াছেন।

বিপদ-বারণ লোকনাথ

আর একটি মাত্র ঘটনা এখানে লিপিবদ্ধ করিলাম। বরিশাল জিলা স্কুল হইতে বদলি হইয়া ঝালকাঠী গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুলে আসিয়াছি। স্কুল-হোষ্টেলে থাকি। সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হোষ্টেলের খাওয়া শেষ হইয়া যায়।

বসন্তকাল। এক দিন সন্ধ্যার পর দক্ষিণ-খোলা একটা জানালার নিকট একখানা চেয়ার ফেলিয়া নিমীলিত নেত্রে আরাধ্য দেবতার নাম স্মরণ করিতে করিতে একটু তন্দ্রা ভাব আসিয়াছে এবং স্বপ্নে দেখিতেছি--'এখন যদি একটা সাপ জানালার শিক বাহিয়া আমার মাথার নিকট আসে, তবে আমি কি করি?' সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর আসিল—'সোজা সম্মুখ দিকে দৌড় দি।'[১] ঠিক এমন সময় হঠাৎ একটা চীৎকার শব্দ আমার কাণে প্রবেশ করিল, "রমেশ বাবু, রমেশ বাবু, সাপ, সাপ!"

শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নের "দৌড় দি" ক্রিয়াটি কার্য্যে পরিণত হইল। চেয়ার থেকে লাফ দিয়া উঠিয়া সোজা এক দৌড়ে কক্ষটির উত্তর প্রান্তে যাইয়া ফিরিয়া চাহিলাম। কি দেখিলাম?

১ চেয়ারখানার বরাবর সম্মুখ দিকে দুই সারি তক্তপোষের মধ্য দিয়া অন্ততঃ পনের হাত লম্বা খোলা জায়গা।

দেখিলাম—আমার চেয়ারখানার পিছনে কাঠের উপর জানালার দুইটি লোহার শিক আশ্রয় করিয়া একটি কেউটে মাথা তুলিয়া এদিক ও দিক ঝুঁকিতেছে।

ইহার পর যাহা ঘটিল, তাহা লিখিতে এখনও[১] আমার অত্যন্ত অনুতাপ হইতেছে। যাঁহাকে স্মরণ করিতে করিতে তন্দ্রায় একই সময়ে ঘটনাটি আমার মনে ঠিক ঠিক উপস্থিত হইয়াছিল, এবং ঐরূপ অবস্থায় পড়িলে—সোজা সম্মুখ দিকে দৌড় দিব—এই নির্দ্দেশও পাইয়াছিলাম, "সাপ, সাপ!" শব্দে সচেতন অবস্থায় আমি তাঁহার কথা ভুলিয়া গেলাম। বয়সের দোষে[২] উত্তেজনা আসিয়া পড়িল; ভুলিয়া গেলাম—কেউটে আমার কোন অনিষ্ট করে নাই। "মার, মার" বলিয়া সর্ব্বপ্রথম আমিই হোষ্টেলের ছেলেদিগকে উস্কাইয়া দিলাম। কেউটে নিহত হইল। ছেলেরা মাপিয়া দেখিল মৃতদেহ দৈর্ঘ্যে প্রায় চারি হাত।

আমার তন্দ্রার বিবরণ সকলকে বলিলাম। সহকর্ম্মী শিক্ষক শ্রদ্ধেয় শ্রীকৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম্, এ, বি, টি, মহাশয়[৩] আমাকে ডাকিয়াছিলেন, তাহাও শুনিলাম।

ঘটনাবলীর উল্লেখ আর কত করিব। ভক্তমাত্রেরই হৃদয়ে আপন আপন আরাধ্য দেবতার অসীম দয়া তাঁহাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত্তে অনুভূত হইতেছে, এবং অপার আনন্দ বিতরণ করিতেছে। এই অযাচিত করুণা আমাদিগের চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। জীবনের ঘটনাবলীর যোগসূত্রে নিরন্তর এই আশাই শুধু মনে উদিত হইতেছে,—

মহাপুরুষদের অপার কৃপার প্রভাবে জগৎ অনন্ত শান্তির দিকে অগ্রসর হইতেছে।

১ ছাব্বিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা।

২ তখন আমার বয়স তেতাল্লিশ বৎসর।

৩ সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বর্ত্তমানে তিনি বারাসত গান্ধী হাইস্কুলে সহকারী শিক্ষক।

ভক্তের ডাকে

১৯৫০ সনে ঢাকা হইতে সর্ব্বহারা হইয়া কলিকাতা আসার কিছু কাল পর পরম-দয়াল আশ্রয়-দাতা শ্রীশ্রীব্রহ্মচারী বাবার একখানা তৈলচিত্র মূর্ত্তি অঙ্কন করান আমার ভাগ্যে ঘটে। মূর্ত্তি অঙ্কনের পাঁচ বৎসর পর, ইহার রঙ্ উঠিয়া যাইতে আরম্ভ হয়, এবং মুর্ত্তিখানা নিষ্প্রভ দেখা যাইতে থাকে। জীবনের সাধ তৈলচিত্র মূর্ত্তিখানা প্রায় বিনা আয়াসে লাভ করিয়াছি। ইহা দিন দিন ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে দেখিয়া,—মনে যে কষ্ট হইল, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা আমার অসাধ্য। মূর্ত্তিখানার অঙ্গ-রাগের জন্য যথাসাধ্য স্থানীয় শিল্পীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম; কিন্তু কেহই আমাদের বাড়ীতে আসিয়া কাজ করিতে রাজি হইলেন না। শ্রীশ্রীবাবাকেও চিত্রকরের বাড়ীতে বা চিত্র-কক্ষে তুলিয়া দিতে আমার মন চাহিতেছে না। এমতাবস্থায় বাবাকে আপ্রাণ ডাকা ছাড়া অন্য কোন পন্থা আর আমার পক্ষে খোলা রহিল না।

হঠাৎ এক দিন আমার নিকট-আত্মীয় শ্রীমান সন্তোষ কুমার দেব আসিয়া উপস্থিত। আমার ছাত্রজীবনে লব্ধ[১] শ্রীশ্রীলোকনাথ বাবার প্রতিকৃতিখানা তাহার দরকার। তাহার গৃহে প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীব্রহ্মচারী বাবার তৈলচিত্র মূর্ত্তিখানার কিছু কিছু সংস্কার করা দরকার—ইহাতে ঐ মূর্ত্তির প্রয়োজন।

শ্রীমানের নিকট শুনিতে পাইলাম কুচবিহার দিনহাটা-নিবাসী শ্রীদ্বিজেন্দ্রচন্দ্র সরখেল মহাশয়[২] শ্রীশ্রীলোকনাথ বাবার অনেক তৈলচিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। সন্তোষের গৃহের মূর্ত্তিখানাও শ্রীসরখেল মহাশয়ের দ্বারাই অঙ্কিত। সরখেল মহাশয় তখন

১ প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বে
২ চিত্রকর শ্রীদ্বিজেন্দ্র চন্দ্র সরখেল। পোঃ দিনহাটা, কুচবিহার।

কলিকাতায়ই আছেন। সূত্র মিলিল। শ্রীমান সন্তোষের নিকট হইতে ঠিকানা লইয়া সরখেল মহাশয়কে আমার বিপদের বর্ণনা দিয়া, আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়া একখানা পত্র ছাড়িলাম।

অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার নিকট হইতে উত্তর পাইলাম। তিনি লিখিলেন,—তিনি শীঘ্রই আসিতেছেন।

কিছুকাল পর এক দিন সন্ধ্যাবেলা শ্রীমান সন্তোষ ও শ্রীসরখেল প্রায় একই সময় আসিয়া উপস্থিত। অভিবাদন-অন্তে সরখেল মহাশয় আত্ম-পরিচয় প্রদান করিলেন। তাঁহার দর্শন এবং কোমল কণ্ঠে তাঁহার পরিচয় শ্রবণমাত্রই, কি জানি কেন, আমি বলিয়া ফেলিলাম, "হ্যাঁ, আপনাকেই আমি চাই। আপনার দ্বারাই আমার কাজটুক সুসম্পন্ন হবে।"

তিনি মূর্ত্তিখানা দর্শন করিলেন। আমরা পড়ার ঘরে আসিয়া বসিলাম। সরখেল মহাশয় বলিতে লাগিলেন—

"শ্রীশ্রীব্রহ্মচারীবাবা সদা জাগ্রত।" আট দশ বছর আগের কথা। মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর কোতোয়ালীর অধীন ডাহাপাড়া থেকে এক ভদ্রলোক নগদ এক শ টাকা বায়না সহ শ্রীশ্রীলোকনাথ বাবার একখানা তৈলচিত্র মূর্ত্তি অঙ্কিত করে দেওয়ার জন্য আমাকে ডাকযোগে অনুরোধ-পত্র লিখে পাঠান। তাঁহার বিশ্বাস চিত্রকর হিসাবে আমার নিকট শ্রীশ্রীব্রহ্মচারী বাবার মূর্ত্তি নিশ্চয়ই আছেন; প্রয়োজনীয় চিত্রাদি ও কাগজপত্রের সঙ্গে ছিলেনও,—আমার এখনও বেশ মনে আছে; কারণ ইহার পূর্ব্বে ব্রহ্মচারী বাবার দু-খানা মূর্ত্তি অঙ্কিত করেছি।

"ঐ মূর্ত্তি খুঁজতে গিয়ে অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। মূর্ত্তিখানা পাওয়া যাচ্ছে না। তন্ন তন্ন করে সম্ভাব্য অসম্ভাব্য সব জায়গা খুঁজলাম; কিন্তু সব চেষ্টাই নিষ্ফল হল। নিজের কাছেই নিজে বেকুব বনিলাম। ভদ্রলোক অনেক আশা ও অনেক বিশ্বাস

নিয়েই বায়নার টাকা পাঠিয়েছেন। এই টাকা ফেরতই বা দিই কিরূপে! ভদ্রলোক কি ভাববেন আমাকে! কি মুস্কিলে পড়লাম! নিশ্চিত মনে আছে,—ছবি রেখেছি; কিন্তু এখন পাচ্ছি না।

"কি আর করব। শ্রীশ্রীঠাকুরের উপর নির্ভর করা ছাড়া অন্য উপায় নেই। এই আমার শেষ পন্থা।

"পরদিন রেইল-ওয়ে ষ্টেশান্ থেকে বাড়ী ফিরছি—কুচবিহার জেনারেল্ পোষ্ট-অফিসের ধার দিয়ে। পোষ্ট অফিসের বারেন্দা থেকে এক ভদ্রলোক বেশ উচু গলায় কাকে উদ্দেশ্য করে ডাকছেন, 'ওগো মশাই, শুনছেন, ও আর্টিষ্ট মশাই।'

"'আর্টিষ্ট' কথাটা কানে যেতেই থামলাম, এবং পোষ্ট-অফিসের বারেন্দার দিকে তাকাইলাম। দেখলাম হাত-ছানি দিয়ে ভদ্রলোক আমাকেই ডাকছেন। আমি ঐ দিকে অগ্রসর হতেই, তিনিও বারেন্দা থেকে নেমে এসে আমাকে বল্লেন, 'আপনার নামই ত দ্বিজেনবাবু? আপনিই ত তৈল চিত্রাদি এঁকে থাকেন?'

"আমি ঘাড় ঈষৎ কাৎ করে তাঁহার কথার উত্তর দিলাম। তিনি বল্লেন, 'গোলবাগানের [কুচবিহার] শ্রীহরিপদ দে সুরকার আপনাকে খুঁজছেন—সম্ভবতঃ ছবি আঁকানর জন্য।'

"শ্রীহরিপদ দে সরকারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জানলাম,—সুদূর গ্রামবাসী তাঁহার এক নিকট আত্মীয় শ্রীশ্রীলোকনাথ বাবার একখানা তৈলমূর্ত্তি আমার দ্বারা অঙ্কন করাণর উদ্দেশ্যে, তাঁহার নিকট বাবার একখানা ছবি-মূর্ত্তি ও বায়না-স্বরূপ কিছু টাকা পাঠিয়েছেন! সন্নিহিত একটি টেবিলের দেরাজ টেনে তিনি বাবার মূর্ত্তিখানা বের করলেন—এবং আমার হাতে দিলেন। মূর্ত্তিখানা হাতে নিয়ে আমি অভিভূত হয়ে পড়লাম। ঠাকুরের কি কৃপা!—তিনি আমাকে বাঁচালেন। "এই প্রতিমূর্ত্তি দর্শনে আমার মনে হ'ল,—শ্রীগুরুর ইচ্ছা অনেক রকমে পূর্ণ হয়। আমার নিকট রক্ষিত

মূর্ত্তিখানির কাগজ জীর্ণ এবং ছবি অনেক স্থলে অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল; আর পরে পাওয়া মূর্ত্তিখানি অধিকতর স্পষ্ট।

"ছবিখানা না পাওয়ার ব্যাপার এখন আর আমার নিকট রহস্য রহিল না। বুঝিলাম—ইহা শ্রীশ্রীঠাকুরেরই দয়া।"

শ্রীসরখেল মহাশয়ের ভাবাবেগ বর্ণনায়, তাঁহার প্রতি আমার ভক্তি-বিশ্বাস দৃঢ় হইল। আধ্যাত্মিক ব্যাপারে প্রকৃত ভাবের আবেগে শক্তি বৃদ্ধি ও পূর্ণতার উদয় হয়।

যথাসময়ে দুখানা তৈল-চিত্রমূর্ত্তিই অঙ্কিত হ'য়ে যথাস্থানে চলে গেলেন—সরখেল বলিলেন।

তিনি আমাদের বাড়ীতে একটি নিভৃত কক্ষে বসিয়া গভীর মনোনিবেশে আমাদের মূর্ত্তিখানার অঙ্গরাগ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। অঙ্গরাগ নিখুঁত হওয়ায় শ্রীশ্রী বাবা স্বীয় আসনে উপবিষ্ট আছেন,—দর্শনমাত্রই ভক্তের মনে এই ভাবের উদ্রেক হয়।

শ্রীমৎ বেণীমাধব ব্রহ্মচারী

শ্রীমৎ বেণীমাধব ব্রহ্মচারী বাবা লোকনাথের বাল্যসখা। উভয়েই গুরু ভগবান গাঙ্গুলী মহাশয়ের প্রাণতুল্য প্রিয়শিষ্য। বেণীমাধব গুরুর নির্দ্দেশে একবার মাসাহব্রত সুষ্ঠু পালন করেন। কাশীধামে গুরুর দেহপাতের সময়ে লোকনাথ ও বেণীমাধব উভয়েই উপস্থিত ছিলেন। দেহ-রক্ষার পূর্ব্বে গুরু ভগবান তাঁহার এই এক শত বৎসর বয়সী "বালকদ্বয়কে" মহাপুরুষ হিতলাল মিশ্র মহাশয়ের হস্তে সমর্পণ করিয়া যান। গুরুতুল্য হিতলাল মিশ্র এবং এই বালকদ্বয় উত্তরাঞ্চল ও পূর্ব্বাঞ্চল ভ্রমণে বাহির হন। প্রায় দীর্ঘ তেত্রিশ বৎসর কাল বরফাঞ্চলে পদব্রজে পরিভ্রমণের পর হিতলাল, "তোমার নিম্নভূমিতে কর্ম্ম আছে"[১]—

১ গুরু ভগবানকে তুলিয়া লইতে হইবে।

বলিয়া বাবা লোকনাথকে ব্রহ্মচারী বেণীমাধব সহ চীনদেশ হইতে বিদায় দিয়া একাকী আরও পূর্ব্বে অগ্রসর হন।

ব্রহ্মচারী বেণীমাধব সহ বাবা লোকনাথ চন্দ্রনাথ পাহাড় পর্য্যন্ত নামিয়া আসিলেন। চন্দ্রনাথ হইতে তাঁহারা লৌকিক বিচ্ছিন্ন হইয়া, বাবা লোকনাথ বাঙ্গলার সমতলভূমিতে নামিলেন, আর বেণীমাধব অগ্রসর হইলেন কামরূপ অভিমুখে। তখন তাঁহাদের বয়স কিছু কম বেশী এক শত ত্রিশ বৎসর।

লোকনাথ বাবার দেহ রক্ষার কিছু কাল পূর্ব্বে ব্রহ্মানন্দ ভারতী মহাশয় বেণীমাধব সম্বন্ধে প্রশ্ন করায়, বাবা লোকনাথ বলিয়াছিলেন, "বেণী কামরূপে আছে।" ইহা ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের কথা। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে বাবা লোকনাথ দেহ রক্ষা করেন।

ব্রহ্মচারী বাবার দেহ-রক্ষার চব্বিশ বৎসর পর ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা কালীঘাট শ্রীশ্রীকালীমাতার মন্দির প্রাঙ্গণে, এক দিন সশিষ্য এক মহাপুরুষ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার দেহ-যষ্টিখানি লোকনাথ বাবার দেহের মতই একহারা ও দীপ্ত। তাঁহার মস্তক কেশবিরল, মুখমণ্ডল শ্মশ্রুবিহীন, বাহুযুগল আজানুলম্বিত এবং নয়নদ্বয় পলকহীন; পরিধানে কৌপীন। মায়ের মন্দিরে যাহারা আসিল, তাহারা সকলেই তাঁহাকে দেখিয়া কৃতার্থ হইল। এই মহাপুরুষের আগমন-বার্ত্তা অল্পকালের মধ্যেই চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল।

কালিয়া-বেন্দা-নিবাসী পণ্ডিতপ্রবর ও সাধক শ্রীক্ষিতীশ-চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই মহাপুরুষের কথা শুনিয়া, তাঁহার দর্শন-লাভের জন্য এক দিন সন্ধ্যার পর কালীঘাট মন্দিরে আসিয়া তাঁহার নিকট উপবেশন করিলেন। কিছুকাল পর মহাপুরুষ অতি ধীর ভাবে তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি সিদ্ধবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তোমার পিতাও এক জন সাধক ছিলেন।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহাকে যথোচিত অভিবাদন করিয়া বিনীত-ভাবে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাপুরুষ বলিতে লাগিলেন, "আমার জন্মস্থান বঙ্গদেশেই, আমি ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব। আমারই এক যোগসিদ্ধ গুরুভ্রাতা পূর্ব্ববঙ্গের কোনও একস্থানে, জনসাধারণের কল্যাণের জন্য, তাঁহার লৌকিক জীবনের শেষ ভাগ কাটাইয়া গিয়াছেন।"

এই কথা শুনিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় লোকনাথ বাবার নাম উল্লেখ করায়, মহাপুরুষ শান্তভাবে বলিলেন, "হ্যাঁ, তাঁহার নাম লোকনাথ। চন্দ্রনাথ পাহাড়ে লোকনাথ ও আমি পরস্পর হইতে দৈহিক বিচ্ছিন্ন হই ; ইহার পরও, যখনই আমি তাঁহাকে স্মরণ করিয়াছি, তখনই তিনি আমাকে দর্শন দিয়াছেন।"[১]

ভট্টাচার্য্য মহাশয় আরও কিছু জিজ্ঞাসা করিয়া মহাপুরুষ সম্বন্ধে আরও তথ্য জানিয়া লইবেন—ভাবিতেছেন, এমন সময় সেখানে লোকের ভীড় জমিয়া গেল।

মহাপুরুষের সঙ্গীয় শিষ্যটির সহিত আলাপ করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় জানিলেন—শিষ্যটি মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। তাঁহার গুরুজি "ওঙ্কারানন্দ স্বামী" নামে খ্যাত ; হৃষীকেশ তীর্থধামে তাঁহার আস্তানা [আশ্রম][২]।

কালীঘাটে কয়েক দিন অবস্থানের পর, তিনি স্থান ত্যাগ করেন। ইহার পর তাঁহার সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় নাই।

১ "বেণী কামরূপে আছে," লোকনাথ বাবার এই উক্তিতে এই মহাপুরুষই যে বেণীমাধব, ইহা সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হয়।

২ চন্দ্রনাথ পাহাড় হইতে কামরূপ, এবং খুব সম্ভবতঃ কামরূপ হইতে হৃষীকেশে আশ্রম স্থাপন করেন। কালীঘাট আগমন কালে তাহার বয়স কিছু কম বেশী এক শত পঁচাশী বৎসর।

স্তোত্র ও সঙ্গীত

শ্রীশ্রীগুরুপ্রণাম*

গুকারশ্চ অন্ধকারঃ স্যাৎ রুকারঃ তেজঃ উচ্যতে।
অজ্ঞাননাশকং ব্রহ্ম গুরুরেব ন সংশয়ঃ ॥ ১

সংসারবৃক্ষমারূঢ়াঃ পতন্তি নরকার্ণবে।
যেন উদ্ধৃতমিদং বিশ্বং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ২

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৩

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৪

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুঃ গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৫

সর্ব্বশ্রুতি-শিরোরত্ন-বিরাজিত-পদাম্বুজম্।
বেদান্তাম্বুজ-সূর্য্যায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৬

স্থাবরং জঙ্গমং ব্যাপ্তং যৎকিঞ্চিৎ সচরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৭

চিন্ময়ং ব্যাপিতং সর্ব্বং ত্রৈলোক্য সচরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৮

চৈতন্যং শাশ্বতং শান্তং ব্যোমাতীতং নিরঞ্জনম্।
বিন্দুনাদকলাতীতং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৯

যস্য স্মরণমাত্রেণ জ্ঞানমুৎপদ্যতে স্বয়ম্।
স এব সর্ব্বসম্পন্নঃ তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ১০

স্থাবরং নির্ম্মলং শান্তং জঙ্গমং স্থিরমেব চ।
ব্যাপ্তং যেন জগৎ সর্ব্বং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ১১

জ্ঞানশক্তিসমারূঢ়ং তত্ত্বমালাবিভূষিতম্।
ভুক্তিমুক্তিপ্রদাতারং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ১২

* শ্রীশ্রীগুরুগীতা হইতে উদ্ধৃত

অনেক-জন্ম-সংপ্রাপ্ত কর্ম্মবন্ধ-বিদাহিনে।
আত্মজ্ঞান-প্রদানেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ১৩

শোষণং ভবসিন্ধোশ্চ প্রাপণং সারসম্পদাম্।
গুরোঃ পাদোদকং সম্যক্ তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ১৪

ন গুরোরধিকং তত্ত্বং ন গুরোরধিকং তপঃ।
তত্ত্বজ্ঞানাৎ পরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ১৫

মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথঃ মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ।
মদাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ১৬

গুরুরাদিরনাদিশ্চ গুরুঃ পরমদেবতা।
গুরোঃ পরতরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ১৭

গুরুরেব জগৎ সর্ব্বং ব্রহ্মাবিষ্ণু শিবাত্মকম্।
গুরোঃ পরতরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ১৮

মৎপ্রাণাঃ শ্রীগুরুপ্রাণাঃ মদ্দেহঃ গুরুমন্দিরম্।
পূর্ণং অন্তর্ বহির্যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ১৯

নিত্যং শুদ্ধং নিরাভাসং নিরাকারং নিরঞ্জনম্।
নিত্যবোধং চিদানন্দং গুরুঃ ব্রহ্ম ভজাম্যহম্॥ ২০

ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্ত্তিঃ পূজামূলং গুরোঃ পদম্।
মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা॥ ২১

গুরুর্দেবঃ গুরু ধর্ম্মঃ গুরু নিষ্ঠা পরং তপঃ
গুরোঃ পরতরং নাস্তি নাস্তি তত্ত্বং গুরোঃ পরম্॥ ২২

গুরোঃ সেবা পরং তীর্থম্ অন্যতীর্থম্ অনর্থকম্।
সর্ব্বতীর্থাশ্রয়ঃ দেবি সদ্‌গুরোঃ চরণাম্বুজম্॥ ২৩

ত্বমেব মাতাচ পিতা ত্বমেব
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব
ত্বমেব সর্ব্বং মম দেব দেব॥ ২৪

শ্রীমৎ পরং ব্রহ্ম গুরুং বদামি
শ্রীমৎ পরং ব্রহ্ম গুরুং ভজামি।
শ্রীমৎ পরং ব্রহ্ম গুরুং স্মরামি
শ্রীমৎ পরং ব্রহ্ম গুরুং নমামি॥ ২৫*

শ্রীশ্রীগুরুস্তব।*

ভব-সাগর-তারণ-কারণ হে,
রবি-নন্দন-বন্ধন-খণ্ডন হে,
শরণাগত কিঙ্কর ভীত মনে,
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে॥ ১

হৃদি-কন্দর-তামস-ভাস্কর হে,
তুমি বিষ্ণু প্রজাপতি শঙ্কর হে,
পরব্রহ্ম পরাৎপর বেদ ভনে,
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে॥ ২

মন-বারণ শাসন-অঙ্কুশ হে,
নরত্রাণ তরে হরি চাক্ষুস হে,
গুণগান-পরায়ণ দেবগণে,
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে॥ ৩

কুলকুণ্ডলিনী-ঘুম-ভঞ্জক হে
হৃদিগ্রন্থি-বিদারণ-কারক হে,
মম মানস চঞ্চল রাত্রদিনে,
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে॥ ৪

রিপুসূদন মঙ্গল-নায়ক হে,
সুখশান্তি-বরাভয়-দায়ক হে,
ত্রয়তাপ হরে তব নাম গুণে,
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে॥ ৫

অভিমান-প্রভাব-বিমর্দ্দক হে,
গতিহীন জনে তুমি রক্ষক হে,
চিত শঙ্কিত বঞ্চিত ভক্তিধনে,
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে॥ ৬

তব নাম সদা শুভ-সাধক হে,
পতিতাধম-মানব-পাবক হে,
মহিমা তব গোচর শুদ্ধ মনে,
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে॥ ৭

* চট্টগ্রাম কৈবল্যধামের শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের "সঙ্কলন" নামক পুস্তিকা হইতে গৃহীত।

ওঁ

নমো ভগবতে লোকনাথায়

১

যো যোগীন্দ্রমুনীন্দ্র সিদ্ধপুরুষান্নির্জ্জিত্য যোগীশ্বরঃ
কৃচ্ছ্রাম্নাততপংপ্রভাবনিবহৈঃ প্রাদুর্বভূবাত্মনা।
দুষ্টানাং চিরমঙ্গলার্থ বিধিনা ত্রাণায় যস্যানঘং
লোকানাং ভবতাপনাশকরণং মাহাত্ম্যমস্মৈ নমঃ ॥

২

যো নাম্না প্রথিতস্তপোঽন্বিততনুঃ শ্রীলোকনাথঃশুচিঃ
নাগাধ্যাসিতবারদীসুনগরেঽ তিষ্ঠন্মুদা স্বেচ্ছয়া
যস্যৈশ্বর্য্যগুণান্বিতস্য মহতো বিশ্বাত্মনঃ শ্রীগুরোঃ
ব্রহ্মাখ্যং প্রকটীবভূব পরমং তেজস্তদস্মৈ নমঃ ॥

৩

উদ্যজ্জোতিঃপ্রবাহঃ সুরগুরুললিতঃ পিঙ্গসন্নদ্ধকেশো
জ্ঞানিধ্যানি-প্রণীণো জগদঘহরণো দীপ্তমার্ত্তণ্ডনেত্রঃ।
ভাস্বানাজানুলম্বি প্রমিতভুজযুগো জ্ঞানলীলাভিরামঃ
আসীদ্ যো ব্রহ্মনিষ্ঠস্ত্রিগুণ-বিরহিতো ভক্তিতস্তং নমামি ॥

৪

আজন্মব্রহ্মচর্য্যং প্রতিহতমদনং স্বীকৃতং যেন নিত্যং
কারুণ্যংযস্য জীবে সকলজনহিতং সুব্রতং শাশ্বতঞ্চ
মোহান্ধানাং প্রদীপো বিষয়জড়ধিয়ামাশ্রয়ো যঃ সদাসীৎ
মোক্ষার্থং লোকনাথং ভবভয়চকিতো ভক্তিতস্তং নমামি ॥

৫

হিমাদ্রিজাতৈস্তুহিনৈস্তবাসীৎ ঋতৌ হিমাখ্যে পরিবীতমঙ্গং।
তপস্যতস্তত্র শতাধিকানি বর্ষাণি মুক্তঞ্চ পুনর্নিদাঘে ॥

৬

আরণ্যক-ব্যাল-ভুজঙ্গবর্গা—স্ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মান্ শমমাস্থিতাশ্চ।
তেজঃপ্রভাবান্মহতস্তবেশ খগাশ্চ নীতাঃ সখিতাং শমেন ॥

৭

যো ধর্ম্মমেবং স্বয়মন্বতিষ্ঠৎ বিনীতবান্ যো নরলোকপালান্।
শূন্যর্ত্তুচন্দ্রাভ্যধিকাঃ সমাশ্চ প্রকাশ্য লীলাং সমবাপ শান্তিম্॥

৮

অলং ন ধী র্মে গুণবর্ণনায় গুণত্রয়াণাং প্রভবস্য তস্য।
অগোচরো যঃ সকলেন্দ্রিয়াণাং ভজামি কিং তং প্রভুমপ্রমেয়ং॥

৯

ত্বং খেচরস্ত্বং ভুবনত্রয়স্য সর্ব্বার্থবেত্তা হ্যনিমেষদৃষ্টিঃ।
করোতু শং মে ভবদুঃখহারিন্ অনিন্দ্যপাদঃ স্ফুটপদ্মরাগঃ॥

১০

যোগীশ্বরো যো মনসাপ্যধৃষ্য শ্চক্রেশ্বরোঽভূৎ কুলশাস্ত্রবিজ্ঞঃ।
স্বলীলয়াহো স্বগুরো র্বিধাতা তং দেবদেবং সততং ভজামি॥

১১

গীতার্থসারং মধুরং প্রকাশ্য লীলারসোদ্ভাবিতমঞ্জুবাচা।
ধন্যীকৃতা যেন বিনীত শিষ্যাঃ তং লোকনাথং সততং ভজামি॥

১২

অনন্তকারুণ্যনিধেঃ সমাস্তে দয়া নরশ্বাপদকীটজাতৌ।
ভবাব্ধিতাপত্রয়নক্রভিন্নে দেবেশ মুগ্ধে কিমু সা ন তে স্যাৎ॥

১৩

ত্বন্নামসংকীর্ত্তনজাতহর্ষাঃ ভবন্তি সন্তো গলদশ্রুধারাঃ।
অদর্শনোজ্জৃম্ভিত শোকভারাঃ লোকেশ হে নাথ ভব প্রসন্নঃ।

১৪

ভবাম্বুধৌ দেব কৃতাবগাহং রিপোর্বশান্নিত্যকৃতাপরাধং।
পাপপ্রভাবাৎ প্রতিকূলদৈবং লোকেশ রক্ষাকুলমানসং মাং

১৫

যঃ সূক্ষ্মদেহমাশ্রিত্য নিত্যলীলাং বিকাশয়ন্।
সজ্জনাশ্রমমাপ্নোতি যদা তং প্রণমাম্যহং॥

১৬

ওঁ নমস্তেঽদ্বৈততত্ত্বায় নমো মুক্তিপ্রদায় চ।
ত্রিলোক-গুরুরূপায় লোকনাথ নমোঽস্তু তে॥

১৭

মোক্ষমূলমিদং স্তোত্রং লোকনাথস্য ভক্তিমান্।
যঃ পঠেৎ প্রযতোভূত্বা সোঽচিরাম্মোক্ষমাপ্নুয়াৎ॥

ইতি শ্রীমল্লোকনাথ-দাসদাস-কেদারেশ্বর-বিরচিতং
শ্রীশ্রীলোকনাথস্য স্বরূপাখ্যং স্তোত্রং সমাপ্তম্।

প্রার্থনা-সঙ্গীত

জয় বাবা মঙ্গলকারী লোকনাথ ব্রহ্মচারী।
জয় বাবা মঙ্গলকারী লোকনাথ ব্রহ্মচারী।
ভক্তবাঞ্ছা-পূর্ণকারী জয় বাবা ব্রহ্মচারী।
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ কর দয়াময় ব্রহ্মচারী॥ ১
বিঘ্নবিপদ-ধ্বংসকারী জয় বাবা ব্রহ্মচারী।
(আমার) বিঘ্নবিপদ ধ্বংস কর কৃপাময় ব্রহ্মচারী॥ ২
ব্যাধিপীড়া-নাশকারী জয় বাবা ব্রহ্মচারী।
(আমার) ব্যাধিপীড়া নাশ কর প্রেমময় ব্রহ্মচারী॥ ৩
রাগদ্বেষ-লয়কারী জয় বাবা ব্রহ্মচারী।
(আমার) রাগদ্বেষ লয় কর দয়াময় ব্রহ্মচারী॥ ৪
ধর্ম্ম-অর্থ-প্রদানকারী জয় বাবা ব্রহ্মচারী।
(আমায়) ধর্ম্ম অর্থ প্রদান কর কৃপাময় ব্রহ্মচারী॥ ৫
কামনা-বাসনা-পূর্ণকারী জয় বাবা ব্রহ্মচারী।
(আমার) কামনা বাসনা পূর্ণ কর প্রেমময় ব্রহ্মচারী॥ ৬
ভক্তি-মুক্তি-প্রদানকারী জয় বাবা ব্রহ্মচারী।
(আমায়) ভক্তি মুক্তি প্রদান কর দয়াময় ব্রহ্মচারী॥ ৭
শান্তিধনের অধিকারী জয় বাবা ব্রহ্মচারী।
(আমার) শিরে দাও শান্তিবারি কৃপাময় ব্রহ্মচারী॥ ৮

ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ হল জয় বাবা ব্রহ্মচারী।
ভক্তজনে দয়া হল জয় বাবা ব্রহ্মচারী ॥ ৯
অভক্তেও দয়া হল জয় বাবা ব্রহ্মচারী।
নামে দাও গড়াগড়ি ব'লে জয় ব্রহ্মচারী ॥
প্রেমানন্দে লুট দাও ব'লে জয় ব্রহ্মচারী ॥ ১০

শ্রীশ্রীলোকনাথ-বন্দনা
(কীর্ত্তনের সুর)

জয় বাবা লোকনাথ জয় বাবা লোকনাথ
জয় বাবা লোকনাথ জয়, জয়, জয়।
তুমি নিত্য নিরঞ্জন অব্যক্ত কারণ,
সত্য-জ্ঞান-ঘন আনন্দময়।
তুমি শিব শঙ্কর বিষ্ণু চক্রধর,
ব্রহ্মা হ'য়ে কর সৃজন-পালন লয় ॥ ১
তুমি গঙ্গা-নারায়ণ পতিত পাবন,
ব্রহ্ম সনাতন বিশ্ব-ভুবনময়।
তুমি অন্তরযামী মঙ্গলকামী
সদ্গুরুদেব তুমি করুণাময় ॥২
তব যুগল চরণ লইয়ে শরণ
কত রোগিজন হয় নিরাময়।
(আমি) ভবরোগে ডুবে মরি হায় হায় সদা করি
তব ঐ পদতরী দাও দয়াময় ॥ ৩
তব যুগল নয়ন চন্দ্রমা-তপন
ভক্তানুরাগিগণ সমাশ্রয়।
তব কৃপাদৃষ্টিপাতে সন্ধ্যা-প্রভাতে
হয় প্রণিপাতে জীব-পাপ-ক্ষয় ॥ ৪

তুমি বারদী আসিয়ে বীরাসনে বসিয়ে
ও মূর্ত্তি দেখায়ে গেলে দয়াময়।
(তব) উচ্চ নীচ ভেদজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানে অবসান
শুধু জীবের কল্যাণ তোমার আশয় ॥৫
(তুমি) দেহে ছিলে যত দিন নিজ তনু করি ক্ষীণ
উদ্ধারিলে কত শত দুঃখী তাপীজন।
এবে ব্রহ্মে মিলাইয়ে সর্ব্ব-জ্ঞান-শক্তি লয়ে
ব্রহ্মাণ্ডের উপকারে সঁপিয়াছ মন ॥৬
যে জন পূজে তোমারে (শুধু) ফুল জল উপচারে
ডাকে প্রাণে সকাতরে, সে পায় তোমায়।
(আবার) না স্মরি তোমার মূর্ত্তি না গাহি তোমার কীর্ত্তি
কত শত পায়, তুমি কতই সদয় ॥ ৭
তোমার প্রসাদী অন্ন পেয়ে জীব হয় ধন্য
অপার্থিব গন্ধে দিক্ হয় আমোদিত।
তোমার চরণামৃত, আশ্রমের রজঃপূত,
দেবতা দানব মানব নিত্য আকাঙ্খিত ॥৮
আমি অতি অভাজন, না বুঝে অমূল্যধন,
অজ্ঞানে তা'য় করি অবহেলা।
(আমায়) জ্বলন্ত বিশ্বাস দাও (আমায়) কুমতি হরিয়ে লও
কুঅভ্যাস হতে মোরে রক্ষ এবেলা ॥৯
(আমি) কৃত-কর্ম্ম পাপে সংসার চাপে
রোগ-শোক-তাপে জ্বলি অনুক্ষণ,
তুমি শান্তি সাগর শান্তি বারি বিতর
চির শান্তি দান কর দিয়ে দরশন ॥১০
আমা হেন পাপী-জনে বিবেক-বৈরাগ্যহীনে
তার তুমি নিজগুণে হে মহাযোগিন্।
আমার আর নাই উপায়, ভরসা শুধু তব পায়
করুণা করিয়ে দুঃখ করে দাও হীন ॥১১

(আমার) সংশয়-সন্দেহ-ভয় করে দাও লীন।
(আমার) জীব-শিব-ভেদ-জ্ঞান করে দাও ক্ষীণ।
(তোমার) মহামায়া-পাশ থেকে ক'রে দাও স্বাধীন।
(আমায়) অহেতুকী ভক্তি দিয়ে ক'রে লও অধীন।
(তোমার) ভজনানন্দে মগ্ন ক'রে রেখো নিশিদিন।
(আমার) ইহ-পরকালে সঙ্গী থেকো চিরদিন ॥১২

শ্রীপ্রভাত চন্দ্র গুহ (হেডমাষ্টার, বারদী)।

১লা জানুয়ারী, ১৯৩৩

উষা-কীর্ত্তন

জাগ গো ও বারদীবাসী !
বাবা লোকনাথ তোমার ঘরে প্রবেশ-প্রয়াসী ॥
কত কাল র'বে প'ড়ে মোহ-ঘুমে অচেতন ?
কত কালে চিন্‌বেরে ভাই পরম অমূল্য ধন ?
বাবা যে ভাই শিব-দুর্গা-রাম-কৃষ্ণ-গৌর-শশী ॥১
সিদ্ধিদাতা গণেশ বাবা প্রেম করুণাময়।
সকাতরে ডেকে দেখ না রবে দুশ্চিন্তা ভয়।
ভুক্তি-মুক্তিদাতা বাবা তীর্থ বারাণসী ॥২
জ্ঞান-মূর্ত্তি বাবা লোকনাথ চরাচর বিশ্বময় ॥
পূর্ণানন্দের খনি বাবা অন্তর্য্যামী মৃত্যুঞ্জয়।
তাঁর চরণে কায়-মনে রাখ শির অহর্নিশি।
তাঁর ধ্যানে, মনে প্রাণে থাক ডুবে দিবানিশি ॥৩

শ্রীশ্রীলোকনাথ-বন্দনা

১। জয় বাবা মঙ্গলকারী, লোকনাথ ব্রহ্মচারী,
তুমিই বেদান্তবেদ্য বহুরূপধারী,
অসঙ্গ-চৈতন্য, তোমা নমস্কার করি,
আমরা তোমার, বাবা! তুমি আমাদেরি।

২। তুমি সত্য সনাতন জয় বাবা জয়,
তুমি নিত্যনিরঞ্জন জয় বাবা জয়,
তুমি সর্ব্বশক্তিমান্ জয় বাবা জয়,
জীবরূপী শিব বাবা! দাও পদাশ্রয়।

৩। আমাদের পিতা তুমি জয় বাবা জয়,
আমাদের মাতা তুমি, জয় বাবা জয়,
আমাদের সখা তুমি, জয় বাবা জয়,
চিরন্তন বন্ধু তুমি চিদানন্দময়।

৪। প্রাণ হ'তে প্রিয় তুমি, জয় বাবা জয়,
পুত্র হ'তে প্রিয় তুমি, জয় বাবা জয়,
বিত্ত হ'তে প্রিয় তুমি, জয় বাবা জয়,
সর্ব্বভূত-আত্মা তুমি, আছ সর্ব্বময়।

৫। চিরকাল আছ তুমি, জয় বাবা জয়,
চিরকাল ছিলে তুমি, জয় বাবা জয়,
চিরকাল রবে তুমি, জয় বাবা জয়,
হে চিরসুন্দর! তুমি চিদানন্দময়।

৬। তুমি বাবা ক্ষমাসার, জয় বাবা জয়,
বাৎসল্যের পারাবার, জয় বাবা জয়,
করুণা-বরুণালয়, জয় বাবা জয়,
ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু, চাহি পদাশ্রয়।

(২)

৭। তুমি বাবা জ্ঞানদাতা, জয় বাবা জয়,
পাপী, তাপী পরিত্রাতা জয় বাবা জয়,
বিপদে অভয়দাতা, জয় বাবা জয়,
রোগে শোকে শান্তিদাতা, বাবা শান্তিময়।

৮। পতিতপাবন তুমি, জয় বাবা জয়,
দুর্ব্বলের বল তুমি, জয় বাবা জয়,
অনাথের নাথ তুমি, জয় বাবা জয়,
অগতির গতি বাবা দাও পদাশ্রয়।

৯। সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারী, জয় বাবা জয়,
ব্যথিতের ব্যথাহারী, জয় বাবা জয়,
ভবপারের কাণ্ডারী, জয় বাবা জয়,
গতি, ভর্ত্তা, প্রভু, সাক্ষী, হও হে সদয়।

১০। সসীম অসীম তুমি, জয় বাবা জয়,
সগুণ নির্গুণ তুমি, জয় বাবা জয়,
দ্রষ্টা তুমি, দৃশ্য তুমি, জয় বাবা জয়,
ভবরোগ-বৈদ্য বাবা! কর নিরাময়।

১১। সজ্জনপালক তুমি, জয় বাবা জয়,
দুর্জ্জননাশক তুমি, জয় বাবা জয়,
তুমি বাবা অন্তর্যামী, জয় বাবা জয়,
তুমিই অচিন-পাখী, অজ্ঞেয়, অদ্বয়।

১২। ভাবাতীত তুমি বাবা! জয় বাবা জয়,
গুণাতীত তুমি বাবা! জয় বাবা জয়,
অন্তরে-বাহিরে তুমি, জয় বাবা জয়,
তুমি এক অদ্বিতীয় চিদানন্দময়।

(৩)

১। ভুবনমঙ্গল-নাম জয় বাবা জয়
নামসনে নামী রয়, করে তাঁর বরাভয়,
সচ্চিদানন্দ বাবা আমরা তনয়,
বাবার প্রীতির তরে, বল বাবা জয়।
বাহু তুলে সবে বল, জয় বাবা জয়,
নাচিতে নাচিতে বল, জয় বাবা জয়,
হাসিতে, কাঁদিতে বল, জয় বাবা জয়,
ব্রহ্মের সন্তান মোরা, বাবা ব্রহ্মময়।

২। পতিতপাবন-নাম জয় বাবা জয়,
নামসনে নামী রয়, করে তাঁর বরাভয়,
অনাথশরণ বাবা সবার আশ্রয়,
জীবরূপী শিব বাবা, আমরা তনয়।
উদয়াস্তকালে বল, জয় বাবা জয়,
নিশীথে নীরবে বল, জয় বাবা জয়,
সম্পদে বিপদে বল, জয় বাবা জয়,
আমরা বাবার মত অমৃত অভয়।

৩। অধমতারক-নাম, জয় বাবা জয়,
নামসনে নামী রয়, করে তাঁর বরাভয়,
সচ্চিদানন্দ বাবা, আমরা তনয়,
জীবে-শিবে ভেদভাব অজ্ঞানে উদয়।
শ্রদ্ধাসহ সদা বল, জয় বাবা জয়,
মনে, বনে, কোণে বল, জয় বাবা জয়,
আকাশে বাতাসে বল জয় বাবা জয়,
ঘটাকাশ মহাকাশ একাকাশ হয়।

(৪)

৪। পরমসুখদ নাম, জয় বাবা জয়,
নামসনে নামী রয়, করে তাঁর বরাভয়,
সত্যপথে দুঃখ-কষ্ট, সে ত দুঃখ নয়,
শীতের পরেই হয় বসন্ত উদয়।
হাততালি দিয়ে বল, জয় বাবা জয়,
খোল-করতালে বল, জয় বাবা জয়,
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় বল, জয় বাবা জয়,
ক্ষুধাতৃষ্ণা দূরে যাবে, নাম মধুময়।

৫। কলির কলুষহারী জয় বাবা জয়,
নামসনে নামী রয়, করে তাঁর বরাভয়,
আমাদের বাবা হ'ন চিদানন্দময়,
আমরা নন্দন তাঁর নিত্য-নিরাময়।
ধনের গৌরব ত্যজি, বল, বাবা জয়,
মানের গৌরব ত্যজি, বল বাবা জয়,
জাতি-বর্ণভেদ ভুলি, বল বাবা জয়,
আমাদের বাবা হন্ শিব মৃত্যুঞ্জয়।

৬। সর্ব্বভাব-প্রপূরক জয় বাবা জয়,
নামসনে নামী রয়, করে তাঁর বরাভয়,
ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু বাবা যে অদ্বয়,
বাবার কৃপায় হয় অজ্ঞানবিলয়।
ইন্দ্রিয় সংযত রবে বল বাবা জয়,
মনুষ্যত্ব ফিরে পাবে বল বাবা জয়,
যমভয় দূরে যাবে বল বাবা জয়,
"জীবে-শিবে ভেদভাব" মায়া-অভিনয়।

—শ্রীমদ্ স্বামী শিবানন্দ
জগদম্বা-তপোবন—বারদী, ঢাকা।

ওঁ শ্রীশ্রীলোকনাথ-বন্দনা

১। নমামি তোমায় লোকনাথ ব্রহ্ম জ্ঞানোদ্ভাসিত
ব্রহ্মতেজ প্রদীপিত পরম ব্রহ্মচারী।

২। তেজোময় রূপ জ্ঞানে গরীয়ান
আজীবন আচরি সুব্রত মহান্
ব্রহ্মচারী রূপে কেটেছ জীবন
ওহে যোগী যোগাচারী॥

৩। লুপ্ত আর্য্য-রীতি-নীতি প্রকাশিতে
আর্য্য ব্রহ্মচর্য্য কার্য্যে দেখাইতে
আর্য্যের আচার জগতে শিখাতে
আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারি॥

৪। মোহাচ্ছন্ন জীবে তরাবার তরে
যে বীজ তুমি গেছ বপন করে
সেই বীজ মহাবৃক্ষের আকারে
ঘোষিবে মহিমা তোমারি॥

৫। কোথা হতে প্রভু এসেছিলে হেথা
আবার চলিয়ে গেলে বা কোথা
বুঝি দেশদেশান্তরে আছ যথা তথা
জগৎ ব্যাপ্ত করি॥

৬। আলেখ্য শুধু রহিয়াছে হেথা
জাগায় মনে তোমারি বারতা
গায় যেন সদা তব গুণগাথা
কলুষ রসনা আমারি॥

৭। অলক্ষ্যে আলেখ্য তব রূপভাতি
জাগুক অন্তরে জ্বলন্ত মূরতি
পলকবিহীন আঁখির পাতি
দিবানিশি যেন নেহারি॥

৮। আদেশিছে যেন ও আঁখিযুগল
কর্ত্তব্যের পথে চল মূঢ় চল
পাইবে পরাণে অমৃত অমল
হৃদয়েরি তম পরিহরি॥

৯। আমার মানস চঞ্চল দুর্ব্বল
ধাবিত সদা কুপথে কেবল
থাকে যেন ভক্তি তোমাতে অচল
জীবন সঁপেছি চরণে তোমারি॥

১০। প্রভু, দাসানুদাস আমি হে তোমার
ভুলি যেন নাহি ও চরণ আর,
দেখেছি অন্তরে করিয়া বিচার
তুমি গুরুর গুরু আমারি॥

নাম-কীর্ত্তন

জয় বাবা লোকনাথ।
জয় মা লোকনাথ।
জয় গুরু লোকনাথ।
জয় শিব লোকনাথ।
জয় ব্রহ্ম লোকনাথ॥

আরতি-গীতি

["আরতি করে নন্দ-রাণী কোলে ল'য়ে গিরিধারী—"
ইত্যাদি সুরে।]

আরতি করে ভকতবৃন্দ সমুখে গুরু ব্রহ্মচারী।
বাজে মৃদঙ্গ, বাজে করতাল, দামামা বাজে মনোহারী।
চুয়া-চন্দন-ধূপ-শিখা নাচিছে লহরে আনন্দ-রেখা,
ভকত নাচিছে দিয়ে করতালি, গাইছে নামের মাধুরী॥
মঙ্গল আরতির মঙ্গল শিখা, মঙ্গল সদা সাধিছে সবার,
শান্তির বারি ঝরিছে শিরে বিদূরিয়া সব মোহের আঁধার,

এস হে শান্ত শীতল জ্যোতি,
কর হে পূত অন্তর ভাতি,
জয় জয় জয় পাপ-তাপ-হারী,
প্রভু শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী॥

আরত্রিক সঙ্গীত

জয়তি জয় শ্রীগুরু লোকনাথরূপ ধর।
অনাদি আদিদেব পুরুষপরাৎপর॥
প্রাকৃতগুণ গণপতি অগণিত গুণাকর।
অচিন্ত্য অনন্তরূপ চিন্তামণি মনোহর॥

ত্বং হি দেব মিহির মোহতিমিরহর।
পূজিত নিখিল বিশ্ব সাক্ষিরূপ দিবাকর॥
শুদ্ধবুদ্ধি-সিদ্ধিদাতা গণপতি রূপধর।
সুর-নরার্চ্চিতপদ সেবক-বিঘ্নহর॥

কীর্ত্তিভেদে নানা মূর্ত্তি শক্তিরূপ শক্তিধর।
ভুক্তি-মুক্তি-ভক্তিপ্রদ পাদপদ্মযুগধর ॥
শিবরূপ ত্বং হি প্রভো উমেশ নাম শঙ্কর।
শৈব-জনার্চ্চিত-পদ-জ্ঞান-বিজ্ঞানাকর ॥

বিষ্ণুরূপ বাসুদেব ব্যক্ত বিশ্বচরাচর।
বৈষ্ণবসেবিতপদ দ্বৈতভেদচ্ছেদকর ॥
ত্ব হি রাধা মহাভাব শ্যামরস কলেবর।
সদা হৃদি বিরাজিত শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর ॥

গান

লোকনাথ নাম সুধা পান
করের করের মন।
লোকনাথনামামৃত পানে
জুড়াবে জীবন ॥
ভব পারাবার করতে রে পার
লোকনাথ কর্ণধার।
লোকনাথ বিনে ভবার্ণবে
কে করিবে পার।
(চল) লোকনাথ, লোকনাথ, লোকনাথ বলে
শান্তি-নিকেতন।
কর লোকনাথ, লোকনাথ, লোকনাথ বলে
সার্থক জীবন ॥
লোকনাথ, লোকনাথ, লোকনাথ বলে
মাত আমার মন।
তুমি আপনি মাত পরকে মাতাও
মাতাও রে ভুবন।